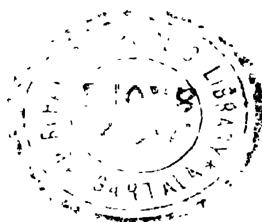
কাশ্মীর
থেকে
কুমারিকা

কাশ্মীর থেকে কুমারিকা

কমলা মিশ্র



মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৩৭

—সাত টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন : অজিত গুপ্ত

মুদ্রণ : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং



মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

পরিচয়

কাশ্মীর থেকে কুমারিকা নামে ভ্রমণ-কাহিনীটি যখন মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এই রচনাটির প্রতি। রচনাটিতে কিছু অসামান্যতা আছে। প্রথম, এ সমগ্র ভারতভ্রমণ কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত গেলে আর বাকি থাকে কী? দ্বিতীয়, এ ভ্রমণে চোখ ও মন দুই-ই সজাগ, অর্থাৎ ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসও আছে। তৃতীয় পর্যটক ও লেখক একজন মহিলা।

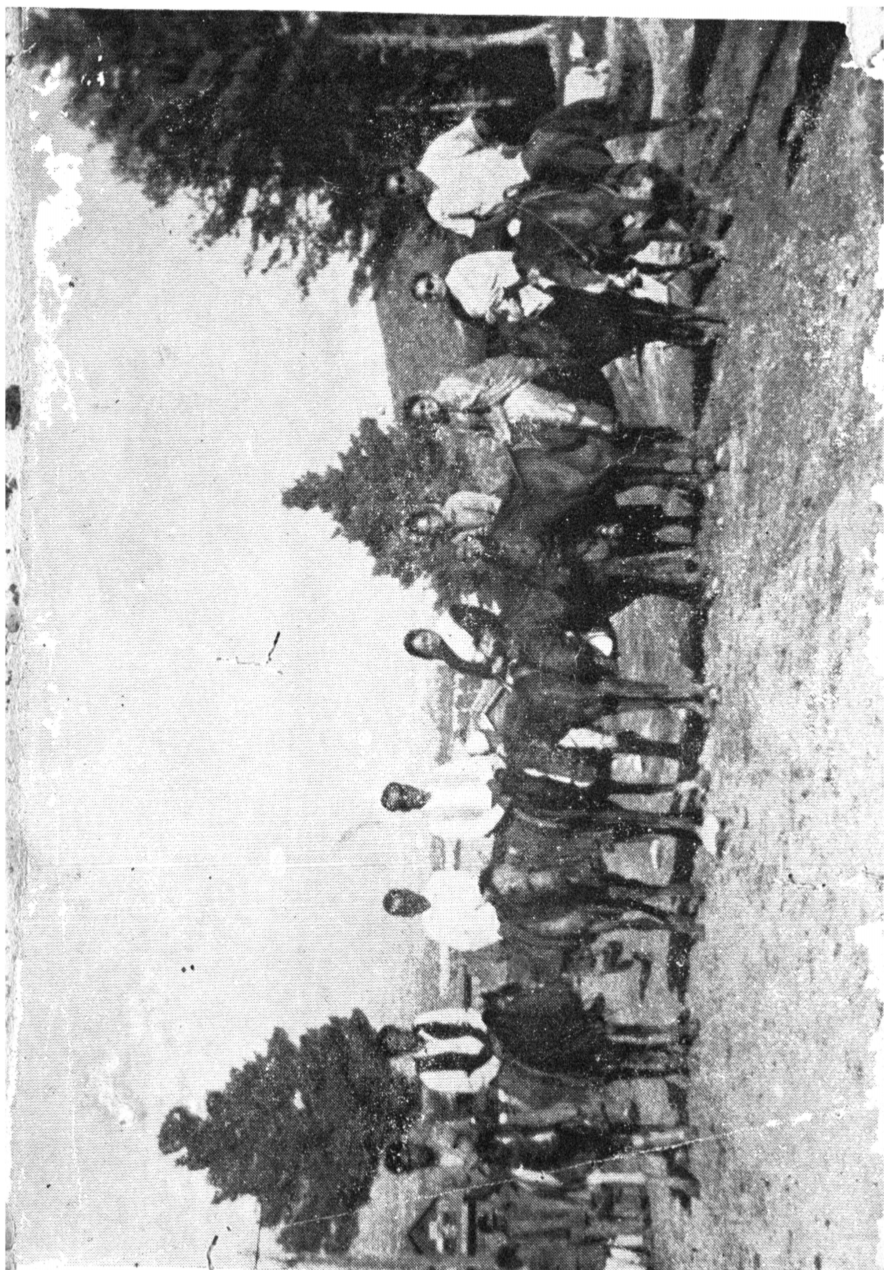
কাহিনীটি শেষ না হওয়া অবধি কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে পত্রিকায় পড়েছি, তারপরে এখন গ্রন্থাকারে পড়বার পালা।

বর্তমানে বাংলা ভাষায় ভ্রমণ-কাহিনী রচনার যুগ চলছে, প্রধান বিষয় হিমালয়। সমগ্র দেশকে ভ্রমণের পরিধির মধ্যে আনবার চেষ্টা এই বোধ করি প্রথম। অবশ্য বইখানার বর্তমান খণ্ডে সেই সমগ্র রূপটি নেই, আছে শুধু কাশ্মীর। পরবর্তী দুই খণ্ডে সমগ্রকে পাওয়া যাবে।

বর্তমান খণ্ডে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। লেখিকা কাশ্মীর-ভ্রমণের বিবরণ দানের সঙ্গে সঙ্গে ধারাবিবরণীর মতো কাশ্মীরের ইতিহাস বলে গিয়েছেন। তার ফলে পূর্বাপর মিলিয়ে দেশটি সত্যতর হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে। তারপরে আছে লেখিকার দেশ দেখার চোখ। ভ্রমণ করেন অনেকেই, কিন্তু এ গুণটি বড় বিরল। তাঁরা প্রায় সকলেই টাইমটেবল ও গাইডবুকের আওতার মধ্যে থেকে যান। কাজেই তাঁদের একজনের লেখা বৃত্তান্ত পড়লেই সকলের বৃত্তান্ত পড়া হয়ে যায়—একেবারে না পড়লেও বড় ক্ষতি হয় না।

প্রত্যেক দেশের আসল রূপটি তার ছোটখাটো ঘটনা ও বিষয়ের মধ্যে, বড় দিয়ে সকল দেশ সমান। মেয়েদের চোখে এই ছোটখাটো ব্যাপার যেমন ধরা পড়ে তেমন পুরুষের চোখে নয়। এ বইখানা সেই কারণে আর সেই গুণে সত্য ও উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে পাঠকের কাছে। পড়া শেষ হলে মনে হয় পুরানো জিনিসকে যেন নূতন ভাবে দেখলাম আবার নূতন জিনিস যেন অনেক দিনের পুরানো। এই বোধ যিনি পাঠকের মনে সৃষ্টি করতে পারেন তিনি গুণী সাহিত্যিক। আজ এই আনন্দ বলে পরবর্তী খণ্ডগুলির আশায় রইলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী



কাশ্মীর থেকে কুমারিকা

ভূস্বর্গ কাশ্মীর। ছোটবেলা থেকেই অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি ওখানে যাবার। কেউ ওখানে গিয়েছে শুনলে মন খারাপ হয়েছে আমার দেখা হল না বলে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গল্প শুনেছি। কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন ভ্রমণ কাহিনী পেলে তো কথাই নেই। প্রতিটি ছত্র আমার মনের খোরাক যুগিয়েছে। তবু মনে হয়েছে আরো কেন লিখল না।

বাকীটা কল্পনায় এঁকেছি।—হিমালয়ের বুকের মাঝে সে যেন অপূর্ব এক দেশ। শিখরে শিখরে তুষার মুকুট। পাহাড়ের বুকে অজস্র ঝরণা মিষ্টি সুরে গান গেয়ে ছুটে চলেছে।

সবুজ পাহাড়ে রং-বেরং-এর ফুলের মেলা।

মানচিত্রে কাশ্মীরের দূরত্ব দেখেছি। সে যে অনেক দূর! কখনও যেতে পারব এমন ভরসা হয় নি। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছি বহুদিন ধরে।

অবশেষে সেই সুযোগ এলো। আর এত অপ্রত্যাশিত সে সুযোগ যা আমি কখনও কল্পনাতেও স্থান দিইনি।

বাড়ি থেকে আমার ছোট দেওর, জা এবং আরও অনেকে কলকাতায় এসেছে। অমরনাথ যাবে। আমাকেও যাবার জন্য বলল। প্রথমটায় ছেলেমানুষের মত আনন্দে নেচে উঠল আমার মন। কিন্তু তারপর দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে লাগলাম। এখন তো ছেলেমানুষ নই। তাই নানান ভাবনা এসে জুটলো।

অমরনাথ যেতে গেলে অন্ততঃ একমাস সময় লাগবে। উনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। আর অমরনাথ যেতে হলে তো কোনদিনই ওঁর সঙ্গে যাওয়া হবে না। কারণ উনি খুব ব্যস্ত মানুষ। এখন কলকাতা ছেড়ে যেতে পারবেন না। আবার এ সুযোগ ছেড়ে দিলে কাশ্মীর হয়ত ওঁর সঙ্গে পরে কোন সময় যেতে পারব কিন্তু 'অমরনাথ' দেখা হবে না। কী যে করি!

অনেক ভেবেও যাব কিনা ঠিক করতে পারিনি। যতবার ভেবেছি যাবার আনন্দের চেয়ে সবাইকে ছেড়ে যাব ভেবেই মন খারাপ করছে। অথচ এতদিন ধরে ওখানে যাবার স্বপ্ন দেখেছি। আশ্চর্য! আর কখনও তো এমন হয়নি। সেবার বদ্রীনাথ গেলাম। সেও তো একমাস বাইরে। কিন্তু এবার আমার মস্ত

পিছটান—আমার ছোট্ট নাতনী 'বুটলু'। তাছাড়া ওঁনাব অত্যধিক ব্যস্ততা ও পরিশ্রমের সময় বাড়িতে ওঁকে একা রেখে যাওয়া। এই সব চিন্তায় আরও মন খারাপ করছে।

শেষ পর্যন্ত উনি আমাকে জোর করেই পাঠালেন। কথা দিলেন রোজই আমি বুটলুর খবর পাব। তবু স্টেশনে এসেও ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

অল্প সময়ে আর আরামে যাওয়া যাবে বলে 'ভেস্টিবল' ট্রেনে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। দিল্লী আগেও গিয়েছি কিন্তু এই প্রথম এ ট্রেনে যাচ্ছি।

ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগেই কন্‌ডাক্টার গার্ড আমাদের নিজ নিজ আসনে গিয়ে বসতে বললেন। আর যাঁরা যাত্রী নন, শুধু বিদায় জানাতে এসেছেন, তাঁদের অনুগ্রহ করে নেমে যেতে বললেন।

সত্যি ভিতরে ভারী ভিড় হয়ে গিয়েছিল। এ গাড়িতে অবশ্য মালপত্র নিয়ে যাবার কথা নয়। প্লেনের মতই ব্যবস্থা। সীটগুলোও ঐ ধরনের। তবু ছোটখাটো জিনিস সঙ্গে নেওয়া চলে। আবার অনেক যাত্রী বড় বড় সুটকেসগুলো নিজেরা হাতে করে ভেতরে ঢুকছেন। মাঝখানে ছোট প্যাসেজ। দুধারে বসার জন্য চেয়ার। তার ভেতরেই পায়ের তলায় জিনিস রাখছেন। ছোটখাটো জিনিস রাখার জন্য অবশ্য ছোট বাংক্ আছে দুধারেই। লক্ষ্য করে দেখলাম সেখানেও বড় বড় সুটকেস কোন রকমে তুলে দিয়েছে। এত কথা লিখছি আমার প্রথম এ ট্রেনে যাওয়া বলে। কারণ মালপত্র কোথায় থাকল, পথের দরকারী কি জিনিস আমার সঙ্গে রাখা উচিত ছিল কিছুই খেয়াল করিনি। আর আসার আগে শুনেছিলাম মালপত্র সঙ্গে নিতে দেয় না। তাই সব কিছুই লাগেজভ্যানে চলে গেছে। এখন দেখছি কিছু সঙ্গে নেওয়াও চলত।

সীটে বসে বাইরে তাকালাম। অজয় আর উনি বাইরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আমাকে কি বলছেন। এয়ার কণ্ডিশান গাড়ি। মোটা কাচেব সার্সী। দেখতে পাচ্ছি সব, কিন্তু কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। আমিও কথা বলে দেখলাম, ওঁরাও কিছুই বুঝতে পারছেন না। এবার ভারী মন খারাপ করে উঠল। এ ট্রেনে যত আরাম আর সুবিধে থাকুক কেমন যেন বন্দী বন্দী মনে হতে লাগল। অসহায় মনে হতে লাগল নিজেকে।

বাইরে বেরিয়ে যে জেনে আসব কি বলছেন ওঁরা বা আমার কথা বলে আসব ওঁদের সে উপায় নেই। ঘণ্টা পড়ে গেছে। ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল।

শুধু তাকিয়ে থাকলাম ওঁদের দিকে—অজান্তে চোখে জল এসে গেল।

আমরা চার জা দুজন দুজন করে পাশাপাশি বসেছি। আমার এ দুর্বলতা পাছে ওদের চোখে ধরা পড়ে তাই বাইরে চোখ ফেরালাম।

অন্যমনস্কভাবে কতক্ষণ বসে ছিলাম, কী ভাবছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ের মিষ্টি স্বরের গান কানে গেল, তাই চম্‌কে ফিরে তাকালাম। ঠিক মনে হল যেন বুটলুর গলা। হয়ত ওর কথাই ভাবছিলাম। বছর দুয়ের একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গান করছিল। গানের কথা—'মেরে বাবা'। বুটলুরই বয়েসী। আর আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম ওর মতই হাত মুখের ভঙ্গী যেন। জড়ভরতের অবস্থা আর কি!

পাখীরা যখন গান গায় তখন সব পাখীর গলার স্বরই যেমন মিষ্টি শোনায়, বাচ্চাদের বেলাতেও ঠিক তাই। ওদের গলার স্বরেরও যেন মিল আছে। ভাব-ভঙ্গী মন-মেজাজ সবই এক রকমের। আমি তো কোন তফাত দেখছি না। শুধু মুখের বুলিটা আলাদা।

বাচ্চাটা শুধু আমার মন কাড়েনি, সবারই মন এখন ওর দিকেই। ওর কিন্তু কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। টলতে টলতে চেয়ারগুলো ধরে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গান করছে। কথা একটাই। 'মেরে বাবা'। যখন যার কাছে যাচ্ছে সেই একটু আদর করছে। ওর মাও ছেলেমানুষ। চেষ্টা করছে ওকে চুপ করে নিজের কাছে বসাতে। কিন্তু ওকি থাকতে পারে বড়দের মত চুপচাপ? তাই ধরতে গেলেই হেসে পালাচ্ছে। ভারী মজা লাগছিল। কখন যে আমার মনের ভার হালকা হয়েছে টের পাইনি।

এতক্ষণে নজর করে দেখলাম গাড়ির ভেতরটা। মস্ত বড় কম্পার্টমেণ্ট। প্রায় সব সীটই ভর্তি। শুধু আমার সামনের দুটো চেয়ার খালি। এ দুটো আসন একেবারে দেয়ালের সামনে দরজার পাশে। মাঝে মধ্যে হয়ত আরো দু'একটা খালি আছে। আমাদের মত এত বড দল আর আছে মনে হল না। পুরুষ যাত্রীই বেশী। মহিলা কম। আর বেশীর ভাগ অন্য প্রদেশের লোক মনে হল। কিন্তু ঠিক করে বলা মুশকিল। এখন পুরুষরা সবাই শার্ট বা হাওয়াই আর প্যাণ্ট পরেন। এটাই এখন প্রায় সর্বভারতীয় পরিচ্ছদ হয়েছে। মেয়েরাও বেশীর ভাগ শাড়ী পরেন। যদিও কিছু ভিন্ন প্রদেশের মেয়েদের সালোয়ার পাঞ্জাবি বা ঘাগরা ওড়না পরতে দেখা যায়, তবে সেটা খুবই কম।

কিন্তু পোশাক দেখেই যে কোন্ প্রদেশের লোক বলব তাও সব সময় ঠিক হয় না। মনে পড়ল একবার আমরা জয়পুর কংগ্রেস থেকে ফিরছি। ফেরার পথে ঘুরতে ঘুরতে দিল্লী থেকে হরিদ্বার গেছি। বুড়ো মতন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে উনি হিন্দীতে কথাবার্তা শুরু করলেন। ভদ্রলোকের পোশাক দেখে আমারও প্রথমে মনে হয়েছিল বিহার বা উত্তর প্রদেশের লোক হবেন হয়ত। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপচাপ ওঁদের কথাবার্তা শুনতে শুনতেই আমার কেমন মনে হ'ল ভদ্রলোক বাঙ্গালী। ওঁকে বলাতে উনি কান দিলেন না আমার কথায়। একটু বিরক্তও হলেন। আমি কিন্তু লক্ষ্য করছি ওঁরা প্রথমে যত তোড়ে হিন্দী বাত শুরু করেছিলেন এখন যেন তুজনেই কেমন থিতিয়ে থিতিয়ে কথা বলছেন। হয়ত কি বলবেন তার হিন্দীটা মনে মনে ঠিক করে নিয়ে তারপর কথা শুরু করছেন। আবার থেমে যাচ্ছেন। আর কথায় যেন বাংলার মিষ্টি টান।

তখন জানুয়ারী মাস। দারুণ শীত। যদিও ভদ্রলোক গলাবন্ধ কোট পরেছেন আর বিরাট এক মাফলার দিয়ে গলা মাথা কান পেঁচিয়ে মস্ত এক পাগড়ির মত করেছেন, মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা পড়েছে তাতে, তবু আমার সন্দেহ গেল না যে উনি বাঙ্গালী। তাই হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আপনি বাঙ্গালী ?

কি খুশী ভদ্রলোক ! আমাকে বললেন, হ্যাঁ মা। তুমি কি করে ধরলে ? আমার স্বামীকে দেখিয়ে বললেন, আমি তো ওঁকে বাঙ্গালী বলে বুঝতে পারিনি ?

বুঝতে পারবেন কি করে ? আমার স্বামীরও প্রায় একই পোশাক যে ! তফাত শুধু শীতের জ্বালায় মাফলারের বদলে একটা হনুমান টুপি পরেছেন। প্রায় মাসখানেক ধরে ঘুরছি আমরা রাজস্থান আর উত্তর প্রদেশে। চেহারায় আর বাঙ্গালী বলে মালুম হচ্ছে না। ভাষাটাও বদলাতে হয়েছে। ও ভদ্রলোকও হয়ত আমাদের মতই ঘুরছেন। এতক্ষণ বহু কসরত করতে হচ্ছিল তুজনকেই কথাবার্তা চালানোর জন্য। এবার বাংলায় কথা বলতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তু'জনেই খুশী। আমিও মনে মনে খুব খুশী ঠিক ধরতে পেরেছি বলে।

আজও আমার মনে হচ্ছিল এঁরা যেন বেশীর ভাগ অন্য প্রদেশের লোক। ইংরাজীতে কথা বলছেন কিন্তু সুরটি যেন হিন্দীর। আমার কানে যেন তাই মনে হচ্ছে। ভুলও হতে পারে। বলা যায় না। তবে আজকাল এও একটা ফ্যাশান। অনেকেই মাতৃভাষায় কথা না বলে ইংরাজীতে কথা বলতে ভালোবাসেন। আমরা

পোশাকের মত ভাষাটাও বদলাতে শুরু করেছি যেন। যদিও 'আংরেজী হঠাও' ধ্বনি উঠেছে দিল্লীতে।

বাইরে তাকিয়ে দেখি আমরা বাংলা দেশ ছাড়িয়ে ছোটনাগপুরের পাহাড় আর জঙ্গল পেরিয়ে চলেছি। পাহাড়ে এত জঙ্গল হয় জানতাম না তো! অজস্র ঝরণা —ছোট বড়। তিনটে টানেলও পার হলাম। হঠাৎ অন্ধকার দেখে বাচ্চাটি ভয় পেয়েছে মনে হয়। মার কোলে বসেছে গুটিসুটি হয়ে। অবশ্য আলো জ্বলছে ভেতরে। কিন্তু বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

॥ ২ ॥

গয়া এসে গেলাম। এখন সন্ধ্যে ছটা। একেবারে দৃশ্য পরিবর্তন। অত সবুজের সমারোহ তারপরই রুক্ষ নেড়া পাহাড়। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। যেন আগুনে পুড়ে গেছে সব। খুব ছোটবেলায় একবার মা বাবার সঙ্গে গয়া এসেছিলাম। মনে আছে স্টেশনের পাশের পাহাড়টা দেখে কেমন ভয় ভয় করছিল। লাল পাথরের পাহাড়। একটাও গাছপালা নেই। মনে হয়েছিল যেন আগুনে পুড়ে পাহাড়টা অমনি লাল হয়েছে। ভুলিনি সে পাহাড়ের কথা। কাছ থেকে সেই প্রথম আমার পাহাড় দেখা। তাকিয়ে দেখি ওটার এখনও অমনি চেহারা। তবে ওর চেহারা না পালটালেও আকারের পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ ওকে আর অমনি-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবে না বুঝি। এর মধ্যেই অনেকখানি ভেঙ্গে ফেলেছে। ক্রাশার দিয়ে গুঁড়িয়ে কোথায় চালান দিচ্ছে তাকে কে জানে! এখন কোথাও কোন রাস্তা বা সেতু তৈরী করছে বুঝি। হয়ত আরো কিছুদিন পরে এপথে এলে আর এর চিহ্নও দেখতে পাব না।

বড় হয়ে কত পাহাড় দেখলাম, মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে চলেছি পাহাড়ী পথে, কিন্তু ভুলিনি সেই প্রথম দেখা পাহাড়। যা দেখে অদ্ভুত বিস্ময়ে আর ভয়ে স্তব্ধ হয়েছিল আমার শিশুমন।

এপথে বেশী না হলেও আরো দু'চারবার যাতায়াত করেছি। কিন্তু রাতের বেলা পার হয়ে গেছি এখানটা। এবার দিনে দিনে যাচ্ছি। তাই বহুদিন পর আবার দেখলাম পাহাড়টাকে। যেন ফিরে গেলাম আবার সেই ছোটবেলায়।

এখানে আসার আগেই মার মুখে গয়ার কিছু গল্প শুনেছিলাম। কি করে গয়াসুরকে পা দিয়ে দাবিয়ে রেখেছেন নারায়ণ। সুযোগ পেলে এখনও সে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে নাকি। তাই শুনেই হয়ত প্রথম থেকেই ভয় ঢুকেছিল আমার মনে। মনে হয়েছিল এ সবই সেই অসুরের কীর্তি।

আর সত্যি সত্যি ভয়ের কারণও ঘটেছিল। বাবা মা ফল্গু নদীতে স্নান সেরে নদীর তীরে বালুর চরে পাণ্ডার সঙ্গে কী পূজো-আর্চা করছিলেন। আমরা দু'ভাই-বোনও স্নান করেছি নদীতে। ভারী মজা লাগছিল। পরিষ্কার টলটলে জল। আর কী স্রোত! কিন্তু জল বেশী নয়। আমরা অনেকক্ষণ ধরে জলে ঝাপাঝাপি করেছি আর পাথরের কুচি তুলেছি ডুব দিয়ে দিয়ে। সাদা লাল সবুজ পাথরের কুচিগুলো যা পেয়েছি কুড়িয়েছি। মনে হয়েছে সবই বুঝি খুব দামী। নদীর ওপারেও একটা পাহাড়। এখানে আসার আগেই মার কাছে গল্প শুনেছি, রাম সীতা যখন চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে ছিলেন তখন এখানে এসেছিলেন। রাজা দশরথ মরার পর এখানে এসে পিণ্ড দিয়েছিলেন। রাম সীতা এই নদীতে স্নান করেই বালির পিণ্ড দিয়েছিলেন নাকি। আর আসল নদী বালির নীচে লুকিয়ে আছে। বালি খুঁড়লেই তাই জল বেরোয়। স্নানের পর ভাইটিকে নিয়ে আমিও তাই বালি খুঁড়েছিলাম মনে পড়ে। খানিকটা বালি সরাতেই একটু জল বেরিয়েছিল কিন্তু আমি তাতে খুশী হইনি। আমার ধারণা হয়েছিল ওপরের মত নীচেও অমনি আর একটা টলটলে জলের নদী দেখব বুঝি। দেখতে না পেয়ে হয়ত হতাশ হয়ে ভাইকে নিয়ে অন্য খেলায় মেতেছিলাম। আর মার কাছে শোনা গয়াসুরের গল্প বলতে বলতে কখন মন্দিরের চত্বরে এসে গিয়েছি খেয়াল নেই। নানা ধরনের যাত্রীর সঙ্গে আমরাও এদিক সেদিক দেখছি ঘুরে ঘুরে। নূতন দেখছি সব কিছুই, কৌতূহলও বেশী ও বয়েসে। ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছি মন্দিরের ভেতরটা। ওখানেই তো সেই অসুরটাকে পা দিয়ে চেপে দাবিয়ে রেখেছেন নারায়ণ। পায়ের ছাপটা কত বড়! হবে না কেন, অসুরকে দাবিয়ে রাখতে কম শক্তির দরকার হয়! বড় চেহারা না করলে চলবে কেন? আর নারায়ণ ইচ্ছে করলে সবই পারেন। মার কাছে শোনা গল্প খানিকটা নিজের বুদ্ধিমত তৈরী করে ভাইকে জ্ঞান দিচ্ছিলাম। এমন সময় এই অঘটন ঘটল।—

কয়েকজন নূতন যাত্রী এসে পৌঁচেছে। তারা সব পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে জড়সড় হয়ে চত্বরের একপাশে দাঁড়িয়ে। আর বিরাটকায় এক মহিলা তার চেয়েও

বিরাট এক ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে তাদের সবার পিঠে সেই ঝাঁটার বাড়ি দিচ্ছে আর কি সব বলছে বুঝতে পারছি না। পুরুষ যাত্রীদের মাথা ছাড়িয়ে অনেকটা ওপরে তার মাথা। কপালে মস্ত এক তেল-সিঁদুরের ফোঁটা। মিশমিশে কালো রং। চুল ঝুঁটি করে মাথার ওপর বাঁধা। রামায়ণে রাবণের চেড়ীদের যে ছবি দেখেছি হুবহু সেই। আর কোন সন্দেহ থাকল না ওর সম্বন্ধে। অসুর আর রাক্ষস একই কথা হল। গল্প নয় এখানে যে এখনও অসুররা আছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। মনে হওয়া মাত্র ভয়ে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করেছিলাম। আমার দেখাদেখি ভাইটিও। দুজনে জড়াজড়ি করে সমানে চেঁচাচ্ছি। ও বেচারা হয়ত বুঝতে পেরেই আমাদের থামাতে এসেছিল। তাতে ফল ভালো হয়নি। বরং আমাদের ভয় আরো বেড়ে গিয়েছিল যে এইবার আমাদের পালা এলো বুঝি। এখনই হয়ত ঝাঁটাপেটা করবে। তারপর কি করবে সে আর ভাবতে পারছিলাম না। সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে কিন্তু বাবা মা এসে উপস্থিত। অকূলে যেন কূল পেয়েছিলাম। বাবা অবশ্য বলেছিলেন, ওরা ওভাবে কিছু পয়সা উপায় করে।

তখন বুঝিনি ঝাঁটাপেটা করলে লোকে পয়সা দেয় কেন? পরে বুঝেছি এভাবে যাত্রীদের পাপের বোঝা ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়ে হালকা করে আর কি। তাই পয়সা দিতে হয়। এখন মনে হচ্ছে অদ্ভুত যুক্তি আর তার চেয়েও অদ্ভুত আমাদের বিশ্বাস!

আমাদের ভয় ভাঙ্গানোর জন্য বাবা ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলেন। ও বেচারাও আমাদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করেছিল মনে পড়ে।

মধুর শৈশব স্মৃতিতে ডুব দিয়েছিলাম, কতটা সময় কেটেছে খেয়াল নেই। তাকিয়ে দেখি ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। নীচে সেই ফল্গু নদী। ক্ষীণ জলের ধারা বয়ে চলেছে। আর বিস্তৃত বালুর চরের ওপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বালু খুঁড়ছে, আমাদেরই মত। ভারী ভালো লাগল দেখতে।

আবার ফিরে গেলাম শৈশবের সেই দিনগুলিতে। গয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ-গয়ার স্মৃতিও জড়িয়ে আছে, একটা টাঙ্গায় করে গয়া থেকে বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলাম মনে পড়ে। আমাদের টাঙ্গার পিছু পিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল বহুদূর পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে চলেছিল। আর সমানে 'দে মাঈ এক পয়সা' বুলি ধরেছিল। মা বোধ হয় আগেই জানতেন। একটা থলিতে শুধু তামার আধ পয়সা, পাই পয়সা করে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। ওরা আনন্দে কুড়িয়ে নিয়ে আবার পিছু পিছু ছুটছিল। তারপর বাবা বারণ করে বললেন, এভাবে যতক্ষণ পয়সা দেবে ওরা পিছু ছাড়বে না। ছোট ছোট বাচ্চার দল। ওরা

কতদূর চলে এসেছে খেয়াল নেই। আবার ফিরে যেতে হবে ত?

বাবার কথা শুনেই হয়ত ওরা চলা বন্ধ করলো। আমরা দু'ভাই-বোন পেছনের দিকে পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম। কি করে যেন ওদের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল। ওরা হৈ-হল্লা করে পয়সা কুড়োচ্ছিল আর আনন্দে মুখ তুলে তাকিয়ে আবার ছুটছিল আমাদের সঙ্গে, সে সময় আমরাও যেন এ খেলার সাথী হয়েছিলাম। পয়সাগুলো কোথায় পড়ছে আমরাও সমান আগ্রহে লক্ষ্য করছিলাম। আর ঠিক ঠিক দেখে নিয়ে ওরা যখন কুড়িয়ে তুলে হেসে উঠছিল, ওদের সঙ্গে আমরাও সে হাসিতে যোগ দিচ্ছিলাম। মনে মনে হয়ত ওদের আনন্দের ভাগ নিচ্ছিলাম। ওদের ফিরে যেতে দেখে তাই একটু মনমরা হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা হয়ত বুঝতে পেরেই আমাদের নূতন আনন্দ দেবার জন্য বুদ্ধদেবের গল্প শুরু করেছিলেন।

মনে পড়ে মন্দিরে ঢুকে বুদ্ধের ধ্যানগম্ভীর মূর্তির সামনে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে। বাবা মৃদু গম্ভীর স্বরে বুদ্ধের বাণী উচ্চারণ করছেন। কি শান্ত পরিবেশ! ধূপ ধুনো আর ফুলের গন্ধ যেন এখনও নাকে ভেসে আসছে। বাবাকে প্রশ্ন করে-ছিলাম, উনি কি ভগবান?

বাবা হেসে বলেছিলেন, ভগবান বৈকি মা! উনি পরম জ্ঞানী বুদ্ধ। মানুষই তো তপস্যা করে দেবতা হয়।

সব কথাই স্পষ্ট মনে আছে। ভুলিনি কিছুই। সেই প্রথম এত দূর দেশে বেড়াতে এসেছিলাম। এখান থেকে আমরা কাশী হয়ে তবে বাড়ি ফিরেছিলাম। কাশীতে ঠাকুমা দিদিমা থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে রোজ ভোরে গঙ্গার ঘাটে যাওয়া। স্নান সেরে সারা গায়ে চন্দনের ছাপ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করতে করতে ফেরা আর সন্ধ্যায় আরতি দেখা কত স্মৃতিই মনে জেগে উঠছে।

সেই যে আনন্দের স্বাদ পেলাম সেই থেকেই বুঝি দেশ ভ্রমণের নেশা লাগল আমার মনে। তাই সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি এমনি করে। এ আনন্দের তুলনা নেই বুঝিবা। আর জানালায় চোখ পেতে বসে থাকার অভ্যেসটাও সেই ছোটবেলা থেকেই। মনে হয় কোন কিছুই যেন আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে হারিয়ে না যায়।

কিছুই তো হারায়নি আমার স্মৃতি থেকে। আশ্চর্য! এত স্পষ্ট, এত উজ্জ্বল এ ছবি, মনে হচ্ছে আবার সেই দিনগুলি ফিরে পেলাম বুঝি। ঝড়ের বেগে ট্রেন সামনে ছুটে চলেছে। আমার মনের গতি কিন্তু পেছনের দিকে। বহুদিন আগে ফেলে আসা দিনগুলির দিকেই তার গতি।

॥ ৩ ॥

গম্ গম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে ট্রেন যখন মোগলসরাই স্টেশনে 'ইন' করছে আমার এক দেওর হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকেই বলে উঠল, খবর নিয়ে এলাম ডাইনিং কারে, ভাঁড়ারে মা ভবানী। খেতে চাও তো শিগ্‌গির চলো এই বেলা।

এ খবরে আমাদের পুরুষ সঙ্গীরা সবাই উৎকণ্ঠিত। কারণ স্বল্পাহারে কেউই রাজী নন। ওঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন খেতে যাবার জন্য, আমাদেরও উঠতে হল।

ডাইনিং কারে এসে দেখি অসম্ভব ভিড়। আমরা সংখ্যায় নয় জন। এতগুলো সীট একসঙ্গে খালি পাওয়া ভার। তাই ঠিক হল যে কটা সীট খালি আছে সে ক'জন খেয়ে নিক। আমরা বাকীরা ফিরে চললাম। কখন সীট খালি হবে সে ভরসায় আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়! যাঁরা খাচ্ছেন তাঁদেরও

আমাদের কামরার পাশেই ডাইনিং কার। যাবার সময় ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল তাই বুঝতে পারিনি, ফেরার বেলায় দেখি পায়ের তলার পথটা যেন নড়াচড়া করছে। ট্রেনের বর্ধিত গতির সঙ্গে তাল রেখে এর নড়বড়ে ভাব যেন দ্রুততর হচ্ছে। ট্রামের দুটো কামরার সঙ্গে যেমন সংযোগ-ব্যবস্থা এটাও তেমনি মনে হল। তফাত শুধু মাঝের এই সংকীর্ণ আর সংক্ষিপ্ত পথটুকু। পাশের দেয়ালে হাত রেখে যে টাল সামলাবো তার সাহস হল না। কারণ ফাঁক দিয়ে নীচের দ্রুত অপস্রিয়মাণ রেল লাইন চোখে পড়ছে। ভরসা করে আর পাশে ভর না দিয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়েই ফিরে এলাম। অবশ্য ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা স্মরণ রেখেই যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছেন রেল কর্তৃপক্ষ। তবে আমার মত ভীতুদের কথা ভেবেছেন কিনা জানি না।

আমার আগে আগে এক ভদ্রলোক পার হচ্ছিলেন এই সংযোগ সেতুটি। একটি বাচ্চা ছেলের হাত ধরে নিয়ে। এই পথটুকু পার হয়েই বলে উঠলেন, ওয়ার্থলেস। যারপরনাই বিরক্তি ঝরে পড়ল ওঁর কথার সুরে।

আমার বুঝতে বাকী থাকল না যে, উক্তিটি ছুঁড়ে দিলেন উনি রেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে। কারণ যতক্ষণ নিরাপত্তাবোধ ফিরে না এসেছে উনি চুপ করেই ছিলেন আমার মত। ডাইনিং কারের ম্যানেজারের উদ্দেশ্যেও বলতে পারতেন এ কথাটা,

তবে ঠিক এই মুহূর্তে খানা খারাপ হবার শোক নিশ্চয়ই মনে পড়েনি ওর। মনে মনে ভেবে নিয়ে খুশী হয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। যাক আমার মত আরো আছে। আর মেয়েরা বেশী ভীতু এ অপবাদও আমাকে আর দিতে পারবে না কেউ।

অসিত ঠাকুরপোও ফিরে এসেছে। আমাদের না খাইয়ে ও খায় কি করে। ও বেচারা বিয়ে-থাওয়া করেনি। কোন দায় নেই তাই বৌদিদের তদারকির দায়িত্ব ওরই। আমাকে প্রশ্ন করল, হাসছ কেন? ও ভাবল, খেতে ডেকে নিয়ে গেল কিন্তু ফিরে আসতে হল—তাই বুঝি হাসছি। বলে উঠল, দাদারা পরে খেলেও পারত। আর কী ভিড় দেখলে তো!

আমাদের ফিরে আসতে হল বলে যেন ওকেই দায়ী করছি। এতক্ষণ হয়ত মনে মনে হাসছিলাম। ওর কথায় হেসে ফেললাম।

বললাম, তুমি যা ভাবছ মোটেই তা নয়। এবার বললাম ব্যাপারটা। শুনে নিয়ে ও-ও একচোট হাসল। ইশারায় জানতে চাইল, কে সেই ভদ্রলোক?

আমি বললাম, তা বলব না। তবে এবার থেকে আমাকে আর ভীতু বলতে পারবে না কিন্তু।

এদের তিন জনেরই আমি বৌদি। একজন অবশ্য ভাসুর। তবে উনি আবার অন্য সম্পর্কে আমার ভগ্নিপতি। আর একটি ভাসুরপো। রওনা হবার আগেই এরা আমাকে ক্ষ্যাপাতে শুরু করেছিল ভীতু বলে। বদ্রীনাথের পথে আমি ভয় পেয়েছিলাম তাই নিয়ে হাসাহাসি করেছিল। অমরনাথের পথও দুর্গম। ওরা ধরেই নিয়েছিল আমি এবারও ভয় পাবো।

আমাদের সঙ্গে খেতে বসে অসিত ঠাকুরপো একটু খুঁতখুঁত করছিল। শেষের 'আইটেমে' কাস্টারড্ পুডিংএর প্রায় জলীয় আকার দেখে আমরাও অবশ্য হেসেছিলাম। কিন্তু ওকে ক্ষ্যাপালাম আগে না খেয়ে ঠকেছে বলে।

ওর উত্তর, কি করি বল? আমি ছাড়া তোমাদের কি গতি হত বল তো?

সবাই এ কথায় আমরা একসঙ্গে হেসে সায় দিলাম।—তা সত্যি।

ভোজনের পরই শয়ন-পর্ব। এখানেও অসিত ঠাকুরপো আমাদের কাণ্ডারী। অর্থাৎ আমাদের উপদেশ দিল কি করে চেয়ারগুলো পেছনে হেলিয়ে দিয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ওর কথামত শুলাম ঠিকই কিন্তু শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম নিজের এই শায়িত অবস্থা সম্বন্ধে। পা দুটো আর একটু লম্বা হলে পা রাখার যে ব্যবস্থা আছে তাতে

না হয় রাখা যেত। কিন্তু তা নয় বলেই শূন্যে ঝুলছে। এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকাটা নিশ্চয়ই আরামের হবে না। এ যেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। ঠিক ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলন্ত অবস্থাও নয়, অনেকটা যেন ভীষ্মের শরশয্যা আর কি। শরীরের স্থানে স্থানে ঠেকা দিয়ে পড়ে থাকা। পিঠ আর কোমরের খাঁজেও শূন্য। ওখানে একটা বালিশ হলে হয়ত একটু আরাম হত। আগে জানলে অন্ততঃ একটা বালিশ হাতে করে ঢুকতাম। এতক্ষণে বুঝলাম অন্যান্য যাত্রীরা কেন ভারী ভারী স্যুটকেস হাতে করে ঢুকেছিলেন। আর পায়ের তলায় রেখেছিলেন ওগুলো। অর্থ স্পষ্ট হল। ওঁরা এ ট্রেনের নূতন যাত্রী নন। ভুক্তভোগী আর কি! আমারও পায়ের তলায় একটা স্যুটকেস থাকলে একটু আরাম হত হয়ত।—কিন্তু এখন আর উপায় নেই। কাজেই শরীরটাকে যথাসম্ভব ভাঁজ করে চেয়ারের খাঁজে ফেলে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

১৫ই আগস্ট আমরা রওনা হয়েছি। বাইরে ভাদ্রের পচা গরম। ভেতরে ঠাণ্ডা আমেজ আর ভরা পেটে গাড়ির দোলানিতে ঘুম আসতে কিন্তু দেরি হল না।

মনে হয় তখন মধ্যরাত্রি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। কখন যে পা দুটো মুড়ে মুড়ে বুকের কাছে তুলেছি আর মাথাটাও ঝুঁকে হাঁটুর কাছে নেমেছে বুঝতে পারিনি। পা সোজা করতে গিয়ে দেখি একেবারে আড়ষ্ট অবস্থা। হাত দিয়ে না নড়ালে পা মেলার উপায় নেই। পায়ের যন্ত্রণাতেই তাহলে ঘুম ভেঙ্গেছে। অমরনাথের পথে এ পা দুটোই ভরসা। তাই দুহাতে পায়ের সেবা শুরু করলাম। না হলে উঠে যে দাঁড়াব সে উপায় নেই। ঘাড়েও একটু ব্যথা হয়েছে। হোক। আগে উঠে না দাঁড়ালে চলছে না। এ অবস্থাতেও ভাবছিলাম, শরীরের ওপর দিকটাকেই তো উত্তম অঙ্গ বলে, কিন্তু অধম বলে পা দুটোকে হেলা করার উপায় নেই। 'পায়ে তেল দেওয়া' প্রবাদ বাক্যটা মনে হল। কই 'মাথায় তেল দেওয়া' কেউ বলে না তো! আগের দিনের অতি বড় কঠিনা শাশুড়ীদের কোমল করার মোক্ষম উপায় ছিল, পায়ে তেল দেওয়া। অন্য অর্থও আছে অবশ্য। তবে যে ভাবেই হোক পায়ে তেল দিলেই লোকে সব চেয়ে খুশী হয় নিশ্চয়ই। আবার পায়ের ব, হয় হোক মাথাটা আরামে থাকবে তারও উপায় নেই। দেখছি আমার মাথাটাও পায়ের টানে নেমে এসেছে।

এতক্ষণে আবার উঠে দাঁড়াবার অবস্থা ফিরে পেয়েছি। তাকিয়ে দেখি আমার সামনের আসন দুটিতে দুটি তরুণ-তরুণী এসেছে। তরুণীটি দুটো সীট নিয়ে একটু পা

মেলে ঘুমিয়েছে। আর পায়ের তলায় মেঝেতে তরুণ একটু জায়গা করে নিয়েছে। একটা বেড্ কভার পেতে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হল স্বামী-স্ত্রী এবং নব বিবাহিত। তরুণ স্বামীটির এই ত্যাগের দৃশ্য মনে মনে উপভোগ করলাম। মনে পড়ল গীতগোবিন্দের সেই অপূর্ব শ্লোকটি।—দেহি পদপল্লবমুদারম্। যদিও দেখা উচিত নয় তবুও অবাধ্য চোখদুটো সমস্ত কম্পার্টমেণ্টটাই ঘুরে এসেছে। বিচিত্র ভঙ্গীতে এতগুলো যাত্রী ঘুমিয়ে আছে। কারো কারো বেশ জোরে জোরে নাসিকা গর্জন হচ্ছে। টেরিলিন শার্ট প্যাণ্ট পরা সে স্মার্টনেস আর নেই। এক ভদ্রলোক আমার মতই পায়ের সমস্যায় পড়েছেন দেখলাম। পা দুটো নীচে না রেখে সামনের সীটের ওপর চাপিয়েছেন। যিনি চাপিয়েছেন তিনি অজান্তেই করেছেন এটা। আর যাঁর মাথার পাশে পা দুখানি বিরাজ করছে তিনিও টের পাচ্ছেন না। কাজেই ক্ষতি নেই কিছুই কিন্তু আমার এ দৃশ্যে হাসি চাপা দায় হল।

কানপুরে একটি তরুণী উঠল। ওপাশের সীটের ভদ্রলোক এতক্ষণ আরামেই দুটো সীট নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসতে হল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। ভদ্রলোক আবার হাঁ করে ঘুমোতে লাগলেন আর ক্রমশঃ হাত পা মেলে দেবার চেষ্টা করছেন দেখে তরুণীটি সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেকে আরো গুটিয়ে ফেলল। ওদিক থেকে চোখ ফেরালাম।

বাইরে তারাভরা আকাশ। উত্তর প্রদেশের বিশাল প্রান্তরের ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। দূরের কোন গ্রামের দু'একটা আলোর ফুলকি চোখে পড়ছে। ঘুম আসছে না তাই ভাবলাম মাথায় মুখে জল দিয়ে আসি। এই নিদ্রিত পুরীতে একা একা কতক্ষণ জেগে থাকা যায়?

বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে অপূর্ব এক দৃশ্য চোখে পড়ল। কয়েকটি মূর্তি পরনে লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। কি গভীর নিদ্রা এদের! আমার পায়ের শব্দে কোন সাড়াশব্দই নেই। এরাই সন্ধ্যেবেলা রাজা-উজীরের মত মাথায় পেখম তোলা পাগড়ি বেঁধে, কোমরে জরির কোমরবন্ধ আর তকমা এঁটে আমাদের খাবার পরিবেশন করছিল! রাজবেশ ছেড়ে এখন ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক আরামে ঘুমুচ্ছে মনে হল। মাথায় একটা প্ল্যান এলো। আমাদেরও যদি চেয়ার না দিয়ে এমনি মেঝেতে ঘুমোবার ব্যবস্থা থাকত ভালই হত তাহলে। যে যার বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়তাম আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে। পরক্ষণেই কানপুরের ঐ তরুণীর

কথা মনে এলো। অমনি রাতত্বপুরে কোন মেয়েকে যদি একা ট্রেনে উঠতে হয় তার অবস্থাটা কি হবে ভেবে মনে মনেই জিব কাটলাম হেসে। অনিদ্রায় নানা রকম উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসছে ভেবে বাথরুমে ঢুকলাম।

মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এসে দেখি পূব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। রং এর ছোঁওয়া লেগেছে হালকা মেঘের গায়ে। অনেকেরই ঘুম ফিকে হয়েছে। কেউ কেউ জেগেও গেছেন। জাগরণের সাড়া জেগেছে বাইরেও। সন্ত ঘুমভাঙ্গা হু'একটা পাখী টেলিগ্রাফের তারে এসে বসছে। আমি আবার জানালার ধারে ফিরে গেলাম নিজের আসনে।

॥ ৪ ॥

আজকের এই শান্ত প্রভাতে বড় হালকা লাগছে মনটা। খুশীর আমেজ লেগেছে মনে। বাইরের হালকা মেঘের মতই ভেসে বেড়াতে চায় যেন স্থান থেকে স্থানান্তরে। আর কোন পিছুটান নেই। ভ্রমণের নেশায় মশগুল এখন আমার মন। যেন গেয়ে উঠতে চায়—"মন মোর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে। ক্বচিৎ ক্বচিৎ চকিত···আলোকে।···উড়ে চলে দিকদিগন্তের পানে।"

কিন্তু আকাশ পথে নয়, যাচ্ছি আমি ট্রেনে চেপে। সে পথে দিল্লী অনেক দূর। অমনি মনে পড়ল আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই গান। ট্রেনের শব্দের তালে তালে মনের ভেতর গুন গুন করতে লাগল গানের কলিটা,—দিল্লী অনেক দূ-র অনেক দূ-উ-র অনেক দূর।

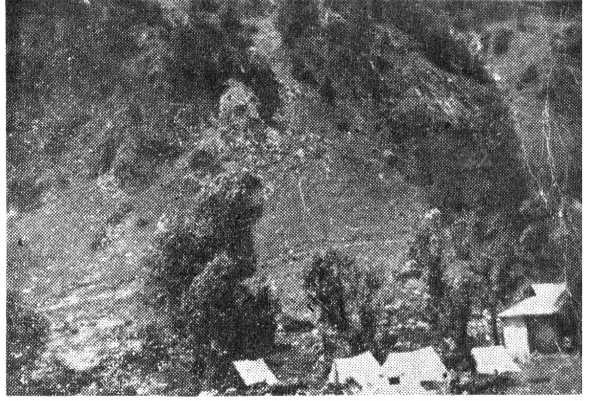
এখন অবশ্য দিল্লীর সে দূরত্ব আর নেই। আমাদের কথাই ধরা যাক। কাল হুপুরে প্রায় হাজার মাইল দূর কলকাতা থেকে খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছি। আর আজ খানিক বাদেই দিল্লী পৌঁছে যাব। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও লাগছে না। যদি প্লেনে আসতাম, ঘণ্টা তিনেকেই পৌঁছাতাম। আর ক্যারাভ্যাল প্লেনে এলে তো কথাই নেই। পুরো হুটি ঘণ্টা সময়ও লাগত না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম বহু শতাব্দী পূর্বের সেই যুগের কথা যখন যান্ত্রিক কোন যানবাহন ছিল না, তখনও দিল্লীর আকর্ষণে মধ্য এশিয়া থেকে ছুটে এসেছিল মোঙ্গল বীর তৈমুর লঙ্গ। তিনি অবশ্য দিল্লী লুণ্ঠন করেই ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁরই বংশধর বাবর এসে দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন।

মোগল যুগের পর প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করল ইংরেজ। রাজধানী এই দিল্লী। কিন্তু দিল্লী তখন আমাদের কাছে বহুদূর। শুধু এত দ্রুত যাতায়াত করা যেত না বলেই নয় দিল্লীর খবরও আমাদের কাছে বিশেষ পৌঁছত না। এখন যেমন সকাল সন্ধ্যে রেডিও খুললে প্রথমেই দিল্লী থেকে প্রচারিত সর্বভারতীয় সংবাদ শুনতে পাই তখন সে সুযোগ ছিল না। সংবাদপত্রেও কতটুকু খবর থাকত দিল্লীর!

বৃটিশ আমলে এই দিল্লী পৌঁছানোর জন্য নেতাজীর তৈরী আজাদ হিন্দ বাহিনীর কত ক্লেশ স্বীকার, কত দুঃখ বরণ! ব্রহ্মদেশের সেই দুর্গম পার্বত্য অরণ্য পার হয়ে মণিপুর পর্যন্ত পৌঁছেই অবশ্য তাদের যাত্রা শেষ হয়েছিল। দিল্লী পৌঁছাতে পারেনি। কত জন প্রাণ দিল। নেতাজীও দেশে ফিরতে পারলেন না। কোথায় কীভাবে প্রাণ দিলেন কে জানে! সেই আজাদ হিন্দ ফৌজেরই গান,— দিল্লী অনেক দূর।

কিন্তু তাদের সাহস, বীরত্ব ও ত্যাগের মূল্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। দিল্লী আর দূর রইল না। দিল্লী আমাদের কাছে সরে এলো যেন। দিল্লী এখন আমাদের সারা ভারতের প্রাণ। দিল্লীর প্রাণের স্পন্দন সমস্ত ভারতবাসীর মনে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সেদিন যখন কাশ্মীর উপলক্ষ্য করে দিল্লীর দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে চাইল পাকিস্তান, দুলে উঠল আসমুদ্রহিমাচল। জেগে উঠল কোটি কোটি ভারতবাসী। আমরা সমগ্র ভারতবাসী একযোগে রুখে দাঁড়ালাম। আমাদের বীর ছেলেরা প্রাণ দিয়েও প্যাটন ট্যাংক আর স্যাবার জেটের গতিরোধ করল। বীর সন্তানের মৃত্যু সংবাদে শোকে কাতর হয়েছি আবার তাদের বীরত্বের কথা মনে করে আমরা চল্লিশ কোটি ভারতবাসী গর্ব অনুভব করেছি। যুদ্ধের উন্মাদনায় যেন দ্রুত হয়েছে বুকের স্পন্দন। এ তো সেদিনের কথা। ভোরের আলোয় বাইরের বিশাল প্রান্তর চোখে পড়ছে। আর ভাবছি অতীতে কখনও হয়ত এই প্রান্তরে ছাউনি পড়েছে যুদ্ধের। শত শত তাঁবু। হাজার হাজার সৈন্য জড়ো হয়েছে দুপক্ষের। তারপর ভাগ্য যার প্রসন্ন হয়েছে যুদ্ধের ফল তার অনুকূল হয়েছে। দিল্লীর অধিকার তারই বলে স্বীকৃত হয়েছে। সে কি এই প্রান্তর?

বহুকাল আগে সেই মহাভারতের যুগেও দিল্লীই ছিল ভারতের প্রধান নগর। তখন অবশ্য অন্য নাম। হস্তিনাপুর। কিন্তু যে নামই হোক এই রাজ্যের অধিকার নিয়েই তো কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে নেমেছিলেন! ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। দিল্লীর আরো কিছু উত্তরে সেও তো এমনি এক বিশাল প্রান্তর।





উপরে ঃ

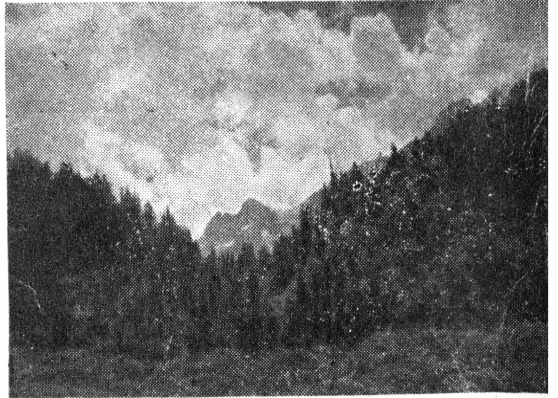
চন্দনবাড়ীতে আমাদের তাঁবু

পাশে ঃ

চন্দনবাড়ী

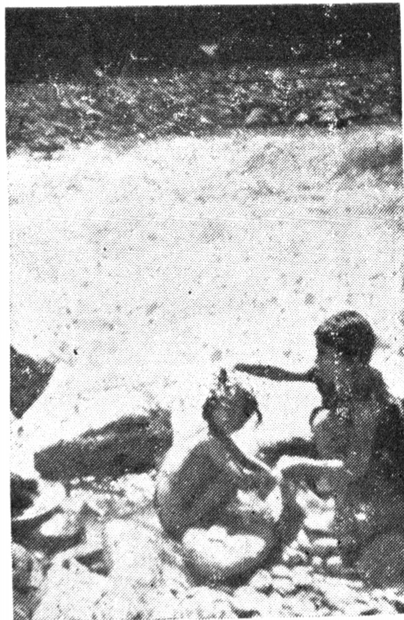
নীচে ঃ

পহলগাম আকাশে ঘনঘটা





লীডার নদী



স্নান—লীডারের ধারে

হস্তিনাপুর অর্থাৎ দিল্লীর প্রাধান্য সে যুগেও। এত দূরত্ব সত্ত্বেও এখান থেকেই সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছেন যুধিষ্ঠিরের হয়ে অর্জুন। তিনি এখান থেকেই অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়েছিলেন দিগ্বিজয়ে। যুধিষ্ঠির স্থাপন করেছিলেন নিজের নূতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ। সেও দিল্লীর পাশেই। অনেকে অনুমান করেন কুতুবের ওখানেই ইন্দ্রপ্রস্থের অস্তিত্ব ছিল।

ভারতের দক্ষিণ, মধ্য বা পূর্ব-পশ্চিম থেকে যে সব রাজারা এসেছিলেন, নূতন নগরী ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে তারা কি এই প্রান্তর দিয়েই গিয়েছিলেন? কত সময় লেগেছিল তাঁদের? অর্জুন এক বৎসরের জন্য যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে বেরিয়েছিলেন শুনি। তাহলেও তো কম সময় মনে করতে হবে। যেখানে গিয়েছেন যুদ্ধ করেছেন, জয় করেছেন সে দেশ, বিয়ে করেছেন তবে তো আর এক রাজ্যে ঢুকেছেন! মনে মনে হাসলাম। আবার ভাবলাম এমনি করেই হয়ত দিল্লীর অধিপতির শৌর্য বীর্য আর ঐশ্বর্যের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়েছে!

কিন্তু আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। ওদিকে যুদ্ধ না বাধলেও বাথরুমে ঢোকা নিয়ে সামান্য বচসা শুরু হয়েছে। বুঝতে পারলাম এক ভদ্রলোক বহুক্ষণ ধরে লাইন দিয়েও নাকি বাথরুমে ঢুকতে পারেন নি। তাঁকে অতিক্রম করে আর একজন ঢোকার চেষ্টায় ছিলেন। কথা শুনে মনে হল এর আগে হয়ত কোন ভদ্র-মহিলা ঢুকেছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁর একটু দেরি হয়ে থাকবে সকালের বেশবাস ঠিক করে নিতে। উনি এতক্ষণ মহিলার প্রতি সম্ভ্রমেই হয়ত কিছু বলেননি, কিন্তু ওঁকে পেছনে ফেলে একজন পুরুষ যাত্রীর ঢুকে পরার চেষ্টা করাতেই ওঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে মনে হল। লোক যাতায়াতে বারে বারে দরজা খোলা হচ্ছে। তাই ওঁর উত্তেজিত কণ্ঠ এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

আমার সামনের সীটের সেই নূতন বৌটি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। শাড়ী বদলে আর সদ্য প্রসাধন করে এসেছে। পরনে লাল টুকটুকে একখানি তাঁতের শাড়ী। লাল ব্লাউজ। রূপোলি জরির পাড় পাকে পাকে দীর্ঘ ঋজু বর-অঙ্গখানি জড়িয়ে আছে। শুভ্র ললাটে সিন্দূর বিন্দু। সিঁথিটিও রাঙা সিঁদুরের দীর্ঘ রেখায়। ভারী সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। কাছে আসতেই স্বামীটি চোখের ইশারায় ওদিককার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করল হয়ত। কে যেন ওর সারা মুখে আবীর মাখিয়ে দিল। মেয়েটি ভ্রূভঙ্গী করে অথচ মুচকি হেসে শাসন করল স্বামীকে। আমি চোখ ফেরালাম ওদিক থেকে। এদিকে সেই মা ও মেয়েতেও একটু মন-কষাকষি হয়ে গেল। মা বুঝি তার মেয়েকে ছোট্ট একটা

ব্রাশে করে পেস্ট দিয়েছিল দাঁত মাজবার জন্য। মেয়ে সবটুকু চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে তার সদ্‌গতি করেছে। নূতন মা বিরক্ত হয়ে ধমকাচ্ছে মেয়েকে। মেয়ে প্রথমে মার ধমককে আমলই দিল না। মুক্তোর মত সব কটি দাঁত বের করে হেসে মাকে বোধ হয় বোঝাতে চাইল এমন সুন্দর দাঁত আবার মাজাঘষার দরকার কি ? কিন্তু মার হয়ত মনে হল মেয়ে যখন ভয় পাচ্ছে না তখন আরো শাসন করা দরকার, না হলে শিক্ষা হবে না মেয়ের কি করে দাঁত মাজতে হয়। তাই চোখ রাঙিয়ে ব্রাশ সুদ্ধ মেয়ের হাত চেপে ধরতেই মার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল মেয়ের। ঠোঁট ফুলিয়ে মাথা নীচু করল। দু চোখে টলটল করছে জল। আমি আর থাকতে না পেরে হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিলাম বাচ্চাটিকে। আর মেয়েকে কাঁদতে দেখে মা এবাব হেসে ফেলল। এটা ওটা দেখিয়ে আর কথা বলে মেয়েটিকে শান্ত করার পর ওর মুখেও ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল। বেশ ভাব হয়ে গেল যখন তখন কচি হাত দুখানি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না প্রশ্ন করল, তুম কোন্? অর্থাৎ এতক্ষণে ওর খেয়াল হয়েছে আমি কে তার পবিচয় জানার। আমি একটু হেসে বললাম, দাদিজী। ওর যেন ঠিক বিশ্বাস হল না। আমাব মাথার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে। ও হয়ত ভাবছিল দাদিজীর মাথাটা সাদা নয় কেন ? কিন্তু একটু পরই আমাকে দাদিজী বলে ডাকতে শুরু করল। আমিও ওর নাম জেনেছি,—চম্পা! বেশ গল্প জমেছে ওর সঙ্গে, এমন সময় মা এসে ওকে নিয়ে গেল খাবার তৈরী হয়েছে বলে। আমার সঙ্গীরা প্রায় সবাই চায়ের খোঁজে গিয়েছে। ও রসে বঞ্চিত আমি তাই একা একা বসে আবার সেই পুরনো ভাবনার খেই তুলে নিলাম। দিল্লী আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল। তাই দিল্লীর কথাই ঘুরে ফিরে মনে আসছে।

দিল্লী অনেক দূর। এখন যান্ত্রিক যুগে অবশ্য অতটা দূরত্ব আর নেই। কিন্তু সেই পুরাকালে গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর সাথে হস্তিনাপুরের রাজপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বিয়ে কি করে সম্ভব হল? কান্দাহারকেই তো শুনি গান্ধার বলত তখন। রাজকন্যা এলেন কি করে এতদূরে, আর কতদিন লেগেছিল আসতে? কোন্ পথে এসে-ছিলেন? পাঞ্জাবের দিক দিয়ে এলেও তো সে পথের দুর্গমতা কম নয়! ভাষা, আচার-আচরণ কোন দিকেই মিল ছিল না নিশ্চয়ই। তবু বিয়ে হতে বাধেনি। তবে পরবর্তী যুগে এদেশের ছেলেরা আরো একটু এগিয়ে সাগর পার হয়ে বিদেশিনী মেয়ে বিয়ে করে আসলে এত আপত্তি হত কেন?

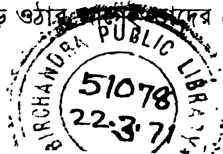
এতদিন আগেকার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। মোগল আমলেও অম্বররাজ মানসিংহের বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে দিল্লীশ্বর আকবরের। সে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু পথের দুর্গমতা সত্ত্বেও যেমন দিল্লীতে ছুটে এসেছে বহু দূর-দূরান্তর থেকে তেমনি সব কালেই দিল্লী থেকেও দেশবিদেশে ছুটেছে বীর যোদ্ধারা। পথের দুর্গমতা বা দূরত্বের জন্য বাধা পেলেও যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজ্য জয়ে বিরত হন নি। দুর্বার প্রাণশক্তিই যেন শত বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে।

সম্রাট আকবরের সময় কাবুল কান্দাহার সবই তাঁর রাজ্য। এদিকে উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে প্রায় কন্যাকুমারী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন সম্রাট আওরংজেব।

মনে হল সম্রাট আওরংজেবের কথা। প্রায় তিনশ বছর আগে উনি যখন দিল্লীর সম্রাট কাশ্মীর থেকে প্রায় কুমারিকা পর্যন্ত ওঁর রাজত্ব। ওদিকে কাবুল কান্দাহারও তাঁর রাজ্য। প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছেন। কিন্তু শেষের দিকে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহ শুরু হয়েছে স্থানে স্থানে। সম্রাট নিজে গিয়েছিলেন বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু দিল্লীতে ফেরা আর হল না। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত আর বার্ধক্যে অসুস্থ সম্রাটের মৃত্যু হল মধ্য ভারতের এককালীন রাজধানী দেবগিরি ফোর্টের কাছাকাছি আওরঙ্গাবাদে। পথের দূরত্ব আর দুর্গমতার জন্যও ফেরা সম্ভব হয়নি সম্রাটের। আরো প্রায় দুশো বছর আগেই পাগলা রাজা মহম্মদ বিন্ তুঘলক কিন্তু এই অসুবিধার কথা স্মরণ

করেই হয়ত দিল্লী থেকে রাজধানী সরিয়েছিলেন ভারতের প্রায় মধ্যস্থলে দৌলতাবাদে। বিচ্ছিন্ন একটা পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন নিরাপদ থাকার জন্য। কিন্তু বেশীদিন ওখানে রাজধানী রাখা সম্ভব হয়নি। দিল্লীর নাগরিক যাদের জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে তাদের ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। কিছুদূরে ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী থাকলেও দারুণ জলকষ্ট হয়েছিল এতগুলো লোকের। আর সারা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি হয়ত। ওখানে গিয়ে এই বিরাট দেশের শাসন ব্যবস্থারও কিছু উন্নতি হয়নি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায়। কাজেই তাঁকে আবার ফিরে আসতে হল দিল্লীতে।

মনে পড়ল সেবার নাসিক কংগ্রেস শেষ হবার পর আমরা একদল বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ইলোরা যাবার পথে এই ফোর্ট। ফোর্টে যাবার জন্য পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ি আছে। কিন্তু আরো একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে একেবারে ওপরে পৌঁছেছে। আমাদের গাইড্ একটা মশাল জ্বালিয়ে গল্প করতে করতে ওপরে নিয়ে যাচ্ছিল। মশাল বা কোন আলো সঙ্গে না থাকলে বা গাইডের সাহায্য না পেলে এপথে কারো ওপরে যাওয়া সম্ভব নয়। গাইড বলছিল কোন শত্রু যদি এপথে ওপরে যাবার চেষ্টা করে কি ভাবে তাদের বাধা দেওয়া হত। একে তো অন্ধকার সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ তারপর ওপর থেকে বুঝতে পারলেই পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। নীচু হয়ে পথের কাঁটা দেখতে গেলেই শত্রুকে প্রহরীর তরবারির আঘাতে প্রাণ দিতে হত। আর তাও যদি কেউ আরো ওপরে ওঠার চেষ্টা করে তখন ওপর থেকে তাদের ওপরে গরম তেল ঢেলে দেওয়া হত। ওপরে উঠে দেখলাম বিরাট একটা লোহার কড়াই আছে সেখানে। পাহাড়ের মাথায় সাদা পঙ্খের কাজ করা বাড়ি একটা। এতদিনেও বিশেষ কিছু হয়নি। ভালই আছে। তবে খুব বড় কিছু নয় দিল্লীর লালকেল্লার মত। আর ঘর বলতে আমরা যেমন বুঝি তাও নয়। এ যেন বারান্দা মত। তিন দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনেটা একেবারে খোলা। পেছনে কোন জানালার ব্যবস্থা নেই। বেগমদের আবরু রক্ষার জন্য সামনের দিকে পর্দার ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়ই। আর খোজা প্রহরী আর প্রতিহারিণী অবশ্যই ছিল। আরো ওপরে দুর্গের মাথায় যখন আমরা উঠেছি তখন মধ্যাহ্নসূর্য মাথার ওপর। গাইড আমাদের দেখালো একটা বিরাট কামান। এটা এমনভাবে স্থাপিত যে দূরে শত্রু দেখা গেলে পাহাড়ে ওঠার [illegible] তাদের মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু



অদ্ভুত বিশেষত্ব এই কামানের। প্রখর সূর্যকিরণেও একটুও গরম হয়নি এটি। বরং ভারী ঠাণ্ডা এর স্পর্শ। ওপরে ওঠার পরিশ্রমে আর রৌদ্রে আমাদের কষ্ট হয়েছিল খুব। মনে পড়ল, গাইডের কথায় কামানটিকে জড়িয়ে ধরে কি আরাম পেয়েছিলাম।

শুনলাম স্বাধীন ভারতে 'রাজাকর'রা নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এবং এই সুবিধাজনক জায়গা থেকেই ওরা ভারতীয় সেনা-বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিল। ওদের দেখা যায় না বা ওপরে এগনোও যায় না, কাজেই ওরাই অলক্ষ্যে থেকে গোলাগুলি ছুঁড়ে আমাদের সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করছিল। অবশ্য কর্ণেল জয়ন্ত চৌধুরী মাত্র চার দিনেই ওদের এই বিদ্রোহ দমন করেন। (পরে তিনি আমাদের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধে তাঁর কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখব আমরা।) গাইড আমাদের দেখালো পাহাড়ের গায়ে গোলাগুলির দাগ। এবং বেশ গর্বের সঙ্গে সেই যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিল। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বের দুর্গ আধুনিক কালে যুদ্ধের সময়ও নিরাপদ ঘাঁটি হিসেবে কাজে লেগেছে! আমি একটু অবাক হয়েই তাই চারিদিক দেখছিলাম লক্ষ্য করে। বহুদূর পর্যন্ত সমতলভূমি। বড় গাছও নেই যে আড়াল সৃষ্টি করবে। রাজাকররা এ সুযোগটা পুরো পেয়েছে। কিন্তু কর্ণেল চৌধুরী এ দুর্গের কোন ক্ষতি না করেও ওদের কাবু করেছিলেন ভেবে মনে মনে তারিফ করছিলাম ওঁর বুদ্ধি আর সাহসের। আর মনে হল জলের অভাবই হয়ত ওদের বিপদে ফেলেছিল। কারণ নীচে না নামলে জল পাবে কোথায়? এ পাহাড়ে কোন ঝরণা নেই। পাহাড়ে ওঠার পথে একটা বিরাট তালাও অর্থাৎ জলের রিজার্ভার দেখেছি। সেটা শুকনো খট্‌খটে। বৃষ্টি না হলে আর জল আসবে কোথা থেকে? একবিন্দু জল নেই পাহাড়ে।

ওখান থেকে নেমে আমরা কিছুদূরেই আওরংজেবের সমাধি দেখতে গিয়েছিলাম। কাছাকাছিই। অত্যন্ত সাদাসিধে আর জীর্ণ সমাধিমন্দিরটি। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও ভালো নয়। অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন মনে হয়েছিল আমার। আর একদল ভিখিরী আমাদের পিছু নিয়েছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে তাদের মধ্যে। ওখানে যে লোকটি দেখালো আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার মুখেও শুধু অভাবের কথা। ভারী করুণ মনে হল আমার। সমস্ত পরিবেশটাই যেন কেমন! আগ্রার তাজমহলের জাঁকজমক শুধু নয় ওখানে মমতাজ আর সাজাহানের প্রেমের কাহিনী যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল আমার চোখে। আর ঐ কি

ভারতেশ্বর শাহ্ সম্রাট আলমগীরের সমাধি ? মনে হয়েছিল খুব বেশীদিনের কথা তো নয়, এর ভেতরেই এমন জীর্ণ দশা কেন ?

ট্রেনের কামরার জানালায় বসে বসে পুরনো স্মৃতিচারণ করছিলাম। ভাবছিলাম, ঔরঙ্গাবাদ আর দিল্লীর দূরত্ব কত ? মৃত্যুর সময় সম্রাটের মনের অবস্থা কী হয়েছিল ? উনি কি আকুল হননি দিল্লী পৌঁছানোর জন্য ? কত দীর্ঘ দিন দিল্লী ছাড়া ! স্বপ্ন দেখছিলাম বুঝি সেই বিরাট বাদশাহী বহরের। ছোট্ট এক নদীর ধারে বিশাল প্রান্তরে অজস্র তাঁবু। চারিদিকে সৈন্যসামন্ত হাতিঘোড়া লোকজন হৈ-হল্লা কিন্তু তারি মাঝে সম্রাটের তাঁবুতে বড করুণ দৃশ্য ! বৃদ্ধ সম্রাট আকুল হয়ে প্রশ্ন করছেন, দিল্লী আর কতদূ-র ?

বৃদ্ধ হেকিম সাহেব এই শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে। কী উত্তর দেবেন ? দিল্লী যে তখনও অ-নে-ক-দূ-র।

কতক্ষণ এভাবে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ ভারী একটা গম্ গম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে চম্‌কে চেয়ে দেখি আমাদের ট্রেন যমুনা ব্রীজের ওপর উঠেছে। দিল্লী আর দূর নয়। সামনেই দিল্লী। কখন যে গাজিয়াবাদ স্টেশন ছেড়েছি খেয়াল করিনি। তাকিয়ে দেখলাম যমুনার ওপারে ঘন বৃক্ষের জটলার মাঝে কুতুবের চূড়া দেখা যাচ্ছে। দিল্লীর লালকেল্লাও চোখে পড়ল। অজান্তে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ল একটা।

এখন আর ভাবনার সময় নেই। নামতে হবে আমাদের। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরা সবাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যে যার জিনিসপত্র নিয়ে প্রস্তুত নেমে পড়ার জন্য। চম্পার দিকে ফিরে তাকালাম। ও-ও সেজেগুজে তৈরী। ওর মা হেসে বলল মেয়েকে, দাদিজীকো টা-টা করো-ও। চম্পা অমনি হাসি মুখে ছোট্ট হাতখানি দুলিয়ে টা-টা করল আমাকে। ওকে একটু আদর করে আমিও বিদায় নিলাম ওর কাছ থেকে। পথের আত্মীয়তা পথেই শেষ হল। মনটা একটু খারাপ হল ওকে ছেড়ে যেতে।

স্টেশনে নেমে অসম্ভব ভিড়। আমরা এতগুলো লোক সামনে এগিয়ে যাচ্ছি ট্যাক্সির খোঁজে। হঠাৎ পেছনে যেন চম্পার গলা শুনলাম। ডাকছে—দাদিজী ! পেছন ফিরে ভিড়ের ভেতর চোখে পড়ল না ওর কচি মুখখানি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হনহনিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম।

॥ ৬ ॥

স্টেশনের বাইরে এসে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল। কারণ লাগেজ ভ্যান থেকে মালপত্র বুঝে নিতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল। সঙ্গে মাল আমাদের প্রচুর। অমরনাথ যাব বলে চাল, ডাল, ঘি, তেল রান্নাবান্নার সব রকম ব্যবস্থা, বাসনপত্র সবই একটা বড় কাঠের বাক্সে প্যাক করে নেওয়া হয়েছে। আর শীতের দেশে যাচ্ছি এতগুলো লোকের বেডিং আর বড় বড় ট্রাংকও আছে। আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই প্রায় সব যাত্রী চলে গেলেন। আমরা প্রমাদ গুণ-ছিলাম। ট্যাক্সি না পেলে কী উপায় হবে? যাই হোক আমাদের ভাগ্য ভালো তখনও খানতিনেক ট্যাক্সি অবশিষ্ট ছিল।

দিল্লীতে কোথায় উঠব সে ভাবনা আমাদের ছিল না। বাংলাদেশের একজন এম, পি, ওঁর বিশেষ বন্ধু। তাঁর বাড়িটা এসময় খালি পড়েছিল। অবশ্য উনি না থাকলেও ঠাকুর, চাকর এবং আমাদের দেখবার শোনবার লোক ছিলই। ওখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

অসিত ঠাকুরপো আমাদের গাড়িতে উঠেছে। সঙ্গের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে বসে খোসমেজাজে ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। ড্রাইভার কোন্ দেশী লোক জানা নেই। তবু রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছে ওর বোধ হয় বাংলা বলতে ইচ্ছে হল না। রাজভাষা হিন্দীতেই শুরু করল কথা। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, ইস্ বখত্ মে বহুত্ ট্যাক্সি মিলতা, নেহিজী?

ড্রাইভার একটু হেসে ঘাড় নেড়ে জানালো, আভিতো মারকিট্ হ্যায় বাবুজী।

আমি তো অবাক! কিসের মারকিট রে বাবা! তারপর ড্রাইভারের কথা একটু মন দিয়ে শুনতেই বুঝতে পারলাম, এ মারকিটের সওদা আমরাই। অর্থাৎ এসময় যাত্রী প্রচুর হয়। আর যারা 'ভেষ্টিবুলের' যাত্রী তারা প্রায় সবাই ট্যাক্সি ধরেই দিল্লী শহরে যায়। কাজেই এসময়টা ওদের মোকা আরকি!

অত্যন্ত কৌতুক বোধ হল ড্রাইভারের কথায়। তাই প্রশ্ন করলাম, আপকা ঘর কাঁহাজী?

ও ভারিক্কী চালে গর্বভরে বেশ জোর দিয়েই আমার কথার জবাব দিল, গ‌্-গিয়া জিলা!

চমকে উঠলাম। ও হরি! এ যে সরষের মধ্যেই ভূত! খাস রাজধানীতে

আর একজন হিন্দুস্থানী ড্রাইভারের মুখেই ইংরেজী শব্দ! ভাবলাম পারলামেণ্টে আর কাগজে 'আংরেজী হঠাও' বলে হিন্দীভাষী সংসদ সদস্যদের যত গলাবাজি আর জোর আন্দোলনই চলুক না কেন ইংরেজদের এই ভাষাটা এমনভাবেই শেকড় গেড়েছে যে তাকে হঠানো সহজ নয়। এটা ভালো কি মন্দ সে বিষয় নিয়ে আমি তর্ক তুলব না। সে বিদ্যে-বুদ্ধিও আমার নেই, তবে যা দেখছি শুনছি তাতে একথাই মনে হচ্ছে।

কলকাতাতেও আমার বিহারী জমাদার রোশনলালের মুখে এমনি ইংরেজী শব্দ শুনে না হেসে থাকতে পারিনি।

জমাদার ছুটিতে দেশে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্য। তাই আমার অসুবিধা না হয় তারই ব্যবস্থা হিসেবে একজন বদলী দিয়ে যাবে। মাইনের কথা আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। কারণ এ তো জানা কথাই ওকে যা দিতাম তাই দেব। কিন্তু আমাকে অবাক করে ও চুপিচুপি আমাকে বলল যে, ওকে যা দিই তার থেকে কয়টাকা যেন একে কম দিই। একথা শুনে আমার খুশী হবারই কথা। হঠাৎ আমার ওপর এত সদয় হবার কারণ খুঁজছি মনে মনে, হয়ত আমার মুখের অবস্থা দেখেই জমাদারজী একটু লাজুক হাসি হেসে ব্যাপারটা আমার কাছে খুলেই বলল। অর্থাৎ আমার খুশী হবার কিছু নেই। বাকী টাকাটা দেশ থেকে ফিরে এলে যেন ওকেই দিই। আর একথাটা নূতন জমাদার যেন জানতে না পারে তাহলে ও মনে করবে এ 'চীট্‌বাজী' করছে ওর সঙ্গে।

জলের মত পরিষ্কার হল এতক্ষণে। ওর দেশোয়ালী ভাইএর কাছে ওর সততার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমাকেই ঠগবাজী করতে বলছে আর কি! ওর সাংসারিক বুদ্ধি আর ইংরেজী জ্ঞান দুটোরই তারিফ না করে পারিনি।

সৌভাগ্যক্রমে আমার মালিটিও হিন্দুস্থানী। বিহারের ছাপ্‌রা জিলায় বাড়ি। কোন কাজের কথা বললে তিনি প্রায়ই ভুলে যান। আর সেটার জন্য ক্ষমা চাইতেও তাঁর আপত্তি নেই। কিছু বলতে গেলেই বলবে 'বাই চানোচ্‌ ভুল হো গিয়া মাইজী। কসুর হো গিয়া ই'দফে মাফি কীজিয়ে।' বকব কি! ওর মুখে 'বাই চানোচ্‌' (by chance) শুনলেই আমি হেসে ফেলি। 'কসুরে'র কথা আর মনে থাকে না।

তবে এটা কলকাতার জল বাতাসের গুণ মনে করতাম। দিল্লীতে এসেও যে এমনি ইংরেজী-হিন্দী শুনতে পাব তা ভাবিনি। তাইতেই বেশী চমক লাগল মনে। যাই হোক গয়া জিলার কথা শুনে ওর সঙ্গে আমিও গল্প শুরু করলাম

এবার। কালকেই তো গয়ার ওপর দিয়ে এসেছি। আর কথার ফাঁকে এমনি আরো ইংরেজী জ্ঞান আমার বাড়তে লাগল। (বা হিন্দী জ্ঞানও বলা যেতে পারে!)

বাংলা ভাষাতেও বহু ইংরেজী শব্দ বহুদিন ধরেই চলে এসেছে এবং এখনও আসছে। কিন্তু আমরা সেটা সহজভাবেই গ্রহণ করেছি, আর তাইতেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক ভাষাতেই এমনি আদান প্রদান চলে। কিছু অত্যুৎসাহী হিন্দী প্রেমিক কিন্তু শুদ্ধ হিন্দী চালাবেন বলে স্থির করেছেন। শুনতে পাই অনেক স্থলে ইংরেজীর পরিবর্তে এমন সব হিন্দী প্রতিশব্দ তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন যা কিনা অনেকের হাসির খোরাক যুগিয়েছে। শুধু ইংরেজী নয় বাংলার প্রতিও তাঁদের একই মনোভাব। অর্থাৎ কোন বাংলা শব্দও তাঁরা গ্রহণ করবেন না। অথচ নীচের তলার লোকেদের প্রতিদিনের কাজে-কর্মে কত যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার হচ্ছে কে তার খোঁজ রাখে! বানের জলের মত অপ্রতিরোধ্য এর অনুপ্রবেশ। ভালো মন্দের প্রশ্ন নয়। এ গতি রোধ করা অসাধ্য বলেই আমার মনে হচ্ছে।

আর এদের গ্রহণ করার ক্ষমতাও অদ্ভুত। ইংরেজী শব্দের সঠিক অর্থ না জেনেও কিন্তু ঠিক জায়গা মতই ব্যবহার করছে কথাটি। এও ভারী মজার ব্যাপার!

অনেকদিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ল। সেবার নাসিক কংগ্রেসে গিয়েছি। সর্দারজী প্যাটেল আর নেহরুজী দুজনেই উপস্থিত সভায়। ওপন সেশানে ওঁরা দুজনেই বোধহয় ভাষা নিয়ে কিছু বললেন। তখন থেকেই ভাষা-ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের ধুয়া উঠেছে। নেতাদের কথা সব বুঝিনি তবে যা বুঝলাম —তাই যথেষ্ট। আর ওঁদের দেখতে পেলাম সেই আনন্দেই মন ভরে নিয়ে সভার বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখনও আমি শহুরে হইনি—অর্থাৎ কলকাতাবাসী হইনি। গ্রাম্য বধু। তাই ভিড় এড়িয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ এক দেহাতী বৃদ্ধা আমার পিঠে একখানি হাত রেখে অনাবিল হেসে আমাকে প্রশ্ন করল, দিদি তু আর হাম তো একই হ্যায়, ফারাক হ্যায় কুছ?

মনে আছে আমি একটুখানি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম, "কুছ না।"

বেশী কথা বলতে শিখিনি তখনও। জমিদারবাড়ির বৌ। বাইরের জগৎ আমার কাছে একেবারেই অদেখা, অচেনা। কিন্তু ঐ বৃদ্ধার সহজ সরল কথার অর্থ বুঝতে আমার তো একটুও দেরি হয়নি। তারপর সেই বৃদ্ধা কত কথাই

বললেন। নেতাদের যে ভাষা সহজেই বুঝতে পারিনি এখন সেটা জলের মত সরল হল আমার কাছে। আর দুজনেই একমত হলাম যে ভাষা নিয়ে এত কচকচি কেন? আমাদের দুজনের তো কই মনের কথা বুঝতে বা বোঝাতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না? একই দেশের মেয়ে আমরা মুখের বুলিটাই কি আসল? তাই কি আমাদের তফাৎ করতে পারে? সেদিনের সেই স্নেহের পরশটুকু যেন আজও লেগে আছে আমার পিঠে। প্রায় বিশ বছর আগে সেই বলিরেখাঙ্কিত মুখখানিও উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনে। একটিও দাঁত নেই মুখে কিন্তু কি সরল শিশুর মত হাসিটি!

বৃদ্ধার প্রথম প্রশ্নটি, "দিদি তু আর হাম তো একই হ্যায়, ফারাক হ্যায় কুছ ?" বার বার মনের ভেতর তোলাপাড়া করতে লাগলাম। সেদিনের সেই দুটি নারীর মধ্যে ফারাক তো ছিলই, সব বিষয়েই। প্রথমেই বয়সের ফারাক। একজন বৃদ্ধা, আর একজন অল্পবয়সী। একজন গ্রাম্য চাষীর পরিবার, আর একজন জমিদার-বাড়ির বৌ। বেশে-বাসে প্রচুর ফারাক। আর সবচেয়ে বড় ফারাক ছিল হয়ত তারা দুজনেই ভিন্ন ভাষাভাষী এবং ভিন্ন প্রদেশবাসী। কিন্তু তবু তারা একাত্ম হতে পেরেছিল তার কারণ দুজনেই মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিল একটি স্বাধীন দেশের মেয়ে তারা। প্রদেশের বেড়া তাই তাদের মিলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। তাদের মনের সবচেয়ে বড় মিল যে ঐখানেই। সেখানে কোন 'ফারাক' নেই। উভয়েই ভারতবাসী। তাই আমার মনেও পড়েনি ঐ বৃদ্ধা কোন্ প্রদেশের বাসিন্দা তার খোঁজ নেবার। বা আমাকেও ও বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেননি। কিন্তু এখন কি সেই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেবে আমাদের সামনে?

॥ ৭ ॥

বাসায় পৌঁছতে আমাদের বিশেষ সময় লাগল না। যদিও এটা সকালবেলা, অর্থাৎ অফিস টাইম। তবু কলকাতার মত ট্রাম বাস বা গাড়ির ভিড় নেই তো। তবে হ্যাঁ, একসঙ্গে এত সাইকেল আরোহী কলকাতায় চোখে পড়বে না। এ যেন সাইকেলের প্রসেশান। কিন্তু তার জন্য গাড়ি যাবার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ট্রাফিক জ্যাম হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। দুধারের বড় বড় গাছের ছায়ায় ফুটপাত দিয়ে এরা নিশ্চিন্তে সাইকেল চালাচ্ছেন। কলকাতার রাস্তায় যেমন

প্রাণ হাতে নিয়ে সাইকেল চালাতে হয় এদের সে ভয় নেই। এরা নির্বিঘ্ন সে দিক দিয়ে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে একটা প্রোগ্রাম ঠিক করা হল দিল্লী এবং কাছেপিঠের দর্শনীয় স্থানগুলি কি ভাবে দেখা হবে। চারদিন সময় আমাদের হাতে। এর মধ্যেই সব দেখে নিতে হবে। আমাদের ভেতর অনেকেরই এই প্রথম দিল্লী আসা। আমি অবশ্য এর আগে কয়েকবার এসেছি এবং এবারকার যা প্রোগ্রাম হচ্ছে সে জায়গাগুলো আমার আগেই দেখা। তবু অধিকন্তু ন দোষায়, আর একবার করে দেখলে ক্ষতি কি? তাই আমারও এতে উৎসাহ কম নেই। বরং বেশী বলা চলে। আর আমি কিছু কিছু গাইডের কাজ করতে পারব। এবং দলের ভেতর সেদিক দিয়ে একটি বিশেষ স্থান আমার। আর পুরনো স্মৃতি আবার নূতন হয়ে উঠবে সেটাও কম নয়। সকলের পরামর্শমত প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে দিল্লী দেখে নিয়ে তারপর বৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা আর ফতেপুর সিক্রী দেখা ঠিক হল। সময় হাতে থাকলে হরিদ্বারটাও দেখা হবে।

ওঁর এক পাঞ্জাবী বন্ধু আমাদের বেড়াবার সুবিধের জন্য দুখানা গাড়ি আর ড্রাইভার দিয়েছেন। তাতেই অল্প সময়েও অনেক কিছু দেখার সুবিধে।

বিকেলের দিকে দিল্লীর সবচেয়ে দূরের দর্শনীয় স্থান কুতুব দেখতে গেলাম।

দিল্লী আমি আগেও এসেছি। আর যতবারই আসি সুযোগ পেলেই কুতুব-মিনার, লালকেল্লা এগুলো দেখতে যাই। এই ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে আমার বড় ভালো লাগে। ইতিহাস পড়তেও আমার বড় ভালো লাগে। যদিও সাল তারিখগুলো কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। আমাদের ভেতর যারা নূতন এসেছে দিল্লীতে তারা দল বেঁধে সব গাইডের সঙ্গে ঘুরছে। আমি নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মিনারে ওঠার পথ এখন বন্ধ করে রেখেছে তালা দিয়ে। জিজ্ঞেস করে জানলাম আর খবরের কাগজেও দেখেছি দু-একজন ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে বলেই এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

আমি মিনারের ছায়ায় বসে অসিত ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করছিলাম। হঠাৎ প্রথমবার এখানে আসা আর মিনারে ওঠার ঘটনা মনে পড়ে হাসি পেয়ে গেল।

সে অনেকদিন আগের কথা। সেবার জয়পুর কংগ্রেস থেকে ফেরার পথে ঘুরতে ঘুরতে আমরা দিল্লী এসেছি। কুতুবে ওঠার তখন বাধা ছিল না। উনি আর আমি মিনারে উঠছি। মিনারের ভেতর দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি ওপরে

উঠছে। যত ওপরে উঠছি সিঁড়িগুলো ততই সংকীর্ণ আর ধাপগুলো উঁচু উঁচু। ভেতরে আলো আর বাতাস আসার জন্য ছোট ছোট ঘুলঘুলি। বেশ কষ্ট হচ্ছিল নিঃশ্বাস নিতে। উঁচু তো কম না! আমরা তখন প্রায় ওপরে পৌঁছে গেছি, মানে বেশীটাই উঠে গেছি। এমন সময় দশাসই চেহারার এক অবাঙ্গালী ভদ্রলোক নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু ওখানে পথ এত সংকীর্ণ যে ওঁর পক্ষে আমাদের পাশ কাটিয়ে নামা অসম্ভব। ভদ্রলোক বল্লেন যে, ঠিক হ্যায়; আপ আগারি উপ্পর আইয়ে।

ভদ্রলোক ভদ্রতা করে ওপরে উঠে গেলেন। কিন্তু ঐটুকুন সিঁড়ি উঠতেই আমাদের দম বেরুনোর যোগাড়।

আমাদের উঠতে দেরি দেখেই হয়ত উনি আবার কয়েক ধাপ নেমে এলেন। ততক্ষণে আমরা আরো একটু ওপরে উঠেছি। সেই অনুপাতে পথও ছোট হয়েছে। আমার স্বামী এবার ভদ্রতা করে বল্লেন, আইয়ে না, কুছ হর্‌জা নেই।

উনি তো বল্লেন, "কুছ হর্‌জা নেই," আমি কিন্তু তখন বিপদ গুনছি মনে মনে। তখন যা-ও বা উপায় ছিল কিন্তু এখন তো অসম্ভব।

এবার ভদ্রলোক নেমে এলেন। ওঁর ঐ শরীরে বার বার ওঠানামা করাও মুশকিল। তাই আমার স্বামীর কথায় নেমেই এলেন। উনি যতদূর সম্ভব দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে পথ ছেড়ে দিতে চেষ্টা করলেন। ঐ ভদ্রলোকের মত না হলেও ইনিও চেহারায় কম নন। তারপর জানুয়ারী মাস। দিল্লীর শীত। দুজনেরই গায়ে প্রচুর শীতবস্ত্র। ভদ্রলোক যখন ওঁর কাছে পৌঁছলেন তখন কেউ আর কাউকে ছাড়াতে পারছেন না। এমনি আটকেছেন যে কারোরই আর অপরকে ছাড়িয়ে নীচে নামা বা ওপরে ওঠার যো নেই। তবে দুজনেই চেষ্টা করছেন প্রাণপণে।

আমি তখন রুদ্ধশ্বাসে ঊর্ধ্বমুখে ওঁদের এই কসরত প্রত্যক্ষ করছি। আর ভাবছি নীচের দিকে পালাবো কিনা? কিন্তু কতদূরই আর যাব? তার আগেই যদি দুজনেই ওঁরা গড়িয়ে আমার ঘাড়ে পড়েন? ওপর দিক থেকে আলো এসে পড়েছে ওঁদের মুখে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে দুজনেরই। অবশেষে ভদ্রলোক কোনক্রমে নীচের ধাপে নামতে পেরে হাঁপাতে হাঁপাতে আর হাসতে হাসতে পালোয়ানী কায়দায় আমার স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমিও হাঁপ ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম একেবারে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হল না বলে।

ঐ অবস্থায় দুজনের করমর্দনও দেখার মতই হয়েছিল। হয়ত দুজনেই দুজনের

চেহারার তারিফ করেছিলেন। এখন সে দৃশ্য মনে হতেই আমার হাসি চাপা দায় হল।

অসিত ঠাকুরপো প্রশ্ন করল, হাসছ কেন? আমি বললাম, অকারণে হাসাটাই আমার একটা রোগ। আর কারণ থাকলেও সব কথাই কি তোমাকে বলা যায়।

পরে অবশ্য আমার মুখে গল্পটা শুনে নিয়ে ও-ও হেসেছিল একচোট। আর দাদার দেহের সম্বন্ধে কটাক্ষ করে যা মন্তব্য করল তাতে আমি চোখ রাঙিয়ে ওকে থামিয়ে দিলাম।

॥ ৮ ॥

পরদিন সকালেই আমরা বের হলাম গান্ধীঘাটের উদ্দেশে। জাতির জনক মহাত্মাজীর শেষ স্মৃতিটুকু এখানে ছড়িয়ে আছে। প্রথম যেবার এসেছিলাম তখন শুধু একটা বেদী ছিল ওঁর চিতার জায়গায়। আর লেখা ছিল, 'হে রাম'। ছোট্ট বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ফুল বিক্রী করত ঠোঙ্গা করে যেমন তীর্থস্থানে পাওয়া যায়। আমরাও কিছু ফুল কিনে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম বাপুজীকে। এবার ওঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ঘাট পর্যন্ত রাস্তা তৈরী হচ্ছে দেখলাম। বাগান, বসার জায়গা, সবই সুন্দর করে সাজানো। তবে এখনও কাজ শেষ হয়নি। আরো অনেক কিছু হবে শুনতে পেলাম।

পাশেই শান্তিবন। সেখানে আমাদের প্রিয় নেতা পণ্ডিতজীর শেষ কাজ হয়েছে। দেশবিদেশ থেকে কত জ্ঞানী, গুণী ও সম্মানিত ব্যক্তি এসেছেন সে সময়। মিলিত হয়েছেন এই যমুনাতীরে।

আবার ছোট্ট মানুষ শাস্ত্রীজী তিনিও বড়ই প্রিয় ছিলেন আমাদের। তাঁরও শেষ শয্যা রচিত হয়েছে তাঁর প্রিয় নেতার পাশেই।

দেখেছি ওঁকে মালদায় ঘরোয়া পরিবেশে। সাদাসিধে আমাদের ঘরের মানুষটিকে। যেন পরমাত্মীয় আমাদের।

দেখেছি দার্জিলিং-এ একটি সদা প্রফুল্ল পরিহাসপ্রিয় মানুষকে।

ওখানে প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছে। তখন উনি কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফারাক্কা ব্যারাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ওঁকে বলাতে

উনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন, উ তো হাম জানতে হেঁ, উ তো হাম মানতে হেঁ, লেকিন,—

বোধ হয় কেন্দ্রের আর্থিক অসুবিধার কথাই বলতে চেয়েছিলেন। ওঁর কথা শেষ হতে দিলেন না ডাঃ রায়। বলে উঠলেন, আমার একটা গল্প মনে পড়ছে আপনার কথা শুনে। তারপর শুরু করলেন সেই শ্রুতিধর রাজার কথা যিনি বলেছিলেন, যে কেউ তাঁর কাছে নূতন শ্লোক রচনা করে বলতে পারবে তাকেই তিনি পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু একবার শুনলেই সেটা তাঁর কাছে পুরনো হয়ে যায়। তাই কেউ আর সে পুরস্কার পায় না। অবশেষে এক চতুর ব্রাহ্মণ এমন একটি শ্লোক রচনা করল যার অর্থ, রাজার কাছে সে বহু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পায়। রাজা শুনে বললেন, "এ তো আমি জানি।"

এবার আর রাজার ফাঁকি দেবার উপায় থাকল না। সভাসুদ্ধ লোকের মাঝে উান স্বীকার করলেন ব্রাহ্মণের কাছে, যে সত্যিই ঐ পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের প্রাপ্য।

গল্পটা বলে ডাঃ রায় হেসে উঠলেন, এবার আর শাস্ত্রীজীর উপায় নেই। উনি স্বীকার করেছেন আমাদের দাবি।

শাস্ত্রীজীও কম পরিহাসরসিক ছিলেন না। হেসে জবাব দিলেন, ডাঃ রায় আমার চেয়ে চেহারায় বড়, বিদ্যায় বড়, বুদ্ধিতেও বড। ভগবান ওঁকে সব বিষয়ে বড় করেই গড়েছেন! সকলের মিলিত হাসিতে ওঁর কথা আর শোনা গেল না। ওঁরা দুজনেও প্রাণ খুলে হেসেছিলেন আমাদের সঙ্গে। এতদিনে ওঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ হতে চলেছে। ফারাক্কার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আবার দেখেছি ওঁকে দুর্গাপুরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কনফারেন্সে। তখন উনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

সেদিন কংগ্রেসের ওপন সেশন। অসম্ভব ভিড়। মাটির মানুষ শাস্ত্রীজী মঞ্চ থেকে নেমে এসে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে মাটিতে আসন গ্রহণ করলেন। মঞ্চের ওপর থেকেই ওঁর এক আত্মীয় বা পরিচিত বন্ধুকে দেখতে পেয়েছিলেন। কারো বারণ শোনেননি। সকলের উৎকণ্ঠা, অনুরোধ, উপরোধ তুচ্ছ করে বহুক্ষণ ধরে গল্প করলেন আমাদের মধ্যে বসে। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

মনের পর্দায় ছবির মত ভেসে উঠতে লাগল সব। যেমন ফুলের মত নরম ছিল তাঁর মন তেমনি বজ্রের মত কঠিন ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। কোন দিন কোন কাজে পেছপা হননি। পণ্ডিতজীর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। তাই সকল দুরূহ কাজেই শাস্ত্রীজীর ডাক পড়ত। পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পর তাই সমগ্র দেশবাসীর

মিলিত ইচ্ছায় তিনিই হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। স্বল্পকালই তিনি এ ভার বহন করেছেন কিন্তু ছাপ রেখে গেছেন আমাদের মনে।

দেশের বড় দুর্দিন তখন। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। সেই ছোট্ট হাসিখুশী মানুষটি দেশের সে চরম সঙ্কট মুহূর্তে যে দৃঢ়চিত্ততা ও সাহসের পরিচয় দিলেন ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে রইল।

তারপর তাসখন্দে সেই অবিস্মরণীয় শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্তটিও দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করে গেলেন। বিদেশে আত্মীয় বান্ধবদের থেকে বহুদূরে প্রাণ দিলেন তিনি। মরদেহ তাঁর ফিরে এলো স্বদেশে। তাঁর প্রিয় নেতার পাশে শেষ শয্যা রচিত হল।

বাপুজী গিয়েছেন, পণ্ডিতজী গিয়েছেন, শাস্ত্রীজীকেও হারালাম আমরা। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সমগ্র দেশ আর একবার হাহাকার করে উঠল।

তিন মহানায়ক পাশাপাশি যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। তিনজনের উদ্দেশেই মনে মনে শ্রদ্ধা জানাই। জাতিধর্মনির্বিশেষে কত দীন-দুঃখী, ধনী-নির্ধন, স্বদেশী-বিদেশী কতজনের চোখের জলে ভিজেছে এই মাটি! আমারও চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

মনে পড়ল সেদিনের কথা। মহাত্মাজী এসেছেন সোদপুরে। আমরাও গিয়েছি ওঁকে দেখার আশায়। সোদপুরের গান্ধী সতীশ দাশগুপ্তের আশ্রমে উঠেছি। মহাত্মাজীও ঐ আশ্রমেই আছেন। শুনলাম সেদিন ওঁর মৌন দিবস। কারো সঙ্গেই কথা বলছেন না। তার জন্য আমার কোন আপসোস হয়নি। কারণ ওঁর সঙ্গে কথা বলতে তো আসিনি। শুধু দেখব ওঁকে।

শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত আমাকে হেসে প্রশ্ন করলেন, তুমি কেন এসেছ? আমি উত্তর দিয়েছিলাম, ওঁকে দেখব তাই। উনি আবার প্রশ্ন করলেন, শুধুই দেখবে? আর কিছু ইচ্ছে নেই? ধর লোকে যেমন মন্দির দেখে, দেবতা দেখে, তেমনি শুধু ওঁকে দেখবে তুমি? আমি মাথা নেড়েছিলাম, ঠিক তাই। ওঁকে দেখলেই আমি খুশী।

বিকেলবেলা যখন উনি ছোট ছোট দুটি মেয়ের ঘাড়ে হাত রেখে হন হন করে হাঁটছিলেন আশ্রমের বাগানের পথে, পথের ধারেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হাত দুটো জোড় করেছিলাম শুধু নমস্কার করার জন্য। তার আগেই উনি দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন। মৃদু হেসে তাকালেন আমার দিকে। আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে

গিয়েছিলাম, প্রতিনমস্কার করতেও ভুলে গেলাম আমি।

পরে আবার শ্রীদাসগুপ্ত আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, দেখা হল তো? উনি আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেই একথা বলেছিলেন হয়ত।

নিজেকে দিয়েই সেদিন বুঝেছিলাম কেন সারা দেশ ওঁকে বাপুজী বলে ডাকে। কত প্রিয় ডাক! এর চেয়ে প্রিয় আর কি হতে পারে?

সকাল প্রায় আটটার সময় আমরা লাল কেল্লায় পৌঁছালাম। বেরিয়েছি আমরা অনেক সকালে তাই চা না খেয়ে আর কেল্লা দেখার উৎসাহ বোধ করছিল না কেউ। কাজেই গেটের সামনেই চা খেয়ে নিল ওরা।

তারপর ভেতরে ঢুকে দেখার পালা। দেওয়ানী খাস ও দেওয়ানী আম দেখার পর আমরা চললাম স্নানের ঘরের দিকে। আগেও দেখে গেছি তবু একজন গাইডের গল্প শুনতে শুনতে না দেখলে ঠিক ভালো লাগে না যেন। বেগম সাহেবারা গ্রীষ্মকালে তাঁদের কুসুমকোমল তনু গোলাপজলের শীতলধারায় স্নিগ্ধ করে কেমন অপরূপা হয়ে উঠতেন আবার শীতকালে তাঁদের কোমল অঙ্গ ঈষৎ উষ্ণ সুরভিত জলে পরিমার্জনা করতেন এবং কিভাবে সেই জল গরম হ'ত এগুলো দেখা এবং শোনার জন্যই গাইডের দরকার। আমাদের একজন ভালো গাইড মিলেছিল। যমুনার জল স্নানের ঘরে কতদূর থেকে কিভাবে নিয়ে আসা হয়েছে, কে সে ইঞ্জিনীয়ার যিনি সত্তর মাইল উজান থেকে পাথরের পাইপ দিয়ে এ জল আনার ব্যবস্থা করেছিলেন সবই সুন্দরভাবে গল্প করে করে দেখাচ্ছিল। এ যেন রূপকথা শোনার মত মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমরা।

মছলি ভবনের কাছে এসে হঠাৎ আমার মনে পড়ল, স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায় একবার স্যার যদুনাথ সরকারের সঙ্গে লাল কেল্লায় এসেছিলেন। আমরা গাইডের কাছে যা শুনছি তার চেয়ে ঢের ভালো গল্প তিনি শুনেছিলেন নিশ্চয়ই। কিরণবাবুর সঙ্গে তাঁর একটি চাকর এসেছিল। সে কিন্তু কোনটাতেই কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু যেই বাদশা-বেগমদের মাছ ধরার গল্প শুরু করেছেন স্যার যদুনাথ, অমনি ও উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, কোন্ মাছ কত্তা? যে যে বিষয়ে আনন্দ পায় আর কি।

এ গল্পটা আমার স্বামীর মুখেই শুনেছিলাম। এখন সেটা আমি ওদের গল্প করে শোনালাম। সবাই বেশ উপভোগ করল। রাজা বাদশাদের আমরা পছন্দ

করি না। বর্তমানে তাঁদের যাতে কোন সুখ-সুবিধা না থাকে তার জন্য আমরা সংসদে সুপারিশ করছি কিন্তু অতীতের বাদশা-বেগমদের ভোগবিলাসের এইসব স্মৃতিচিহ্ন দেখে তো কই খারাপ লাগছে না? বরং সকলেই যেন সেই রঙ্গীন দিন-গুলির কল্পনায় মশগুল। এইটেই মজার ব্যাপার, দিল্লী এলে কেউ এগুলো না দেখে ফিরবে না। আর এসবই যদি না দেখল তবে দিল্লী আসা কেন?

ফেরার পথে আমরা পণ্ডিতজী যে বাড়িতে ছিলেন সেই তিনমূর্তি ভবনের সামনে দিয়ে আসছিলাম। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। পণ্ডিতজীর মৃত্যুর মাসকয়েক মাত্র আগে একবার দিল্লীতে এসেছিলাম। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী তখন অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স ডেকেছিলেন। সম্ভবতঃ ভারতের সব প্রদেশের প্রত্যেক জেলার কিছু কিছু প্রতিনিধি এখানে জড়ো হয়েছিলাম। কনফারেন্স-শেষে ইন্দিরাজী ওঁর বাড়িতে আমাদের সন্ধ্যায় চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিলেন। ওঁর বাড়ির ভেতরের লনে আমাদের চা ও খাবারের ব্যবস্থা ছিল। শান্তিনিকেতন দলের রামায়ণ গান এবং নৃত্যনাট্যের ব্যবস্থাও ছিল এনটারটেনমেণ্টের জন্য। আমরা শেষ বাসে এসে যখন পৌঁছলাম তখন খাবারদাবার শেষ। নৃত্যনাট্য শুরু হয়ে গেছে, টেবিলের পাশে শুধু কয়জন চাপরাসী দাঁড়িয়েছিল। আমি চা খাই না কিন্তু খুব তেষ্টা পেয়েছিল বলে জিজ্ঞেস করলাম, ঠাণ্ডা পানি হ্যায়?

চাপরাসী সহাস্যে উত্তর দিল, সব ওড়া গিয়া মাঈজী। হবে কি? পণ্ডিতজীর বাড়িতে ওঁর সাথে দেখা হওয়ার লোভ সকলেরই। আমরা বোধহয় চার-পাঁচশ মেয়ে। তারপর যাদের কাছাকাছি বাড়ি তারা ছেলেমেয়েও সাথে করে এনেছে। কাজেই এই অবস্থা। পরে অবশ্য আমাদের খাবার আনিয়ে দিয়েছিলেন ইন্দিরাজী। কিন্তু রামায়ণ গান শেষ হবার সাথে সাথেই প্রায় সবাই ছুটতে শুরু করল। কারণ চাপরাসী খবর দিল, পণ্ডিতজী আমাদের সাথে দেখা করবেন। পড়িমরি করে সবাই ছুটছে। পণ্ডিতজী অসুস্থ মানুষ কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন? যদি দেখা না হয়?

আমি যখন হলঘরটায় ঢুকলাম দেখি সব মেয়ে ওঁকে নমস্কার করে লাইন করে বেরিয়ে যাচ্ছে। পণ্ডিতজী ওপরে ওঠার সিঁড়ির পাশে মেয়ের সাথে দাঁড়িয়ে। যুক্তকরে সকলের নমস্কার গ্রহণ করছেন। বেশীক্ষণ কেউ দাঁড়াচ্ছে না। এত মেয়ে সবাই দেখতে চায় পণ্ডীতজীকে। আমিও নমস্কার করেই বেরিয়ে যেতাম কিন্তু হঠাৎ একটি দৃশ্যে আমার গতিরোধ হল। অল্পবয়েসী একটি মেয়ের কান্না দেখে থেমে গেলাম আমি। ও তখন পণ্ডিতজীর পায়ে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদছে। উনি দু'হাত বাড়িয়ে বুকের কাছটিতে ধরে তুললেন মেয়েটিকে আর

সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'ফির মিলেঙ্গী মাঈ।'

ইন্দিরাজী ব্যাকুল হয়ে একহাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে আর একহাতে একটু দূরে সরিয়ে দিলেন মেয়েটিকে। হয়ত ভাবছিলেন, অসুস্থ পিতার উত্তেজনায় ক্ষতি হবে কিছু।

আমি যখন বেরিয়ে আসি তখনও মেয়েটি বাইরে যাবার দরজার চৌকাঠটা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পরে রাতে খাবার সময় ওকে জিজ্ঞেস করলাম, অমন কাঁদছিলে কেন?

ও একটু লাজুক হেসে উত্তর দিল, কেয়া মালুম? সমঝ্ মে নেই আতা।—

অর্থাৎ কি জানি কি হল আমি বুঝতে পারলাম না। সত্যিই এমনি একটি মুহূর্ত আসে জীবনে যখন মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই এমনি এক-একটা কাজ করে বসে। পরে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এও ঠিক তাই।

কিন্তু পণ্ডিতজীর কথা কি ঠিক হয়েছিল? মেয়েটি কি ফের দেখতে পেয়েছিল পণ্ডিতজীকে? কে জানে! যেদিন অকস্মাৎ ওঁর মৃত্যু সংবাদ শুনি সেদিনও ঐ ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আর কানে বেজেছিল, 'ফির মিলেঙ্গি মাঈ'। সে কণ্ঠস্বর তো ভোলার নয়!

আজ শূন্য বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আবার সেদিনের স্মৃতি জেগে উঠল মনে। কানে বাজতে লাগল ওঁর মমতা-মাখানো কথা কটি—

'ফির মিলেঙ্গী মাঈ।'

পরে মনে হল উনি তো ঠিকই বলেছিলেন। মৃত্যুর পর উনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন। মৃত্যুর পূর্বে উনি শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেলেন, যেন ওঁর চিতাভস্ম ভাসিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গার জলে, আকাশ থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ভারতের সর্বত্র।

আজ তাই উনি মিশে আছেন আকাশে-বাতাসে, মিশে আছেন ভারতের জলবায়ু মৃত্তিকার অণুতে পরমাণুতে, মিশে আছেন আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে।

॥ ৯ ॥

তৃতীয় দিন খুব ভোরে আমরা দুটো গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম। মথুরা, বৃন্দাবন এবং আগ্রা দেখে ফিরব। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আমাদের ফিরে আসতে হল। যমুনার বানের জল রাস্তার ওপর উঠেছে। কোনক্রমেই যাবার উপায় নেই। দিল্লী-মথুরার বাসগুলোও ফিরে আসছে দেখলাম।

বাড়ি ফিরে এসে সকলেরই মন খারাপ। কলকাতা থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখানেও বৃষ্টি চলছে। বিরাম নেই। ভোরবেলা যা একটু পরিষ্কার ছিল আকাশ। তাই আমরা বেরোতে পেরেছিলাম। কিন্তু তবু তো যাওয়া হল না। এখন কি করা যায় তাই নিয়ে পরামর্শ শুরু হল। কেউ বলছে দিন ভালো থাকলে কাল সকালে চণ্ডীগড় যাবার কথা। কিন্তু আমরা মেয়েরা হরিদ্বার যাবার দিকেই মত দিলাম। তখন দেখা গেল বেশীর ভাগই হরিদ্বার যাবার পক্ষে। কাজেই হরিদ্বার যাওয়াই ঠিক রইল। চণ্ডীগড় নূতন তৈরী শহর। শুনেছি খুব সুন্দর তার নগর-পরিকল্পনা। কিন্তু প্রকৃতির কোলে হরিদ্বার আপন সৌন্দর্যে সুন্দর। তাই হরিদ্বার একবার গেলে বার বার যেতে চায় মন। আমারও টান হরিদ্বারের প্রতি, আরো দুবার গিয়েছি আগে তবু যেন পুরনো হয় না।

বিকালে আমরা একটু বেরিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে। ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। কিন্তু কিছুদূর যেতেই পথের ওপর অন্য গাড়িগুলোর যা অবস্থা দেখলাম তাতে আর এগোনোর সাহস হল না। রাজপথে প্রবল স্রোত। জলও দাঁড়িয়েছে বেশ। কলকাতার চেয়ে জলনিকাশী ব্যবস্থা খুব ভালো বলে মনে হল না। ওদিক থেকে ফিরতে হল তাই। চিন্তা হল পরের দিন হরিদ্বার যাওয়া হবে কিনা। আমাদের ভাগ্য ভালো পরদিন সকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রায় রাত থাকতেই আমরা তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দিল্লী থেকে হরিদ্বার প্রায় দুশো মাইলের মতো দূরত্ব। তবে পথ খুব ভালো। আর রাজ-পথের পাশে পাশেই গঙ্গার ক্যানাল চলেছে। খাল কেটে গঙ্গার জল দেশের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশ সরকার। পথের দৃশ্যও বড় সুন্দর।

বেলা নটা নাগাদ আমরা মীরাটে পৌঁছলাম। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ আমলে এখানে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল। মিলিটারী ব্যারাকগুলো চোখে পড়ল। এখনও মীরাটের সামরিক গুরুত্ব কমেনি। এদিকটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহর।

হরিদ্বার পৌঁছতে বেশ বেলা হবে। তাই এখানে কিছু খেয়ে নিতে হবে। আমরা বাজারের দিকে চললাম। এখানে বড় ঘিঞ্জি মনে হল। বড় বড় বাড়িঘর কিন্তু এত ঘেঁষাঘেঁষি! রাস্তা খুবই চাপা আর অপরিচ্ছন্ন। সব পুরনো শহরেই যেমন দেখা যায়।

কিন্তু শহর যতই অপরিচ্ছন্ন হোক খাবার দোকানটি কিন্তু আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। দোকানটি খুব বড় নয়। হালফ্যাশানের কায়দা মত টেবিল চেয়ার দুরস্তও নয়। তবু যা আমাদের সকলকে ভেতরে টানল তার প্রধান কারণ, দোকানী নিজে দোকানের সামনের দিকে একটা উঁচু পৈঠায় বসে গরম জিলিপী ভাজছে আর ওদিকে আর একজন বড় বড় ফুলকো লুচি ভাজছে। তার একটু ওপাশেই বড় বড় রসগোল্লা ভর্তি বিরাট কড়াইটাও নজরে না পড়ে যায় না। ভেতরে বসার ব্যবস্থা ছিল, নেমন্তন্ন বাড়িতে তক্তা দিয়ে যেমন টেবিল চেয়ারের বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় তারই পারমানেন্ট সংস্করণ। তাতে আমাদের কিছু এসে যায়নি। দোকানী আমাদের যা খাওয়ালো তা মনে থাকবে বহুদিন। অনেক জায়গায় ঘুরেছি এমন ভালো জিলিপী কোথাও খাইনি। রসগোল্লাও কলকাতার বাইরে এত ভালো কোথাও খেয়েছি বলে মনে হয় না। এমন ফুলকো লুচি আলুর দমও আর কোথাও খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। বাংলার বাইরে গেলে সব জায়গাতেই দেখেছি মোটা মোটা পুরী আর সবজী মানে আলু বা আর কিছুর ঘ্যাঁট। একমাত্র এখানেই তার ব্যতিক্রম। আহারান্তে তৃপ্ত হয়ে যখন আমরা বেরোচ্ছি সকলেই একমত হলাম যে ফেরার পথে আবার এই দোকানেই আসতে হবে।

অসিত ঠাকুরপো বলে উঠল, মীরাট যে খাবার দোকানের জন্য বিখ্যাত তা তো জানা ছিল না।

ওর মন্তব্যে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

মীরাট থেকে রওনা হবার কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের পেছনের গাড়ি আর দেখা গেল না। আমরা ভাবছি ওরা হয়ত আসছেই ধীরে ধীরে। শেষে দু'এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করেও কোন ফল হল না যখন, তখন আমরা এগিয়েই গেলাম হরিদ্বারের দিকে। তবে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল ওদের কি হল ভেবে। পথে কোন দুর্ঘটনা হল কিনা সে কথাও ভাবতে শুরু করলাম। পথে দেরি করার জন্য হরিদ্বার পৌঁছতেও বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল প্রায়। ওখানে পৌঁছে আমরা ভোলাগিরির ধর্মশালায় উঠলাম গিয়ে। অসিত ঠাকুরপো গাড়ি

নিয়ে আবার ঐ পথেই ফিরে চলল ওদের কি হল খোঁজ নেবার জন্য। ঘণ্টাখানেক বাদে ও ফিরে এসে জানালো ওদের কোনই খোঁজ মিলল না। আমরা তখন আরো চিন্তিত হয়ে পড়লাম। দোতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সবাই বসে ভাবছি কি হতে পারে ওদের। এমন সময় সিঁড়ির নীচে ভীষণ হল্লা। ওরা এসে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকেই রেগে আগুন। ওরাও নাকি আমাদের গরুখোঁজা করেছে হরিদ্বারে এসে। এতক্ষণে রাস্তায় গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বুঝতে পেরেছে আমরা এখানেই আছি। দুই দলে প্রচণ্ড বচসা কার দোষ তাই নিয়ে। আমরা মেয়েরা নীরব দর্শক। যাই হোক অবশেষে দুই দলেরই মাথা ঠাণ্ডা হল। তখন জানা গেল ওরা মীরাট থেকে রওনা হবার পরই ওদের গাড়ির চাকা পাংচার হয়েছিল। আর যতক্ষণ সেটা সারানো হচ্ছিল ততক্ষণ ওরা রুরকী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ দেখছিল।

দুপুর রোদে ঘোরাঘুরি করে সবাই পরিশ্রান্ত। সামনেই গঙ্গা। সবাই মিলে নেমে পড়ল জলে। ওপর থেকেই দেখছি ওরা সাঁতার কাটছে আর বড় বড় মাছগুলো গায়ের কাছ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তো মাছ ধরে না বা খায় না। এখানে বরং মাছকেই সবাই খাওয়ায়। তাই কোন ভয় নেই ওদের। মানুষের কাছে কাছে ঘোরে ফেরে।

স্নানের পর সকলেরই প্রচণ্ড ক্ষিদে। বেলাও গড়িয়ে গেছে। অসিত ঠাকুরপো গিয়ে দোকান থেকে যা খাবার আনল তাই তখন অমৃত মনে হল।

বিকেলে আমরা বের হলাম হরকো প্যারীর দিকে। দূর থেকেই চোখে পড়ল নেতাজীর আবক্ষ মূর্তি। গঙ্গার ঘাট লোকে লোকারণ্য। কোথাও কিছু পাঠ হচ্ছে, কোথাও কথকতা হচ্ছে। আর কাপড় বিছিয়ে তার ওপর রাশি রাশি ফুল নিয়ে বসেছে কতজনা। যারা ঘাটে আসছে সবাই শালপাতার ডোঙ্গা ভর্তি ফুল কিনে তার ওপর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে গঙ্গার জলে। আমিও ভাসালাম ফুলের ডোঙ্গা। ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ভেসে চলল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, আকাশে তারার প্রদীপ ঝিকিমিকি জ্বলছে। গঙ্গার জলেও তারার মতই প্রদীপের আলো ঝিক্ মিক্ করছে। গঙ্গার ওপারে পাহাড়টা যেন আকাশের গায়ে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে। মন যেন বহুদূরে চলে যেতে চায় গঙ্গার কূল বেয়ে উজান পানে। হিমালয়ের বুকের ভেতর যেখানে গোমুখ থেকে শুভ্র বরফের আস্তরণ ভেদ করে তীব্র বেগে নেমে এলেন 'মা' তরল হীরক বর্ণ তুহিন শীতল

বারিতে মাটির পৃথিবীর তৃষ্ণা হরণ করতে, মন যেতে চায় ঐ পথে সেই অপূর্ব শোভা দর্শনের আশায়। হরিদ্বারে এলে মন যেন ঘরের টান ভুলে দুর্গম পথে পা বাড়াতে চায়। গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি যেন ডাক দিয়ে যায় কানে কানে। যেন বলে যায়, হেথায় কি করিস? আরো ওপরে যা, হিমালয়ের আরো গভীরে যা, আরো আনন্দ পাবি।

ওপারে কনখল। প্রজাপতি দক্ষ ওখানে শিবহীন যজ্ঞ করেছিলেন। অভিমানে সতী দেহত্যাগ করলেন। কৈলাস থেকে শিব ছুটে এলেন খবর পেয়ে। তারপর সতীর সেই দেহ নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হল। কিন্তু আশ্চর্য! শিবের সেই তাণ্ডব-লীলার রূপ ধ্যান করে শিল্পী কোন মূর্তি গড়েনি এখানে। বরং ভারতের সুদূর দক্ষিণে মাদুরাতে নটরাজের মূর্তি আছে শুনেছি। কনখলে অবশ্য দক্ষ রাজার ভাঙ্গা বাড়ি দেখায় পাণ্ডারা। হরকো প্যারীতে শুধু শিব-লিঙ্গ আছে। অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তিও আছে।

পুল পার হয়ে ওপারে গিয়ে নির্জন গঙ্গার তীরে বসে থাকলাম বহুক্ষণ। এখানে পাহাড়ের কোল বেয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। বড় শান্ত পরিবেশ। বাঁকের ওপাশেই বোধহয় হৃষিকেশ। আরো মাইল তিনেক উত্তরে পাহাড়ের ওপরে লছমনঝোলা। ঝোলার ওপারে স্বর্গদ্বার। যুধিষ্ঠির ঐ পথেই স্বর্গারোহণ করে-ছিলেন। পায়ে চলা কেদার, বদ্‌রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর পথও ওখান থেকেই শুরু হয়েছে। আমরা অবশ্য বদরীনাথের পথে বাসে গিয়েছিলাম পিপুলকোটি পর্যন্ত। মোটরের রাস্তাও হৃষিকেশ থেকে শুরু। লছমনঝোলাকে পাশে রেখে এগিয়ে গেছে দেবপ্রয়াগ হয়ে। মনে পড়ছিল সব। দুর্গম পথের ক্লেশ ভুলেছি কিন্তু যে আনন্দ পেয়েছি তার বুঝি তুলনা নেই। মন তাই আবার যেতে চায় ঐ পথে।

এপারে যখন ফিরে এলাম তখন বেশ একটু রাত হয়েছে। দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই ছোট দোকানটি যেখানে সেবার 'বদ্রী' যাবার পথে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম আর ভুল করে আমার চশমাটা ফেলে এসেছিলাম। পরদিন খুঁজতে খুঁজতে যখন ঐ দোকানে এলাম তখনও ঠিক এমনি দোকান বন্ধ করার মুখে। চশমার কথা বলতেই দোকানী বকে উঠল আমাকে।—"সারা দিনমান তোমার চশমার জন্য কত কি করলাম। দেড়টাকা খরচ করে ঢোল দিলাম পর্যন্ত তাও কেউ এলো না। এতক্ষণ ভাবছি কি করা যায় ঐ চশমা নিয়ে।"

আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়েছিলাম নিজের অসাবধানতার জন্য অন্যকে বিব্রত করেছি বলে। আর মুগ্ধ হয়েছিলাম দোকানীর সততায়। হাত বাড়িয়ে চশমাটা নিয়ে মনে মনে অজস্র সাধুবাদ করেছিলাম কিন্তু মুখে সামান্য ধন্যবাদ জানাতে কেমন যেন লজ্জাবোধ হয়েছিলো। কারণ ধন্যবাদের প্রত্যাশায় উনি এত ক্লেশ স্বীকার করেননি।

দেশ বিভাগের পর বহু সিন্ধ্রী পরিবার এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। ইনিও তাঁদেরই একজন। আজও দেখি ঠিক সেদিনের মতই দোকান বন্ধ করছেন উনি।

ধর্মশালায় ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা। আবার ভোরে রওনা হব। পরদিন রাতের ট্রেনেই কাশ্মীর রওনা হতে হবে। হাতে আর সময় নেই। 'অমরনাথ যাত্রার' দিন না হলে পৌঁছনো যাবে না।

গঙ্গার ওপরেই আমাদের ঘর। একটানা গঙ্গার কলধ্বনি কানে আসছে। গঙ্গার শীতল হাওয়ার স্পর্শে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ভোরের দিকে হয়ত একটু শীত-শীত করছিল বা কি কারণে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল ঠিক বুঝতে পারলাম না। তখনও সবাই ঘুমিয়ে। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি আকাশভরা তারা সেই নির্জনতার মাঝে শুধু গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমার কি মনে হল ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম। গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে বসে পড়লাম ঘাটের সিঁড়িতে। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে কান পেতে শুনলাম এক অপূর্ব সঙ্গীত। তারার আলোয় দুচোখ ভরে দেখলাম কিশোরী মেয়ের চপল নৃত্যছন্দ। অকারণ পুলকে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা যেন হাসিরাশির মত ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

মনে মনে বললাম,—

বিচিত্ররূপিনী তুমি!

এখানে কিশোরী মেয়ের মত চপল আনন্দে নেচে গেয়ে ছুটে চলেছ, আবার সমতলে তোমার আর এক রূপ। সেখানে ভরা যৌবন। গর্বিনী কখনও একূল ভাঙ্গছ, কখনও ওকূল গড়ছ। ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মেতেছ সেখানে। আবার কোথাও অকৃপণ হস্তে তোমার করুণা বিতরণ করছ। দুই তীরে তাই সোনার ফসল।

উত্তরে হিমালয় থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে তোমার আর শেষ হয়েছে বাংলার

সাগরে মিশে। মাঝে শত শত মাইলের ব্যবধান। এই দীর্ঘ পথে কত তীর্থ, কত জনপদ, কত নগরী গড়ে উঠেছে তোমার দুই তীরে।

দেখেছি তোমার ঘাটে ঘাটে বিচিত্র দৃশ্য। কোথাও পুণ্যার্থী স্নানশেষে স্তব করছে তোমার, কেউ বিবাহের মঙ্গল কলস ভরছে তোমার জলে, ভাসিয়ে দিচ্ছে ফুলের ডোঙ্গা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে। কুলু কুলু ধ্বনিতে আনন্দে যোগ দিচ্ছ তাদের উলুধ্বনির সাথে।

আবার কোথাও সন্তানহারা জননী আর পতিহারা পত্নী শান্তির আশায় আকুল হয়ে যখন মুখ লুকোচ্ছে তোমার বুকে, তুমি স্নেহময়ী নারীর মমতা দিয়ে তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছ তোমার শীতল জলের স্পর্শে। তাদের চোখের জল মিশছে তোমার জলে। বুঝিবা তোমার বুকে ক্ষণিকের তরে শান্তি পাচ্ছে তারা।

কিন্তু অশান্ত তোমার মন। দিবানিশি ছুটে চলেছ তাই সাগরের উদ্দেশে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কত দীর্ঘ পথ যেতে হয়েছে তোমাকে। কত গিরি কন্দর, কত বন উপবন, কত শস্য শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম করে, কত পল্লী, কত নগরের তীর ছুঁয়ে, ছুটে চলেছ তুমি প্রিয় মিলনের আশায়!

সেদিন সন্ধ্যায় সাগর দ্বীপ যাবার সময় দেখেছি তোমার আর এক রূপ। সেথায় বিশাল তোমার বিস্তার কিন্তু বাহিরে কোন চাঞ্চল্য নেই। স্থির হয়ে আছ প্রিয় সন্নিধানে। কিন্তু তোমার বুকের থরো থরো কম্পন অনুভব করেছি আমি স্টীমারে বসে। আর কান পেতে শুনেছি সাগর সঙ্গমে তোমার আনন্দ আর উত্তেজনাপূর্ণ অস্ফুট কাকলী। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রিয় মিলনের সে ছবিও আঁকা আছে আমার মনে।

সবার শোকতাপ, কামনাবাসনার যত কিছু মালিন্য, যা তুমি বয়ে নিয়ে গিয়েছ সবটুকু সাগরের বুকে ঢেলে দিয়ে তুমিও কি শান্তি পেয়েছ?

মগ্ন হয়ে গঙ্গার রূপ দেখতে দেখতে কত সময় কেটেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ কী এক অনুভূতিতে পিছন ফিরে তাকালাম জানি না। দেখি এক সন্ন্যাসী আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। ভোরের আবছা আলোতেও চোখে পড়ল তাঁর আবক্ষ শশ্রুমণ্ডিত সৌম্যদর্শন গৌরবর্ণ মুখ। একটু চমকে গেলাম আমি। বুঝতে পারলাম এসময় হয়ত স্নান তর্পণ করবেন। আমি বসে থাকাতে ঘাটে নামতে পারছেন না। কিন্তু উনি মৌনী। মুখে কোন কথা বললেন না। তবু চোখের দৃষ্টিতে কি যেন বলতে চাচ্ছেন মনে হল। আমিও বুঝতে চেষ্টা করলাম ওঁর

চোখের দিকে চেয়ে কি বলতে চান। কিছুই বুঝতে পারিনি! তখন হাতের ইঙ্গিতে আমায় চলে যাবার নির্দেশ করলেন।

তখনও সিঁড়ির নীচেটা অন্ধকার। ওপরে এসে দেখি সবাই ঘুমিয়ে। কেউ জাগেনি। হঠাৎ আমার মনে হল সারাদিন তো চোখে পড়েনি এই সন্ন্যাসীকে! কোথায় থাকেন? আমাকে কি বলতে চেয়েছিলেন? শুধু কি ঘাট থেকে সরে যেতে বললেন, না অশুভ কিছু ঘটবে বলে আমাকে ফিরে যেতে বলছেন? মনটা দুর্বল হয়ে পড়ল। বুটলুকে অসুস্থ দেখে এসেছি। বৃন্দাবনের পথ থেকে ঘুরে এলাম। 'অমরনাথ' দর্শনও হবে কিনা কে জানে!

॥ ১০ ॥

হরিদ্বার থেকে দিল্লী পৌঁছতেও আমাদের বেশ বেলা হ'ল। পথে আমরা কোথাও দাঁড়াইনি তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলে। কিন্তু দিল্লীর কাছে এসে আটকে গেলাম যমুনা ব্রীজের এপাশে। ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক। দিল্লী থেকে গাজিয়াবাদের দিকে যত গাড়ি আর ট্রাক আসছে সেগুলো একদফা শেষ হলে তবে আবার আমাদের গাড়িগুলোকে ছাড়বে। প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে গেল ফিরতে।

বাসায় পৌঁছে তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরেই আমরা সব গোছগাছ শুরু করলাম। এইবারই ঠিক বিদেশযাত্রা হবে। এখন থেকে কখন কোথায় কেমন আস্তানা মিলবে তার কোন ঠিকানা নেই। খুঁটিনাটি দরকারী জিনিস অমরনাথের পথে কি দরকার হতে পারে সব কিছু মনে করে গুছিয়ে নিতে হ'ল।

ট্রেন আমাদের রাত প্রায় সাড়ে নটায়। পুরাতন দিল্লী থেকে ছাড়বে। আমরা একটু আগেই স্টেশনে পৌঁছলাম। সঙ্গে মালপত্র প্রচুর। দেখলাম আগে এসে ভালই করেছি আমরা। কাশ্মীর মেলে প্রচণ্ড ভিড়। ট্রেনে উঠে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে মনে হ'ল এবার সত্যিই কাশ্মীর যাচ্ছি তাহলে।

অসহ্য গরম। জানালার ধারে বসেছিলাম বাইরের একটু ঠাণ্ডা হাওয়া যদি পাওয়া যায় সেই আশায়। রাত প্রায় এগারোটায় গাড়ি দাঁড়ালো পাণিপথ স্টেশনে। এপথে আগে আসিনি। এই প্রথম। স্টেশনের নাম পাণিপথ দেখে চমকে উঠলাম। ও মা, এই বুঝি পাণিপথ? এখানেই বার বার ভারতের ভাগ্য

নির্ণয় হয়েছে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ,—বাবর মাত্র বারো হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদির এক লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করলেন, কয়েকটা কামান আর গাদা বন্দুকের সাহায্যে। ভারতবর্ষে যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার সেই প্রথম। দিল্লী আর আগ্রায় স্থাপিত হ'ল মোগল সাম্রাজ্য। পরবর্তীকালে ক্রমে বিস্তৃত হয়েছিল সমগ্র ভারতে।

মাত্র তিরিশ বছর পরের ঘটনা—দ্বিতীয়বার এই পাণিপথের প্রান্তরে যুদ্ধ হ'ল হিন্দু রাজা হিমুর সঙ্গে আকবর আর বৈরামের। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর পর আফগান সুলতান আদিলশাহের সেনাপতি হিমু দিল্লী আগ্রা জয় করে বিক্রমজিত নামে দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করলেন। অল্প কিছুদিনের জন্য দিল্লীতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বালক আকবর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হিসাবে পাঞ্জাবেই ছিলেন। খবর পেয়ে সেনাপতি বৈরামকে নিয়ে ছুটে এলেন। দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে হিমুর পরাজয় হ'ল। বাবর মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। তাঁর পৌত্র আকবর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন মোগল সাম্রাজ্যের।

প্রায় দুশো বছর পর তৃতীয়বার যুদ্ধ হ'ল মারাঠাদের সঙ্গে পারস্যের রাজা আহম্মদ শাহ্ আবদালীর। মারাঠারা নিদারুণভাবে পরাজিত হ'ল। ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। আর এই সুযোগে ইংরেজরা দুর্বল মোগলদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিল। ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হল এই পানিপথের যুদ্ধেই।

মনে মনে আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম পরীক্ষার সময় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় যে কোন পাণিপথের যুদ্ধের কারণ বর্ণনা কর প্রশ্ন দেখলেই ওই তিনটে সাল তারিখ এবং ঘটনাগুলো এমন গোল বাধাত যে চোখে অন্ধকার দেখতাম। বর্ণনা করব কি ? কিন্তু এখন তো বেশ পরিষ্কার মনে পড়ছে সব। ভালো করে দেখব মনে করলাম বাইরেটা। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। স্টেশনের আলোর বাইরে আর বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল টের পাইনি। হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস আর জলের ঝাপটায় আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে ভীষণ ধুলোর ঝড়। সামান্য বৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর ইঞ্জিনের বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে আসছে। ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল। জানালার সার্সিটা ফেলে দিতে হ'ল। এটা কোন্ স্টেশন দেখব বলে জানালার সার্সির ভেতর দিয়ে তাকালাম। গাড়ি ধীরে ধীরে প্লাটফরম ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম আর জানা গেল না। কিন্তু

একেবারে শেষ সীমায় বোর্ডে বড় বড় করে লেখা আছে দেখলাম, 'কুরুক্ষেত্র'। আবারও চমকে উঠলাম। এ যে মহাভারতের মহাশ্মশান! [illegible] পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে বোধ হয় আর কোন যুদ্ধে এত [illegible] হয়নি। আর এই রণক্ষেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীভগবান বলেছিলেন, —যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। [illegible] সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

নানা অনাচার অধর্মে দেশ আজ ভরে গিয়েছে। [illegible] ভারতবাসী। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ লেগেই আছে। আত্ম[illegible] আজ আমরা। মনে হল ওঁর আবির্ভাবের সময় হয়নি কি এখন[illegible]

দুর্যোগময়ী রাত্রি। চলেছি মহাশ্মশানের ওপর দিয়ে। বিদ্যুতের তরবারি আকাশটাকে খানখান করে কাটছে। মেঘের গম্ভীর গুরুগুরু শব্দে যুদ্ধের দামামা বাজছে যেন।

মাঝে মাঝে বজ্রপতনের কর্ণবিদারি আওয়াজ যেন শত্রুনিপাতে রণজয়ী কুরু ও পাণ্ডব সেনার পৈশাচিক জয়োল্লাস বলে মনে হতে লাগল।

বৃষ্টি বেশ জোরে শুরু হ'ল। আমাদের ট্রেনও ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। আমার কেমন মনে হ'ল বাতাসের শব্দে যেন শত শত পতিহারা কৌরব কুলবধূর দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছে, আর বৃষ্টির জলের সঙ্গে অঝোরধারায় ঝরে পড়ছে তাদের চোখের জল।

পুত্র-শোকাতুরা জননী গান্ধারীর মূর্তি ভেসে উঠল মানসপটে। অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে, সমব্যথী স্বামীর অন্ধত্বের জন্য। তাই দৃষ্টি থাকতেও পৃথিবীর রূপ রস উপভোগ করেননি। চোখ মেলে চেয়ে দেখেননি কোনদিন। অদ্ভুত সংযমী। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে পুত্র দুর্যোধনকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করতে পারেননি। বলতে পারেননি, জয়ী হও পুত্র। বলেছিলেন, যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। তিনিই পুত্রশোকে আত্মবিস্মৃত হয়ে খুলে ফেলেছেন চোখের বন্ধন। রণক্ষেত্রের চারিদিকে মৃতের স্তূপ। পুত্রহারা জননীর চোখের দৃষ্টি ব্যাকুল হয়ে খুঁজে মরে কোথায় সেই অভিমানী পুত্র দুর্যোধন?

কর্কশ বজ্রপাতের শব্দে চমকে চেয়ে দেখলাম বাইরে। তীব্র আলোকে শূন্য প্রান্তর চোখে পড়ল। সন্দেহ জাগল মনে, আবার কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? এতক্ষণ কি বহুযুগ পূর্বের সেই অতীতের স্বপ্ন দেখছিলাম তবে? কিন্তু তবু আমার দৃষ্টি বার বার বাইরের শূন্য প্রান্তরে কি যেন খুঁজছিল।

॥ ১১ ॥

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগের অবসান হয়েছে। আজকের আলো-ঝলমলে নির্মল প্রভাতে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর মনে হচ্ছে। দূরে আকাশের গায়ে নীল পর্বতশ্রেণী চোখে পড়ছে। পাঠানকোটের যত নিকটবর্তী হচ্ছি ততই আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে কাশ্মীর আর দূর নয়। ঐ তো দেখা যায় সেই পর্বতশ্রেণী।

সকাল প্রায় দশটায় আমরা পাঠানকোট পৌছলাম। পাহাড়ের কোলে সুন্দর স্টেশন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক। ট্রেনের ভ্রমণ আমাদের শেষ হ'ল। এবার শুরু হবে পাহাড়ী পথে মোটরবাসে যাত্রা।

স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেল আজকের বাস সব চলে গেছে। আগামীকাল সকালে আবার বাস ছাড়বে। কাজেই আজ সারাদিন এখানেই থাকতে হবে। থাকার জায়গাও বেশ ভালো পাওয়া গেল। দোতলায় এয়ার-কণ্ডিশান রিটায়ারিং রুম। মেঝেতে সুন্দর কাশ্মীরি কার্পেট পাতা। বাথরুমে গরম জলের ব্যবস্থা। রাজকীয় ব্যাপার আর কি।

সন্ধ্যেবেলা স্টেশন প্লাটফরমে বেড়াতে বেড়াতে কুণ্ডু স্পেশাল আর ভারত ভ্রমণের গাড়ি দেখলাম। সাইডিংয়ে রেখেছে গাড়িগুলো। যাত্রীরা সব কাশ্মীর চলে গেছেন। খালি গাড়ি পাহারা দেবার জন্য একটি অল্পবয়সী ছেলে আছে শুধু। একা একা ছিল। আমাদের দেখে ও গল্প করার জন্য গাড়ি থেকে নেমে এলো। মেদিনীপুরের ছেলে। নাম বলল, বিশু।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি অমরনাথ গিয়েছ? বিশু হেসে জানালো, একবার নয়, বারচারেক ও গিয়েছে। কুণ্ডুদের কাছেই চাকরি করছে বেশ কিছুদিন হ'ল। তাই প্রত্যেক বছরই এমনি ঘোরে। এবার ওর দায়িত্ব পড়েছে মালপত্র পাহারা দেবার। যাত্রীরা কিছু কিছু জিনিসপত্র ট্রেনেই রেখে গেছে। গল্পে গল্পে ও বলল, একবার বদ্রীনাথের পথে এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাক্স ছেড়ে গিয়েছিলেন আগের চটিতে। সন্ধ্যেবেলা অন্য চটিতে পৌছে বুঝতে পারলেন সেটা। তখন এই ছেলেটিই সারারাত ধরে হেঁটে ভোরের সময় সেই বাক্স নিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে দেয়।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তুমি ঐ শীতে সারারাত ধরে হাঁটলে, কষ্ট হ'ল না?

বিশু হেসে জবাব দিল, কি করব বলুন? আমাদের তো এটাই কাজ। কার

কি অসুবিধা হচ্ছে দেখা। ভদ্রমহিলা বাক্সের শোকে এমন পাগল হয়েছিলেন যে বাক্স না পেলে উনি আর নড়বেন না ওখান থেকে। আর সেজন্য এত বড় দলের সকলেরই একদিন দেরি হয়ে যাবে বদ্রীনাথে পৌঁছতে। ওঁকে রেখে তো আর চলে যাওয়া যায় না। তবে পাহাড়ে হাঁটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। বেশ হাঁটতে পারি এখন। কোন কষ্ট হয় না।

আমি প্রশ্ন করলাম, অমরনাথের পথ শুনেছি খুবই দুর্গম?

বিশু জানালো, বৃষ্টি হলে ও-পথ সত্যি দুর্গম হয়। না হলে অত ভয় পাবার কিছু নেই। তবে এবার কি হবে বলা যায় না। বলেই ও আকাশের দিকে তাকালো।

ওর দেখাদেখি আমিও ওপরে চেয়ে দেখি, মাথার ওপর কালবৈশাখীর মত ঝড়ের সংকেত। কখন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে টের পাইনি।

ওপরে শেড্ ছিল না। খোলা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। স্টেশনের শেডের নীচে ফিরতে ফিরতেই বড় বড় ফোঁটায় জোরে বৃষ্টি নেমে পড়ল। ভিজিয়ে দিল আমাদের। 'অমরনাথের' পথ বৃষ্টিতে আরো দুর্গম হয় এ-খবরে মনে মনে একটু শংকিত হলাম। বৃষ্টি সঙ্গে করেই তো আমরা বেরিয়েছি!

॥ ১২ ॥

ভোরবেলায় আমরা তৈরী হয়ে নীচে নামলাম। কখন বাস ছাড়বে সঠিক জানা নেই। আজকের বাস ধরতে না পারলে 'অমরনাথ' যাওয়া যাবে না।

স্টেশনের ঠিক পেছনেই বাস-স্ট্যাণ্ড। কয়েকখানা বাস দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। তবে কোনটায় আমাদের সীট আছে জানার জন্য একজন বুকিং অফিসে গেল।

আমরা মালপত্র নিয়ে বাসের কাছেই দাঁড়ালাম। আমাদের মত আরো অনেক যাত্রী অপেক্ষা করছে। সকলেই উৎকণ্ঠিত, বাস কখন ছাড়বে জানার জন্য। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারেন না। কুলিদের কথা থেকে মনে হ'ল, এ বিষয়ে ড্রাইভারের মর্জির ওপরই নির্ভর করতে হবে। অর্থাৎ ড্রাইভার সাহেব এলেই বাস ছাড়বে। অসিত ঠাকুরপো ফিরে এসে খবর দিল আমাদের 'স্পেশালে' অর্থাৎ মেল বাসে জায়গা হয়েছে। একদিনেই শ্রীনগর পৌঁছব।

শুনে নিয়ে আমরা সবাই খুশী। সাধারণতঃ যাত্রীদের কুঁদে রাত্রিবাস করতে

হয়, আমাদের আর পথে কোন হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। একবার বাসে চেপে বসতে পারলেই হ'ল।

প্রায় সাতটায় আমাদের বাস ছাড়ল। এ বাসে বেশী আসন নেই। মাত্র তেরটি। নূতন বাস। আসনগুলোও সুন্দর। এরোপ্লেনের মত পুরু গদি আঁটা চেয়ার। পেছনে মাথা রাখার জায়গায় এমনভাবে খাঁজ করা যাতে যাত্রীরা ইচ্ছে করলে বেশ ঘুমিয়ে যেতে পারে। সবই ভালো। তবে পাহাড়ী-পথে বাসে চড়ে আমি কেমন স্বস্তি বোধ করি না। তাকিয়ে দেখলাম আমাদের ড্রাইভারটি বেশ মোটাসোটা। এখানে আসার আগেই কাগজে মোটর দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে একটি সমীক্ষা পড়েছিলাম। তাতে বলেছে, মোটা ড্রাইভাররা নাকি অ্যাকসিডেণ্ট কম করে। পাহাড়ী পথে প্রায় আড়াইশো মাইল যেতে হবে। তাই আমাদের ড্রাইভারের চেহারা দেখে ভরসা পেয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম করে বসলাম।

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে চলেছে। আজই ভূস্বর্গে পৌছব। মনে মনে অদ্ভুত আনন্দ আর উত্তেজনা অনুভব করছি। ভয়ও হচ্ছে, আমার কল্পনার সাথে মিলবে তো ?

জানালার ধারে বসে আছি। এখনো সমতলেই আছি। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীর পাথরের নুড়ি বিছানো শুকনো খাত চোখে পড়ছে। শুনেছি পাহাড়ে বেশী বৃষ্টি হলে এই মরা খাতেই ঢল নামে। তখন জলের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বড় বড় গাছ পাথর সব কিছু।

ভোরবেলা উঠতে হয়েছে সবাইকে। বাতাসের মধুর হিমেল স্পর্শে আর আরামদায়ক আসনে বসে ঘুমের আমেজ এসেছে সবার। তাকিয়ে দেখি আমাদের ড্রাইভারটিও স্টীয়ারিংএ হাত রেখে আরামে চোখ বন্ধ করেছেন। গাড়ির গতিবেগ কিন্তু কমেনি। ড্রাইভারের পেছনের সীটেই আমি বসেছি। সামনের আয়নাতে এ দৃশ্য দেখে এরই ভরসায় এ দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে ভেবে হেসে ফেললাম।

জম্মুর কাছাকাছি এসে এক জায়গায় আমাদের বাস দাঁড়ালো। সবাই নেমে পড়ল চা খাবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছাড়বে। মনে হ'ল চা খাবার জন্যই এটুকু বিরতি। আমাদের ড্রাইভারটিও চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে ফিরল দেখছি। এবার পাহাড়ী পথ শুরু হবে। ভাবলাম ভালই হ'ল। এবার ওর চোখের ঘুম কেটে গেল।

জম্মু পাহাড়ী শহর হলেও খুব বেশী উঁচু নয়। সমতল ক্ষেত্র থেকে মাত্র এক

হাজার ফিট উঁচু। একটু ঢেউ খেলানো রাস্তা। তাছাড়া অন্যান্য পাহাড়ী শহরের সাথে আর কোন সাদৃশ্য নেই। দার্জিলিং, মুসৌরী বা আর কোথাও যেমন পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে বাড়ি-ঘর চোখে পড়ে এখানে তা নয়। বড় বড় দালান কোঠা চোখে পড়ল। বাসে বসেই আগেকার রাজাদের একটি পুরাতন দুর্গবাড়ি আর অনেকগুলো মন্দির দেখতে পেলাম। গঠন একটু আলাদা। মন্দিরের চূড়াগুলো একটু চ্যাপ্টা ধরনের। শুনলাম শিবমন্দির এগুলি। আমরা এখানে না থেমে সোজা চলতে শুরু করলাম। তাই দেবদর্শন হ'ল না।

কাশ্মীর রাজ্য শুরু হয়েছে। মনে পড়ল কাশ্মীরের ইতিহাস। কাশ্মীর দেখার এবং কাশ্মীরের ইতিহাস জানার আগ্রহ আমার বহুদিনের। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কবি কহ্লন মিশ্র সংস্কৃত কাব্য রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরের ইতিহাস লিখে গেছেন। কিছুদিন আগেই আমার ওই দুষ্প্রাপ্য বইখানি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। মূল সংস্কৃত কাব্য বাংলা ভাষ্য সহ বহু পুরাতন একখানি বই আমি হাতে পেয়েছিলাম। সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অনুবাদ ছিল বলেই আমার কাব্যখানি পড়াব সৌভাগ্য হয়েছিল।

কহ্লন রাজতরঙ্গিণীতে লিখেছেন,—হিমালয়ের কুক্ষিদেশ আগে জলপূর্ণ ছিল। 'সতীসর' নাম ছিল এই সরোবরের। বৈবস্বত মন্বন্তরের সময় প্রজাপতি কশ্যপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে এনে সমস্ত প্রস্রবণের মুখ বন্ধ করে ভূভাগ রচনা করেন। তিনিই এখানে কাশ্মীর প্রদেশ নির্মাণ করেন। আর বিতস্তা বা ঝিলম নদীর প্রস্রবণের উৎসমুখ নীল নামক নাগ সর্বদা রক্ষা করছে। মনে হয় কশ্যপের নাম অনুসারেই কাশ্মীর নাম হয়েছে।

রাজতরঙ্গিণী পড়লে জানা যায় এখানে আগে নাগ রাজবংশ ছিল। নাগেদের অনেক অলৌকিক ঘটনাও লিখেছেন তিনি। কাশ্মীর শুধু সৌন্দর্যে ভূস্বর্গ তাই নয়, কল্পনার রাজ্যও বটে। রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম নাগরাজ্যে প্রবেশ করছি বলে।

তবে শুধু কল্পনাই বা বলি কি করে? কহ্লন এ গ্রন্থ রচনার সময় আগেই বলে দিয়েছেন যে, এগারোখানি পুরাতন ইতিহাস, প্রস্তর লেখন, পূর্ব রাজাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়াদির আজ্ঞাপত্র, চরিতলিপি ও রচিত গ্রন্থ সমুদয় পাঠ করেছেন। নীলমুনির মতও দেখেছেন। কাজেই কিছু অলৌকিক ঘটনা থাকলেও রাজতরঙ্গিণী কাব্য কাশ্মীরের ইতিহাস বলেই স্বীকৃত।

কাশ্মীরীদের রূপের খ্যাতি সকলেরই জানা। কিন্তু বিশেষ করে নাগকন্যাদের রূপ বর্ণনা করলেন কেন ওঁর কাব্যে তাই ভাবছিলাম।

মনে পড়ল নাগরাজকন্যা রূপবতী চন্দ্রলেখার কথা। বিশাখ নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সরোবরের তীরে তরুছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। সঙ্গে একটু ছাতু ছিল। সরোবরের জলে মুখ হাত ধুয়ে ছাতু খাবার উপক্রম করছেন, এমন সময় মধুর নূপুরের ধ্বনি শুনে ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন নাগরাজ শুশ্রূবার কন্যা ইরাবতী ও চন্দ্রলেখা রূপে চতুর্দিক আলো করে জল থেকে উঠে আসছেন। কিন্তু জলাশয়ের তীরে উঠে তাঁদের ঘাস খেতে দেখে দুঃখ হ'ল যুবকের। রূপমুগ্ধ যুবক নিজে না খেয়ে ছাতুটুকু তাঁদের খেতে দিলেন। নাগ-রাজকন্যারা ছাতু খেয়ে তৃপ্ত হলেন আর দাতা ব্রাহ্মণকুমারের প্রেমেও পড়লেন বুঝি চন্দ্রলেখা। পরিচয় হ'ল দুজনের। বড় বোন ইরাবতী বিদ্যাধর রাজের বাগদত্তা।

নাগরাজ্যে সেবার খুব খাদ্যাভাব। চন্দ্রলেখার পরামর্শমত নাগরাজ শুশ্রূবাকে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে দিলেন বিশাখ। আর এই উপকারের প্রতিদানে নাগরাজ কন্যা সম্প্রদান করলেন ঐ ব্রাহ্মণ যুবককে।

নাগরাজ ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। তাই সরোবরের পাশে পাকা ফসলের ক্ষেত থাকতেও খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কারণ ক্ষেতের যে মালিক সে প্রথমে নূতন অন্ন গ্রহণ না করলে তিনি কি করে খান?

একদিন ঐ ক্ষেতের কৃষক যখন নিজের জন্য রান্না করছিল বিশাখ চুপি চুপি তার হাঁড়ির মধ্যে নূতন ধান ফেলে দিল। এর পর আর কোন বাধা থাকল না। নাগরাজ বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি দিয়ে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে নিজে গ্রহণ করলেন।

এর মানে অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি। কারণ এই নাগেরা আকৃতি এবং প্রকৃতিতেও যখন মানুষের মতই অন্ততঃ সময় সময় মানুষের মত আকার ধারণ করছে, মানুষের খাদ্য গ্রহণ করছে এবং মনুষ্যোচিত সব গুণই আছে তখন তারা নিজেরা ফসল উৎপন্ন না করে পরনির্ভর হত কেন? আর ধার্মিক বলে পরের ক্ষেতের নূতন ফসল প্রথমে গ্রহণ করছেন না কিন্তু আবার বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টির সৃষ্টি করে পরের জিনিস আত্মসাৎ করলেন কি করে? সেটাই বা কেমন ধর্ম?

যাই হোক এরপর নাগকন্যা চন্দ্রলেখা ব্রাহ্মণের ঘরণী হয়ে সুখে সংসার করছে। একদিন ছাদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে আর বাইরের উঠোনে ফসল রোদে দিয়েছে সেটাও দেখছে, এমন সময় সেই দেশের রাজার অশ্ব এসে ধান খেতে শুরু

করল। আর কোন লোক না থাকাতে চন্দ্রলেখা নিজেই এসে ঘোড়াটিকে তাড়ালো। ঘোড়ার পিঠে চন্দ্রলেখার হাতের ছাপ সোনার রংএ অঙ্কিত হয়ে থাকল। তাড়াতাড়িতে মাথায় কাপড় দিতে ভুলে গিয়েছিল। রাজা কিন্নর সেই অবস্থায় দেখে চন্দ্রলেখার রূপে পাগল হলেন। রূপমুগ্ধ সেই রাজা কত চেষ্টা করলেন, ছলে বলে চন্দ্রলেখাকে পাবার তবু নিরাশ হতে হ'ল তাঁকে।

কিন্তু রেহাই পেলেন না নাগরাজ শুশ্রবার হাতে। রাজার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে চন্দ্রলেখা বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাবার কাছে আশ্রয় নিল। মেয়ের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন নাগরাজ। রাজা 'কিন্নর' ও তাঁর রাজ্যের সকল প্রজাকে বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টির দ্বারা হত্যা করলেন। বিতস্তার তীরে ছিল কিন্নরের রাজধানী। নদীর জল শবে পরিপূর্ণ হ'ল।

কবি এখানে কাব্য করে বলেছেন, বিতস্তা নদী তখন যেন ময়ূরের পুচ্ছের মত শোভা পাচ্ছিল। উপমাটি আমার কাছে কষ্টকল্পনা মনে হতে লাগল। কারণ ময়ূর-পুচ্ছ সত্যিই সুন্দর। কিন্তু নরমুণ্ডে নদীর জলের কোন্ শোভা বৃদ্ধি হয়েছিল যে ময়ূরপুচ্ছের মত মনে হবে? রাজা শুশ্রবা অবশ্য তারপর এত জীব হত্যা করার অনুতাপে নিজের আশ্রয় ত্যাগ করে ক্ষীর সরোবরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আর ঐ ব্রাহ্মণও নাগভাবাপন্ন হয়ে আর একটি সরোবরে আশ্রয় নিয়েছিল।

কহ্লন লিখেছেন যাত্রীরা 'অমরনাথের' পথে 'ক্ষীরসর' আর 'জামাতৃসর' এখনও দেখতে পান।

জামাতৃসরের কথা শুনিনি তবে যাঁরা অমরনাথ গিয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি এবং গাইড্ বইতেও শেষনাগ লেকের কথা পেয়েছি। এই লেকের তীরে অমরনাথ যাত্রীদের একরাত্রি বাস করতে হয়।

মনে হ'ল নাগরাজ শুশ্রবার নাম অনুসারেই পরে হয়ত শেষনাগ নাম হয়েছে এই সরোবরের। ভাবলাম যদি অমরনাথ যেতে পারি তবে জামাতৃসরের খোঁজ করব। শেষনাগের অপূর্ব শোভার কথা প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়ে' পড়েছি।

চতুর্দিকে তুষারাবৃত পর্বত। মধ্যস্থলে এই সরোবর। স্বচ্ছ অথচ সমুদ্রের মত সবুজ আর নীলে মেশানো অপরূপ সেই জলের রং। এই সরোবর থেকেই নীল গঙ্গার উৎপত্তি। তারও জলের রং এমনি নাকি। যদি অমরনাথ যেতে পারি আমারও দেখার সৌভাগ্য হবে। কিন্তু উনি পথের দুর্গমতার যে বর্ণনা করেছেন যেতে পারব তো?

বিশাখ আর চন্দ্রলেখার প্রেমের উপাখ্যান ভাবছিলাম আর মনে মনে কল্পনার জাল বুনছিলাম। তুষারশৈল ঘেরা নীল সরোবরের অতল জল থেকে সিক্তবসনে এলোচুলে উঠে এলো অপরূপা এক কন্যা—,

অমনি মনে হ'ল, এখনও কি কাশ্মীরী যুবারা দেখা পায় নাগকন্যাদের ?

হয়ত পায়, হয়ত পায় না। কিন্তু হিমগিরির পাদদেশে নির্জন সরোবরের কুসুমাকীর্ণ তটে বসে রূপসী নাগকন্যাদের স্বপ্ন দেখতে দোষ কি ?

॥ ১৩ ॥

অনেকটা ওপরে উঠেছি এতক্ষণে। বোধ হয় ছ-সাত হাজার ফিট উঁচু হবে সমুদ্রতীর থেকে। একটু শীত বোধ হচ্ছিল। আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। গাড়ির ভেতরে সকলেই প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমাদের ড্রাইভার সাহেবের চোখেও ঘুমের আবেশ। তবে তার অ্যাসিস্টাণ্টটি হুঁশিয়ার। সময় সময় গলাখাঁকারি দিয়ে বা অন্যভাবে শব্দ করে সজাগ করছে চালককে। ড্রাইভারজী তখন কোন রকমে চোখের পাতা দুটো টেনে খুলে দেখে নিচ্ছে পথের বাঁক। এক পেয়ালা চা আর কতক্ষণ ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখবে ?

প্রথমে ভয় পেলেও কিছুক্ষণ দেখার পর আমার কেমন মনে হ'ল ড্রাইভারের খুবই পরিচিত এ পথ আর অভ্যস্ত এভাবে চলতে। দুজনের সমঝোতা আছে নিশ্চয়ই। নাহলে গাড়ি চালাচ্ছে কি করে ? তবে এটুকু লক্ষ্য করলাম খারাপ রাস্তা দেখলেই সজাগ হয়ে দৃঢ় হাতে ধরছে স্টীয়ারিং। এর আগে পাহাড়ী পথে যাতায়াতে বহু ড্রাইভার দেখেছি। কিন্তু এমন নির্বিকার ড্রাইভার চোখে পড়েনি।

বাইরে অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিকেই সবুজের ছড়াছড়ি। পাহাড়ী পথে আর এত ওপর দিয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে না। গাছপালা, লতায়পাতায় ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন পথ। পাশে গভীর খাদ আছে ঠিকই কিন্তু চোখে পড়ছে না। আর ওপাশের পাহাড়ের গায়ে সবুজ ধানক্ষেত। পর্বতের বনময় শোভা আগেও দেখেছি। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে কচিধানের এমন হরিৎশোভা আর কখনও চোখে পড়েনি। আকাশের নীল পটে যেন সবুজের ঢেউ তুলে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশ্রেণী। সাদা হাল্কা টুকরো মেঘের দল হংস বলাকার মত সারি সারি ভেসে চলেছে। ফিরে

চলেছে বুঝি জন্মভূমি মানস সরোবরের উদ্দেশে। ভয়ভাবনা ভুলে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ।

কুঁদ এসে গেলাম। শ্রীনগর থেকেও বাস এসেছে যাত্রী নিয়ে। বেশীর ভাগই বাঙালী যাত্রী। এখানে দুপুরে খেয়ে নিয়ে তাঁরা নীচে নেমে যাবেন। আমাদেরও খেয়ে নিতে হবে এখানেই। পথের ধারের হোটেলে খেতে বসে তাঁদের কাছেই শুনলাম ওদিকে রাস্তা খুব খারাপ। ঠিক বিশ্বাস হ'ল না। এতক্ষণ তো বেশ ভালো রাস্তা দিয়েই এলাম।

কুঁদ থেকে রওনা হয়ে কিছুদূর গিয়েই বুঝতে পারলাম ওঁরা মিথ্যে বলেননি। কালকের ঝড়জলে পাহাড়ে ধস নেমেছে।

মাটির পাহাড়। একেবারে লাল এঁটেল মাটি। ড্রেজার দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছে। বহুলোক খাটছে সেখানে। আমাদের বাস ঠিক ধসের মুখেই দাঁড়িয়ে। ওরা ইশারা করল একটু অপেক্ষা করার জন্য। রাস্তা ঠিক হলে কোন রকমে গাড়ি পার হ'ল। বর্ষার সময় পাড়াগাঁয়ের কাঁচা রাস্তার জলকাদায় গাড়ি আটকালে যেমন হয় ঠিক সেই অবস্থা। তফাত শুধু ড্রাইভার একটু অসতর্ক হলে গাড়ির চাকা পিছলে কোন্ অতলে তলিয়ে যাবে আমাদের নিয়ে তার ঠিক নেই।

গাড়ির সবাই উৎকণ্ঠায় কাল গুনছেন। ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম। কিন্তু ড্রাইভার সাহেব খুব হুঁশিয়ার হয়ে পার হলেন এ পথটুকু। মনে মনে বাহবা দিলাম। এর আগে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাড়ি চালালেও বিপদের সময় হাল ধরেছে ঠিক। নিশ্চিন্ত হলাম এতক্ষণে।

মনে পড়ল ইতিহাসের গল্প। সম্রাট আওরংজেব হয়ত এমনি এক ধসের মুখে পড়েছিলেন। দাসদাসী, লোকলস্কর, সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেশ কয়েক হাজার লোকের বাদশাহী বহর সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সঙ্গে বেগমরাও আছেন। হঠাৎ কয়েকটা হাতী পর পর অতল খাদে তলিয়ে গেল বেগমদের নিয়ে। হাতীর পিঠে হাওদায় বসে সুন্দরী বেগমরা হয়ত নিশ্চিন্ত মনে সুগন্ধি পান জরদা খাচ্ছিলেন তখন। আর প্রকৃতির শোভা দেখছিলেন মুগ্ধ হয়ে। টেরও পেলেন না কিছু। বাদশাহ এগিয়ে গিয়েছিলেন। যখন খবর পেলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বেগম বা হাতীর কোন হদিস মিলল না।

হাতীর পিঠে হাওদা না হলেও আমরাও কম আরামে যাচ্ছি না। মনে মনে

হাসলাম। গাড়ির চাকা একটু এদিক ওদিক হলেই আমরাও আরামেই পাতাল প্রবেশ করতাম।

পথে আরও দু'এক জায়গায় এমনি ধস নেমেছে দেখলাম। এখানে রাস্তাও খুব চওড়া নয়। কিন্তু ততক্ষণে অভ্যস্ত হয়েছি এপথে। আর কিছু মনে হচ্ছে না।

ভাবলাম পুরাকাল থেকেই এ পথ অতিক্রম করেছে মানুষ। তখন হয়ত পথ আরো দুর্রধিগম্য ছিল। কাশ্মীররাজ গোনন্দ বন্ধু জরাসন্ধের আহ্বানে মথুরায় গিয়েছিলেন হয়ত এই পথেই। কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ। তাই কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী বহু সৈন্য সমাবেশে অবরোধ করে যাদবী সেনাদের ধ্বংস করলেন গোনন্দ।

প্রচুর সৈন্য ধ্বংস হচ্ছে এবং গোনন্দের বিক্রমে কেউ এঁটে উঠতে পারছে না দেখে হলধারী বলরাম লাঙ্গল নিয়ে আক্রমণ করলেন গোনন্দকে। সমান বলশালী দুই বীরের মধ্যে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর গোনন্দকে বধ করে বলরাম জয়ী হলেন।

গোনন্দের পুত্র দামোদর রাজা হয়েও পিতৃহত্যার শোক ভুলতে পারলেন না। কিছুদিন পর যখন সিন্ধুতীরে গান্ধার রাজ্যের স্বয়ম্বর সভায় যাদবদের নিমন্ত্রণ হয়েছে শুনতে পেলেন, তখন তিনি বিপুল সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধে তিনিও নিহত হলেন। দামোদরের বিধবা স্ত্রী রাণী যশোবতী তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাশ্মীরে এসে সেই রাণীকে সিংহাসনে বসালেন। মেয়েমানুষ সিংহাসনে বসবেন এতে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের ঘোর আপত্তি ছিল। তাই মন্ত্রীরাও বিরুদ্ধে গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বুঝিয়ে বললেন যে, কাশ্মীরী রমণীরা পার্বতীর অংশ আর রাজা মহাদেবের অংশ। তাই রাজা বা রাণীর কোন ত্রুটি থাকলেও যাঁরা কাশ্মীরকে ভালবাসেন সেই পণ্ডিতদের কখনও তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়।

সে যুগেও কাশ্মীরী পণ্ডিতদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সকলেই রাণী যশোবতীকে সম্মান করতে লাগলেন। যথাসময়ে রাণীর এক পুত্র হ'ল। পিতামহের নামে তাঁর নাম হ'ল গোনন্দ। কুরুক্ষেত্রের, যুদ্ধের সময় ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা কুরু বা পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু কহ্লন মিশ্র বলেছেন, দ্বিতীয় গোনন্দ শিশু ছিল বলেই এ যুদ্ধে তাঁর ডাক আসেনি।

গোনন্দ যখন জরাসন্ধের বন্ধু তখন দুজনের যাতায়াত ছিল নিশ্চয়ই। নাহলে বন্ধুত্ব হ'ল কি করে? জরাসন্ধের রাজধানী রাজগিরিতেও গোনন্দ গিয়েছেন

হয়ত কিংবা জরাসন্ধ এসেছেন কাশ্মীরে এমনও হতে পারে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও হয়ত এপথেই গিয়েছিলেন কাশ্মীরে। তাই মনে হয় যুগ যুগ ধরেই এপথে মানুষের আনাগোনা চলেছে।

ইতিহাসেও পাওয়া যায় কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই পথেই ভারতের অন্যান্য রাজ্য জয়ের জন্য গিয়েছিলেন। মোগল আমলে সম্রাট জাহাঙ্গীর বহুবার এসেছেন কাশ্মীরে। তিনিই নাকি এ রাস্তার উন্নতি করেন।

বৌদ্ধ যুগেও বুদ্ধের অনুগামীরা এখানে ধর্মপ্রচারে এসেছেন। রাজতরঙ্গিণীতে দেখা যায় বহু বৌদ্ধমঠ ও বিহার নির্মাণকরেছেন কাশ্মীরের রাজারা। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে, বুদ্ধের নির্বাণ লাভের দেড়শ বছর পরে সুদূর তুরস্ক থেকে এসে হুস্ক, জুস্ক ও কণিষ্ক নামে তিনজন তুরস্ক বংশীয় রাজা এখানে বহুদিন রাজত্ব করেন এবং নিজেদের নামানুসারে নগর নির্মাণ করেন। বরমূলার পথের ধারে ছোট্ট গ্রাম 'উস্কুরই' নাকি এখনও রাজা হুবিষ্কের প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ নগর হুস্ক-পুরের স্মৃতি বহন করছে। শোনা যায় হিউএন সাঙ কাশ্মীরে এসে এখানে ছিলেন নাকি।

রাজা জুস্ক জয়স্বামীপুর, জুস্কপুর নির্মাণ করেছিলেন। বহু বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য নির্মাণও তাঁদের কীর্তি। কীর্তি রক্ষার জন্য নিজের নামে নগর নির্মাণও তখনকার দিনে রীতি ছিল। তবে গোনন্দ বংশীয় রাজা শচীনরের মৃত্যু হলে তাঁরই খুল্লতাত পিতামহ তনয় অশোক রাজা হলেন। রাজা অশোক (ইনি আমাদের ইতিহাস-পরিচিত ধর্মাশোক নন, তবে ইনিও বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন) নিজের কীর্তিরক্ষার জন্য যে নগরী নির্মাণ করলেন তার নাম দিলেন 'শ্রীনগর'। এই নগরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। ঐ ধর্মারণ্য বিহারের সৌধগুলি এত উচু ছিল যে সৌধচূড়া মানুষের নজরে আসত না। কাব্য হলেও নিশ্চয়ই কিছু সত্য ছিলই। তবে এই রাজা আবার সন্তান কামনায় শিবের আরাধনা করে জলৌক নামে এক পুত্র লাভ করেন। তিনি নাকি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। কবি বলেছেন, তিনি স্বর্ণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যতা পূরণ করতে পারতেন। কারণ তাঁর কাছে এমন অদ্ভুত এক জিনিস ছিল যা দিয়ে তিনি যে কোন ধাতুকেই সোনায় পরিণত করতে পারতেন। তাঁর আরো একটি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তিনি কুম্ভকের সাহায্যে নাগ সরোবরে প্রবেশ করে নাগকন্যাদের সাথে মিলিত হতেন।

সে যাই হোক আমি ভাবছিলাম আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল 'শ্রীনগরের' কথা।

রাজা অশোকের নির্মিত বৌদ্ধ বিহারগুলির কিছু ধ্বংসাবশেষ কি এখনও দেখতে পাব, নালন্দায় যেমন দেখেছিলাম ? পুরাতন স্মৃতির কিছু কি এখনও অবশিষ্ট আছে ?

॥ ১৪ ॥

বানিহাল এসে গাড়ি দাঁড়ালো। আবার একটু বিশ্রাম। গাড়ির সবাই চা খেয়ে নিল এখানে। পথের ধারেই চায়ের দোকান। বড় বড় কাঠের বারকোষে করে পেঁড়া বিক্রী করছে দেখলাম। পেঁড়ার চেহারা দেখে মনে হ'ল এখানে দুধ প্রচুর পাওয়া যায়। খাদ্য এবং বাসস্থান দুই-ই আছে। রাস্তার একপাশে রেস্ট হাউসের বেশ বড় বাড়ি চোখে পড়ল। অনেক যাত্রীও আছেন এখানে দেখতে পেলাম।

এর পরই আবার চড়াই শুরু হল। কিন্তু বেশ চওড়া আর সুন্দর রাস্তা। আমরা নূতন রাস্তায় 'জহর টানেল' দিয়ে বানিহাল পার হয়ে গেলাম। উপরের দিকে তাকিয়ে পুরাতন রাস্তা দেখতে পেলাম। সেটা ন' হাজার ফিট ওপর দিয়ে গিয়েছে। জহর টানেলের জন্য পথ বেশ কয়েক মাইল সংক্ষিপ্ত হয়েছে। পাশাপাশি দুটো টানেল। একটা যাবার এবং একটা আসার। মাইল দু'এক লম্বা টানেল পার হতে আমাদের মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। ভেতরে পোস্টের মাথায় মাথায় ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে। তাতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। সব সময় লোকও খাটছে মেরামতির কাজের জন্য। গাড়ি ফুল স্পীডে পার হয়ে গেল এ পথটুকু।

তারপরই চোখে পড়ল কাশ্মীর ভ্যালী। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। আমরা ধীরে ধীরে নীচে নামছি। একপাশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে যেন পাথরের দেয়াল। প্রকৃতি যেন সযত্নে আড়াল করে রেখেছে এই সৌন্দর্যের খনি। অন্যপাশে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাইন গাছ। যেন সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। আর সবুজের যে এত 'রকম' আছে তাই কি জানতাম ? কচি সবুজ রংয়ের ওপর আরো সবুজ, আরো গাঢ় সবুজের নক্শা ! এতক্ষণে চোখ জুড়িয়ে গেল যেন। সারাদিনের পথের ক্লান্তি মুছে গেল নিমেষে।

ঘড়িতে যদিও সাতটা বেজে গেছে তবুও সন্ধ্যা নামেনি। আকাশে মেঘে

মেঘে বিচিত্র বর্ণের খেলা চলছে। মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলাচ্ছে। সাদা, লাল, জরদা, সোনালীর ওপর মাটির সবুজের ছোঁয়া লেগেছে বুঝি মাঝে মাঝে। কোন্‌টা দেখব? নীচে না ওপরে, বুঝতে পারি না। শুধু চোখ মেলে আছি। কোনটা যেন হারিয়ে না যায়।

মনে হল সার্থক নাম ভূস্বর্গ! আর এই অপূর্ব সন্ধ্যাটি চিরকাল আঁকা থাকবে মনে।

ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে এলো। আমরা এখন চলেছি শ্রীনগর ভ্যালীর প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে। দুধারে পাইন আর পপ্‌লারের সারি। রাত প্রায় নটায় শ্রীনগর টুরিস্ট অফিসে পৌছলাম।

সবাই নেমে দাঁড়িয়েছি গাড়ি থেকে।. গাড়ির ছাদের ওপর থেকে পালপত্র নামানো দেখছি। ড্রাইভারটি আমার ছাতাটি হাতে করে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে।

হেসে বলল, নমস্কার মাইজী। এই নিন আপনার ছাতা। আমার সীটের পাশেই রেখেছিলাম ছাতাটি। নামবার সময় তাড়াতাড়িতে ভুলে গেছি। আমি একটু লজ্জা পেলাম। কিন্তু ছাতা ফেলে নেমেছি সেজন্য নয়। আমার মনে হ'ল যেন ড্রাইভারটির হাসির অর্থ, নিরাপদে পৌছে দিলাম তো? আপনি তো ভয় পেয়েছিলেন পথে?

মনে হ'ল আমি যেমন ওর পেছনে থেকে আয়নায় দেখেছি ওকে ঘুমোতে, ও-ও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে আমাকে।

একটু লজ্জিতভাবে প্রতিনমস্কার করে ভদ্রতাসূচক প্রশ্ন করলাম, আপনি কি কাশ্মীরবাসী?

খুব ভদ্র ড্রাইভারটি। বিনীতভাবে জানালো, আসামে ওর বাড়ি। তবে বহুদিন ধরেই এপথে গাড়ি চালাচ্ছে।

ভাবলাম, গাড়ি চালানোর ধরন দেখেই বুঝেছি সেটা। পথের বাঁকগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেছে। নাহলে পাহাড়ী পথে চোখ বুজে গাড়ি চালানোর মত অত নিশ্চিন্ততা আসে না।

আবার মনে মনে শঙ্কিত হলাম একটু। আসামে আমি গিয়েছি। দেখেছি অসমীয়ারা বাংলা বেশ ভালো বলতে পারে। এরও আসামে বাড়ি যখন, বাংলা ভালোই বুঝতে পারে হয়তো। ওকে ওভাবে ঘুমুতে দেখে কিছু বলিনি তো?

আর কোন প্রশ্ন করলাম না। গল্প করার সময়ও ছিল না। ড্রাইভারটিও আবার নমস্কার করে বিদায় নিল।

॥ ১৫ ॥

রাত হয়েছে। আমাদের থাকা-খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে তাই নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে অবশ্য পাণ্ডার মত বোটওয়ালারা আমাদের ছেঁকে ধরেছে। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী এবং ইংরেজী সব রকমেই বোঝাতে চেষ্টা করছে, বোটে না থাকলে কাশ্মীরে আসাই বৃথা। আর নাও যদি থাকি তবু একবার দেখে আসতে দোষ কি? প্রত্যেকেই নিজের বোটের বর্ণনায় পঞ্চমুখ। নামগুলো শুনতেও বেশ লাগছে।

টুরিস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল একখানি ঘর খালি আছে। আমরা সেটা পেতে পারি। আর ভেতরেই ক্যানটিনে এখনও খাবার পাওয়া যাবে। আমরা আশ্বস্ত হলাম—এত রাতে আর কোথাও যেতে হল না ব'লে।

এখানে সারি সারি লম্বা দোতলা বাড়ি। ঘরও প্রচুর। তবু শুনলাম যাত্রীরা সব সময় জায়গা পায় না এখানে। আগে থাকতেই তাই চিঠি লিখে 'বুক' করতে হয় ঘর। আমাদের এ খবর জানা ছিল না। তবু ভাগ্য ভাল একখানা ঘর পেয়ে গেলাম।

নীচের তলায় আমরা যে ঘরটি পেলাম সেখানা ডবল বেডের। দুখানা খাট, বিছানা গদি সবই আছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো। আলমারি, ড্রেসিংটেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্রও আছে। ভাড়াও খুব বেশী নয়। আমরা লোক বেশী বলেও কোন অসুবিধা হ'ল না। কার্পেটের ওপর হোল্ড-অল বিছিয়ে বিছানা করে নিলাম। এখানে মেয়েদের 'ফার্স্ট প্রেফারেন্স।' অর্থাৎ আমাদের খাটে শোবার ব্যবস্থা হ'ল এবং ছেলেরা মেঝেতে ঘুমোবে ঠিক হ'ল।

রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হ'ল। বলা যায় না যদি বন্ধ হয়ে যায় ক্যানটিন! কিন্তু খাবার পরই ঘুমোতে ইচ্ছে হ'ল না, তাই একটু পথে বেরোলাম ঘুরে দেখার জন্য।

টুরিস্ট অফিসের সামনে দিয়ে সুন্দর চওড়া রাস্তা। গেট থেকে বেরোলে রাস্তার ঠিক উল্টোদিকেই বিরাট ময়দানে অসংখ্য তাঁবু ফেলা দেখে জানতে

চাইলাম, ওখানে এত তাঁবু কেন ?

বোটওয়ালারা তখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। জানালো—ওখানেও আমাদের মত ভ্রমণকারীদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন কাশ্মীর সরকার। যারা টুরিস্ট লজে জায়গা পায় না তারা ওখানে থাকতে পারে। খরচায় কম।

রাস্তার দুপাশে বড় বড় চিনার গাছের সারি। আমরা বেড়াতে বেড়াতে ঝিলমের খালপুল পার হয়ে ওপারে চলে গেলাম। সেও বেশ সুন্দর চওড়া বড় রাস্তা। কোন পার্বত্য শহরে এসেছি মনে হচ্ছে না। কলকাতার মত সুন্দর মসৃণ রাজপথ। পথ একটুও উঁচুনীচু নয়। এতক্ষণে বোটওয়ালারা বুঝতে পেরেছে এ যাত্রায় আমরা বোটে থাকব না। কারণ আমরা অমরনাথের যাত্রী। কাল সকালেই পহলগাঁও চলে যাব। কাজেই তারা একে একে সরে পড়েছে। শুধু অতি উৎসাহী অল্পবয়সী একটি ছোকরা তখনও কথা বলতে বলতে আমাদের সাথে সাথে হাঁটছে। ওর কাছেই শুনলাম,—এ রাস্তার নাম 'বুলভার রোড'।

উৎসাহ আমাদেরও কম নয়। রাত হয়েছে। পথও নির্জন। তবু আমরা গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম। চাঁদনী রাত। অল্প অল্প ঠাণ্ডা। বেড়াতে বেশ ভালো লাগছিল। খানিকদূর এগিয়ে ডাল লেক দেখতে পেলাম। রাস্তার বাঁদিকে লেক। জলে সারি সারি হাউসবোট দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকে পাহাড়ের কোলে বড় বড় হোটেল।

কাশ্মীরের হাউসবোটের অনেক গল্প শুনেছি। মনে হল 'অমরনাথ' থেকে ফিরে এসে হাউসবোটে থাকলে বেশ হয়।

সঙ্গের ছোকরাটি কোন বোটের লোক কিনা জানি না। আমাকে বোটগুলো দেখিয়ে বলে উঠল, ফিরে এলে মা বোটে উঠবেন। আমি আপনাদের সস্তায় সবচেয়ে ভালো বোটে থাকবার ব্যবস্থা করে দেব।

একটু হাসলাম ওর কথা শুনে। ও যেন আমার মনের কথাই ধরে ফেলেছে। ওকে বললাম, ঘুরে আসি তারপর থাকা যাবে।

আমার কথায় ওর উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমাকে বলল, আমি আপনাদের সাথে অমরনাথ যাব। তাঁবু, ঘোড়া, সব ব্যবস্থা করে দেব আপনাদের। পথে কোন তক্‌লিফ হতে দেব না।

এবার ওকে একটু নিরাশ করতে হ'ল। বললাম, এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। সঙ্গের ছেলেদের দেখিয়ে দিলাম। ওদের সাথে কথা বলতে হবে।

ও কিন্তু দমবার পাত্র নয়। আমাকে ছেড়ে এবার ওদের পিছু নিল।

ছেলেটি কিছু গাইডের কাজও করেছে আমাদের। এই পথের ধারে কি কি দ্রষ্টব্য আছে বলে যাচ্ছিল। এই রাস্তা ধরে বরাবর গেলেই নাকি মোগল উদ্যান দেখা যায়। তবে সেটা খুব কাছে নয়। বাসে যেতে হবে।

দূরত্বের কথা শুনে হেসেছিলাম মনে মনে। ও তো জানে না, কতদূর থেকে এসেছি আমরা! বাসে কয়েক মাইল পথ যেতে হবে হয়ত। সে আর কতটুকু দূরত্ব! আমার তো মনে হচ্ছে শ্রীনগর যখন পৌঁছে গেছি তখন সবই তো হাতের কাছেই।

জ্যোৎস্নার আলোয় ডাল লেকের জল ঝিক্‌মিক্ করছে। দূরে আবছা পাহাড়ের সারি। শান্ত নির্জন পরিবেশে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর লাগল। ফেরার পথে পথের ধারের পাহাড়ের মাথায় মন্দির দেখে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের মন্দির ওটা?

শুনলাম, ওর নাম শঙ্কর মঠ। ভিতরে শিবমূর্তি আছে। হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য শঙ্করাচার্য সারা ভারত প্রদক্ষিণ করেছেন। সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে পদব্রজে এখানেও এসেছেন তাহলে তিনি! শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে মন ভরে উঠল। মনের পর্দায় ভেসে উঠল, মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড কমণ্ডলুধারী তেজোদ্দীপ্ত এক ব্রাহ্মণের মূর্তি।

বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে—ধীরে ধীরে অহিংস বৌদ্ধ ধর্মে অনেক অনাচার ঢুকেছে। বৌদ্ধ কাপালিকের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি তারা তন্ত্র মন্ত্র অভিচার দ্বারা হিংসার পথে নরহত্যা করতেও কুণ্ঠিত নয়। প্রায় সারা ভারতেই তখন এক তমসাচ্ছন্ন যুগ। কাশ্মীরও বাদ যায়নি।

সে সময় সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের তীক্ষ্ণ যুক্তিবানে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করেছিলেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন সনাতন হিন্দুধর্মের।

শুনেছি শ্রীনগর থেকেই অমরনাথের 'ছড়ি' যাত্রা করে। অনুমান করলাম ঐ শঙ্কর মঠ থেকেই তাহলে 'ছড়ি'র যাত্রা শুরু হয়।

ভারতবর্ষে যুগে যুগে জন্ম নিয়েছেন যুগাবতার এমনি সব মহাপুরুষ। বেশী-দিনের কথা নয়—বাংলাদেশেও এমনি এক মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সাথে সাথে স্বামী বিবেকানন্দের নামও মনে পড়ল, ভারতের বাইরেও যিনি আমাদের ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কাশ্মীরেও এসেছিলেন তিনি।

রাতেই খবর সংগ্রহ করা গেছে ভোরে পহলগাঁও যাবার বাস পাওয়া যাবে।

গভর্ণমেণ্ট বাস ছাড়াও সারাদিনে বহু প্রাইভেট বাস যাবে অমরনাথের যাত্রী নিয়ে। তবু নাকি বাসের টিকিট পাওয়া শক্ত।

হবে না কেন? সারা ভারত থেকে সহস্র সহস্র পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এসময়। প্রতিটি বাসে আর ক'জন যাত্রীর আসন হতে পারে? ভোরবেলাই তাই টিকিটের জন্য বাস স্ট্যাণ্ডে যেতে হ'ল। খেলুভাই আর অসিত ঠাকুরপো দুটো টিকিট পেয়ে প্রথম বাসেই পহলগাঁও রওনা হয়ে গেল। ওরা আগে গিয়ে ওখানে আমাদের থাকার এবং অমরনাথ যাবার ব্যবস্থা করবে।

একসাথে এতগুলো টিকিট পাওয়া গেল না। অনিলদা এসে খবর দিল, বাসের টিকিট আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কি হবে? সকলেই চিন্তিত।

আমি বললাম, এতদূর থেকে এসে এখানে পড়ে থাকব না। যত খরচ লাগে লাগুক। নাহয় প্রাইভেট গাড়িতেই যাব। শুনলাম চেষ্টা করলে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।

পরে অবশ্য বাসের টিকিট পাওয়া গেল। আমরা চার জা আর অজিত ঠাকুরপো দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হলাম। অনিলদা আর মণ্টুকে থেকে যেতে হল। ওরা তারো পরের বাসে গিয়ে পৌঁছালো।

॥ ১৬ ॥

আমরা যে পথে কাল এসেছি, শ্রীনগর ভ্যালীর সেই পথেই চলেছি। শ্রীনগর থেকে পহলগাঁয়ের দূরত্ব সাতানব্বই কিলোমিটার। গাইড বইতে দেখেছি শ্রীনগরের উচ্চতা পাঁচ হাজার দুশো ফিট। পহলগাঁও আরো দু' আড়াই হাজার ফিট উঁচু শ্রীনগর থেকে। বিরাট এই কাশ্মীর ভ্যালী। লম্বায় একশো কুড়ি মাইল এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ষাট মাইল চওড়া।

সমতল পথ দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। দুধারে ধানক্ষেত। মা-লক্ষ্মী যেন তাঁর আঁচল বিছিয়ে দিয়েছেন। সোনা রংএর পাকা ধানের সুগন্ধ নাকে আসছে। কখনও কোনো পুরাতন গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। প্রাচীনকালে হয়ত ঐগুলি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে পড়েছি সেকালে কাশ্মীরের রাজা, রাণী এমন কি মন্ত্রীরাও নিজের নামে নগর এবং গ্রাম পত্তন করতেন।

মনে হল কোন রাজা হয়ত নিজের কীর্তিরক্ষার জন্যই এই নগর গড়েছিলেন।

মঠ, মন্দির স্থাপনা করেছিলেন এখানে। ভেবেছিলেন অক্ষয় হয়ে রইল তাঁর কীর্তি। আজ তার ভগ্নাবশেষ শুধু স্মৃতি বহন করছে মাত্র সেযুগের। কালের স্রোতে মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে তাঁর নাম। লোকে ভুলে গেছে তাঁকে। নাম এবং কীর্তি স্থায়ী হয়নি কিছুই।

বাঁদিকে ঘুরে কিছুদূর গিয়ে এবার আমরা ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছি। একেবারে পেছনের সীটে বসেছি আমি। ঝাঁকুনিটা একটু বেশী লাগছিল কিন্তু একদিক দিয়ে ভালই ছিলাম বলতে হবে। কারণ সামনের একটি অবাঙ্গালী মেয়ে এইটুকুন চড়াইতেই বমি করতে শুরু করেছে। পাশের ভদ্র-লোকের অবস্থা কাহিল। কিছু করারও নেই। অত্যন্ত ঠাসাঠাসিতে, গরমে হয়ত অসুস্থ বোধ করেছে মেয়েটি।

পথের ধারে ছোট ছোট গ্রাম। বাসের শব্দে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। ফুটফুটে সব বাচ্চা। মা'দেরও উঁকিঝুঁকি দিতে দেখা যাচ্ছে।

পহলগাঁয়ের কিছু আগে একটা বাঁকের মাথায় 'লীডারের' দেখা পেলাম। পাহাড়ী নদী আগেও অনেক দেখেছি। কিন্তু এমন অদ্ভুত সুন্দর জলের রং কখনও দেখিনি। গাঢ় সবুজ রং-এর জল। আর রাশি রাশি সাদা ফেনা সূর্যকরে ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে। অপূর্ব সে দৃশ্য। প্রথম দর্শনেই 'লীডার' আমার মনোহরণ করল। বাসের শব্দ ছাড়িয়ে যেন লীডারের কলরব কানে আসতে লাগল। লীডার যেন আনন্দে স্বাগত জানিয়ে আগিয়ে নিতে এসেছে আমাদের।

পহলগাঁও বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেখি খেলুভাই আর অসিত ঠাকুরপো দাঁড়িয়ে আছে। ওরা জানালো, সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

কিন্তু ওদের সাথে সাথে গিয়ে দেখি লীডার নদীর ধারে ছোট ছোট দুটো তাঁবু খাটিয়ে রেখেছে শুধু। বেডিংগুলো ওখানেই ফেলে রেখেছে ঘাসের ওপর। আমাদের পৌঁছে দিয়েই ওরা আবার ওপরে চলে গেল। কালকের যাবার যোগাড় করতে হবে। তখনও ঘোড়া ঠিক হয়নি। নাম লিখিয়ে রেখেছে অফিসে। আমাদের সকলের জন্য একটা করে, আর মালের জন্য দুটো, অন্ততঃ এগারোটা ঘোড়া দরকার। এতগুলো ঘোড়া পাওয়া যাবে কিনা অফিসারটি বলতে পারেননি। কারণ এবার অসম্ভব যাত্রী সমাগম হয়েছে।

পথে রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু মালপত্র সবই ঘোড়ার পিঠে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঘোড়া যোগাড় না হলে এপথে যাওয়া অসম্ভব।

তাঁবুর দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল আজ থেকে যাযাবরের জীবন শুরু হল। যখন যেখানে খুশী তাঁবু খাটিয়ে থাকা যাবে। বেশ মজা লাগছিল ভাবতে।

লীডারের ধারে নরম ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। দুধারে পাহাড় ঘেরা। মাঝে সবুজ উপত্যকা। আর লাস্যময়ী লীডার পান্নাগোলা জলে রূপের লহরী তুলে নেচে গেয়ে ছুটে চলেছে। উপলখণ্ডে বাধা পেলে আরো উচ্ছ্বাসে যেন চপল হাস্যে ভেঙ্গে পড়ছে শুভ্র ফেনায়। জলতরঙ্গ বেজে উঠছে যেন মিষ্টি স্বরে। ওপারের পাহাড়ে ঝাউবনের মাথায় পড়ন্ত রোদ। কখনও মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে। আবার সরে যাচ্ছে। বেলাশেষের সোনালী রোদের আভায় নদী, পাহাড়, উপত্যকা অপরূপ সাজে সেজেছে। চেয়ে চেয়ে আশ মেটে না।

কখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমেছে টের পাইনি। ওরা সব ফিরে এসেছে ওপর থেকে। সঙ্গে দুটো লণ্ঠন আর মোটা মাদুর নিয়ে এসেছে। ফিরে দেখি তাঁবুর ভেতর অন্ধকার। আলো জ্বালিয়ে রাতের থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। তাঁবুর ভেতরেও নরম ঘাস আর লতায় পা ডুবে যাচ্ছে। তারই ওপর মোটা মাদুর দুটো ক'রে পেতে হোলড-অল বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা হ'ল।

বিকেলে নদীর ধারে বহু তাঁবু পড়েছে দেখেছিলাম। লোকজন ছিল না বিশেষ। এখন ওপর থেকে খেয়ে-দেয়ে ফিরতে শুরু করেছে। তাই বহু লোকের কথাবার্তায় কিছুক্ষণের জন্য নির্জন উপত্যকায় প্রাণচাঞ্চল্য জেগেছে।

আমরা আবার ওপরে চললাম। আমাদেরও রাতের খাবার ওপর থেকে খেয়ে আসতে হবে। ওপরটা শহরের মতই। সুন্দর চওড়া পীচের রাস্তা। ইলেকট্রিক আলোয় দোকান-পসার ঝলমল করছে। অনেকগুলো হোটেল। আমরা এক পাঞ্জাবী হোটেলে খেয়ে নিলাম।

ফিরতে বেশ রাত হয়েছে। পাহাড়ী পায়ে-চলা পথে নীচে নামছি। উপত্যকা থাকে থাকে নেমেছে নদী পর্যন্ত। দূর থেকে নীচের ঘুমন্ত উপত্যকা চোখে পড়ল। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। আকাশে সাদা হাল্কা মেঘের সাথে চাঁদের লুকোচুরি চলছে। মেঘের গায়ে রামধনুর রং। জ্যোৎস্নাধারায় স্নান ক'রে নদী, পাহাড়, উপত্যকা অপরূপ এক মায়াময় রূপ ধারণ করেছে।

আমাদের তাঁবুর সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় লীডারের জলে যেন হীরেপান্নার দ্যুতি ঠিকরোচ্ছে!

প্রাণভরে দেখলাম এই অপূর্ব শোভা। মনে হ'ল এমন মোহময় পরিবেশেই নাগকন্যাদের নিয়ে কাব্য লেখা চলে।

রাত বাড়ছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল সকালেই হয়ত রওনা হতে হবে। আমাকেও ঢুকতে হ'ল তাঁবুতে। মাটিতে ঘাসের ওপর মাদুর পেতে বিছানা হয়েছে। কোনপ্রকারে ঘুমের ব্যবস্থা। এতক্ষণ কাব্যলোকে ছিলাম কিন্তু এবার বাস্তবে ফিরে আসতে হ'ল। বিছানায় শুয়ে কিন্তু নাগকন্যাদের কথা মনে এলো না, বরং কুপিত নাগরাজের উদ্যতফণা মনে হতেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। গুটিসুটি হয়ে লেপ ঢাকা নিলাম। ঘুমের ঘোরে যদি জঙ্গলের দিকে-পা বাড়িয়ে দিই সেই ভয় হ'ল। একটা মশারীও নেই যে আটকাবে।

কিন্তু এত ভয়-ভাবনা সত্ত্বেও জলের একটানা শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। ভোরের দিকে যখন ঘুম ভাঙ্গল, টের পেলাম বৃষ্টি হচ্ছে। আর ঝোড়ো হাওয়ায় তাঁবুর সামনের পর্দাটা আছড়াচ্ছে। জোর বাতাসে লণ্ঠনটাও নিবে গেছে।

সকলেরই ঘুম ভেঙ্গেছে। সবাই বলাবলি করছে এভাবে বৃষ্টি চললে অমরনাথ যাওয়া মুশকিল হবে।

আমি চুপচাপ শুয়ে ভাবছিলাম, কুণ্ডু স্পেশালের বিশুর কথা। ও বলেছিল, বৃষ্টি হলে পথ আরো দুর্গম হয়।

॥ ১৭ ॥

সকালেও বৃষ্টির বিরাম নেই। মাঝে মাঝে কমে, আবার বাড়ে। সবাই চিন্তিত। এর ভেতরেই একে একে ঘোড়ার সহিসরা আসতে শুরু ক'রল। অমরনাথ নিয়ে যাবার জন্য একজন পাণ্ডাও এসে জুটল।

তাকেও জিজ্ঞেস করলাম পথের খবর। পাণ্ডাজী নানান ধরনের গল্প করে আশ্বাস দিয়ে গেল যে এই শর্মা থাকতে কোন ভয় নেই। কতবার কত যাত্রীকে 'দর্শন' করিয়েছে তার হিসেব দিল। আমাদেরও ভালোভাবে দর্শন করিয়ে আনবে বলে বিদায় নিল পাণ্ডাজী। বলে গেল, ঠিক সময়ে হাজির হবে।

দুর্গম পথে এমন একজন লোক সাথে থাকবে ভেবে ভরসা পেলাম মনে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে বৃষ্টিরও যেন জোর বাড়ল। যাওয়া হবে কি হবে না সকলের মনেই সেই প্রশ্ন। বৃষ্টি একটু কমতেই আমরা ওপরে চলে এলাম। ওখানে তো খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই যাওয়া হোক বা না হোক ওপরে আসতেই হবে।

হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওখানে বসেই আবার জটলা শুরু হ'ল, যাওয়া হবে কি হবে না। একদল যাবার পক্ষে, একদল বিপক্ষে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাওয়াই ঠিক হ'ল। তখন ঘোড়ার সহিসদের খোঁজ করে দেখা গেল ওরা ঐ হোটেলের নীচেই অপেক্ষা করছে ঘোড়া নিয়ে। আর ঘোড়া যখন আছে তখন আবার সকলেরই উৎসাহ ফিরে এলো।

তুজন ঘোড়াওয়ালাকে নিয়ে অসিত ঠাকুরপো নীচে থেকে মালপত্র নিয়ে এলো।

আমাদের সেই পাণ্ডাকেও দেখতে পেলাম। কিন্তু আমাদের সাথে যাবার কথা শুনে তিনি একটু রাগত স্বরে যা বললেন তার অর্থ, টাকার জন্য তো আর প্রাণটা দিতে পারি না!

তারপর অবশ্য সুর পাল্টে বললেন, এই বৃষ্টিতে গিয়ে শুধু শুধু কষ্ট করে কী লাভ! বৃষ্টি থামলে কাল খুব ভোরে রওনা হলেও ঠিক সময়মত দর্শন মিলবে।

পাণ্ডার কথা আমার মনে ধরেছিল। আর সেকথা শুনলে ভালই হ'ত হয়ত। কিন্তু ততক্ষণে যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। পথে থাকার জন্য তাঁবু, মালপত্র ত্রিপাল ঢাকা দিয়ে বেঁধেছেঁদে তুটো ঘোড়া নিয়ে তুজন সহিস রওনা হয়ে গেছে। আমাদের ওঠার অপেক্ষায় অন্য ঘোড়াগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

কোনদিন ঘোড়ায় চড়িনি। তারপর বৃষ্টির জন্য ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দিয়ে আরো জবড়জঙ্গ লাগছে। তবু কোনক্রমে ঘোড়ার পিঠে চাপতেই হ'ল।

আমাদের রওনা হতে বিকেল প্রায় তিনটে হয়ে গেল। লীডারের সেতু পার হয়ে মাইল তুই যেতেই কাঁচা রাস্তা শুরু হল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি তখনও চলছে। পথে অসম্ভব কাদা। আমাদের মত অনেক লোক ঘোড়ায় চলেছে, আবার হেঁটেও কেউ কেউ যাচ্ছেন দেখলাম। মনে হল হেঁটে গেলেই বুঝি ভাল ছিল। কারণ সহিস সাথে থাকলেও নিরাপত্তার ভরসা পাচ্ছিলাম না। নিজে তো ঘোড়াটাকে চালাতে জানি না। ও নিজের খেয়ালমত খাদের দিক দিয়েই চলেছে। সহিসকে বলেও কিছু ফল হচ্ছে না। ও নির্বিকারভাবে সাথে সাথে হেঁটে চলেছে। মুখে কোন কথা নেই।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে গেলে আমার ভয়টা একটু কমে, কিন্তু কিছুতেই ওকে

বোঝাতে পারছি না সেকথা। একবার পাশের খাদের দৃশ্য দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম। একটা জলধারা বিপুল গর্জন করতে করতে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীব্র বেগে নীচের দিকে ছুটে চলেছে দেখতে পেলাম। ঘোড়াটা এত ধার দিয়ে যাচ্ছে যে আমার একটা পা শূন্যে সেই ভয়ঙ্কর জলধারার ওপর ঝুলছে। যে কোন মুহূর্তে ঘোড়া পা হড়্‌কে পড়তে পারে ওতে। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাব। কেউ দেখতেও পাবে না আর।

কিন্তু আমাকে ভয় পেতে দেখে সহিসটি এবার মুখ খুলল। ধম্‌কে উঠল আমাকে। ভয় পেলে নাকি পড়ে যেতে পারি! উপদেশ দিল, পাশে দেখিস না।

কিন্তু না দেখে কি পারা যায়?

তবু আমি চুপ করেই গেলাম। তাছাড়া আর উপায় কি? যা থাকে কপালে। মনে পড়ল বদ্রীনাথের পথে আমার ডাণ্ডিওয়ালার কথা।—

সে-পথেও পাশে পাশে নদী। ডাণ্ডি আমাকে নিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। পথও সঙ্কীর্ণ সেখানে। বাঁকের মাথায় দেখা গেল ওপর থেকেও একখানা ডাণ্ডি নেমে আসছে। আমার তুজন বেহারা। আর ওপর থেকে এক স্থূলাঙ্গী মহিলাকে নিয়ে ছয় বেহারা নামছে। কেউ কিন্তু থেমে অপরকে যেতে দেবার জন্য অপেক্ষা করল না। তুদলই এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি হ'ল। এমন এক অবস্থা হ'ল যখন কেউ কাউকে ছাড়াতে পারছে না। তাকিয়ে দেখি আমি শূন্যে ঝুলছি। আমার ডাণ্ডির কাঠের ডাণ্ডা তুটো আটকে আছে বেহারাদের কাঁধের সাথে। ওরা হাত দিয়ে ধ'রেও রাখেনি। একটু ঠেলা লাগলেই টুপ করে পড়ব নীচের নদীতে। বহু নীচে থেকে খরস্রোতা নদীর গর্জন কানে আসছে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতেই ধমক খেয়েছিলাম ডাণ্ডিওয়ালার কাছে। বলেছিল, টুক্‌লে পড়ে যাবি।

সেবারও চুপ করে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনক্রমে যখন ওরা তু'দল তুদিকে হতে পেরেছিল, তখন আমি নেমে গিয়েছিলাম ডাণ্ডি থেকে। আর চড়িনি কখনও। ফেরার পথেও না।

আজও ইচ্ছে হচ্ছিল নেমে যাই ঘোড়া থেকে। কিন্তু সামনেই যা দেখলাম তাতে আর সে সাহসও হ'ল না।

বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের একটি সুন্দরী অবাঙ্গালী মেয়ে পথের সেই জলকাদার মধ্যে শুয়ে এমন হাঁপাচ্ছে যে মনে হ'ল এই বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। শ্বাস উঠেছে বোধ হয়। সঙ্গের পুরুষটি, স্বামী মনে হয়, মুখের ওপড় উপুড় হয়ে ঝুঁকে

একটু জল না ওষুধ কি মুখে দিচ্ছে। কেউ থেমে নেই তাদের জন্য। এই দুর্যোগের মধ্যে আর এই দুর্গম পথে কে কাকে সাহায্য করে! ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়েছে, তিনি ছাড়া আর বুঝি কেউ নেই সাহায্য করার। কি করুণ দৃশ্য!

পেছনে তাকিয়ে আমাদের পুরুষ সঙ্গীদেরও দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় পেছিয়ে পড়েছে। যাঁরা পায়ে হেঁটে যাত্রা করেছিলেন তাঁদের অনেককেই ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর নিয়ে ফিরে আসতে দেখলাম। পা পিছলে পড়ে যাচ্ছেন, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন। সর্বাঙ্গে কাদা।

এবার বুঝলাম ঘোড়া আর সহিসের উপর নির্ভর না করে উপায় নেই। বেলা শেষ হচ্ছে। সামনে পেছনে আর বিশেষ কিছু দেখারও নেই। বৃষ্টিতে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে এক জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে আমরা ওদের জন্য অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। ওরা এসে পৌঁছলে শুনলাম, দুটো ঘোড়া পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে। তাই ওদের দেরি। অসিত ঠাকুরপো আর মণ্টু হেঁটেই আসছে।

আমরা আবার এগোলাম। একটু দিন থাকতে থাকতে চন্দনবাড়ি পৌঁছলে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা তবুও সহজ হবে। নাহলে আরও দুর্ভোগ।

এতক্ষণ সহিসের সাথে আর কোন কথা বলিনি। এবার প্রশ্ন করলাম, আর কতদূর চন্দনবাড়ি?

ওর সংক্ষিপ্ত জবাব, থোড়ী দূর মাইজী।

শুনেছি প্রায় ন' মাইল পথ পহলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি। এতক্ষণে কতটা এসেছি, আর কতদূর যেতে হবে, থোড়ী দূর মানে আর কত মাইল পথ বাকী আছে, কিছুই জানা গেল না।

ঘোড়া ছাড়া ডাণ্ডিতে অনেকে যাচ্ছেন দেখতে পেলাম। এ ডাণ্ডিগুলো অনেকটা নৌকোর মত দেখতে। আকারেও বড়। পরে শুনেছিলাম অনেকের ডাণ্ডি ভেঙ্গে পথে আরও দুর্ভোগে পড়েছেন।

সহিসটি ঠিকই বলেছিল। একটু বেলা থাকতেই আমরা চন্দনবাড়ি পৌঁছলাম। ছোট একটা ব্রীজ পার হয়েই চোখে পড়ল অনেক তাঁবু। আর বহু লোক একটু ফাঁকা জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলাম তারা সবে এসে পৌঁচেছে। এখনও তাঁবু খাটিয়ে মাথা গোঁজার জায়গা করতে পারেনি। আমরাও তাদের পাশে দাঁড়ালাম। একখানি পাকা ঘর চোখে পড়ল। তার

বারান্দাতেও অনেকে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। তবু ঘোড়া থেকে নেমে ঘাসে-ছাওয়া একটু-খানি ময়দান মত জায়গায় দাঁড়িয়ে ভালো লাগছিল বেশ। পথের আতঙ্ক আর নেই। পায়ের নীচে এখন মাটি পাওয়া গেছে। এত লোকজন দেখেও ভালো লাগছিল। আমার পাশেই এক বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা। তাঁর সাথে গল্প করার ইচ্ছা হ'ল। তাই তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনিও কি কলকাতা থেকে এসেছেন?

উনি জানালেন বোম্বে থেকে আসছেন।

বম্বে থেকে আসছেন শুনে আমি হয়ত একটু অবাক হয়েছিলাম। তাই উনি একটু হেসে আমাকে আপ্যায়িত করে বললেন, ওঁর স্বামী কলকাতাতেই থাকেন। তবে ওঁর ছেলে 'অমুককুমার' বম্বেতে থাকে কিনা, তাই উনিও ওখানে থাকছেন আজকাল।

এমনভাবে হেসে ছেলের নাম করলেন যেন খুবই পরিচিত আমার। এবার যেন আমার চেনার কথা ওঁকে।

কিন্তু আমি তখন মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছি এ নামে আমার কোন আত্মীয় আছে কিনা। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের নামও মেলাচ্ছি মনে মনে। কার কথা বলছেন উনি কিছুতেই ধরতে না পেরে ভারী অপ্রস্তুত লাগছে। আমার মুখের ভাব দেখেই হয়ত উনি বিরক্ত হয়ে কানের হীরের ফুলের ঝিলিক তুলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আমার ছোট জা এবার আমার কানে কানে চুপিচুপি বলল, চিনতে পারছেন না? সিনেমা স্টার 'অমুককুমার', তারই মা।...কুমারও এসেছে সাথে। পথে দেখেননি?

এবার মনে পড়ল পথে ঘোড়ায় চড়ে দুটি সুবেশ তরুণ-তরুণীকে গল্প করতে করতে আসতে দেখেছিলাম। একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল বটে তাদের হাব-ভাব। তবে সত্যি চিনতে পারিনি। কারণ সিনেমা খুব কমই দেখি আমি।

ভদ্রমহিলা তখন আর কারো সাথেই কথা বলছেন না। দেখলাম গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝতে পারলাম ওঁর স্বনামধন্য ছেলের পরিচয়েও ওঁকে চিনতে পারিনি বলে ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে মনে। আমিও আর কথা বলার চেষ্টা করিনি।

ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপুনি ধরে গেল। প্রায় ন' হাজার পঁচিশ ফিট ওপরে এসেছি আমরা। সঙ্গে ফ্লাস্কে গরম চা ছিল। সবাই একটু করে

খেয়ে চাঙ্গা হ'লাম। একটু বেলা থাকতে এসে পৌঁছলেও এখনও তাঁবু খাটানো যায়নি। একে তো আগে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সুবিধেমত জায়গায় তাঁবু ফেলেছেন। পহলগামের মত অতটা জায়গাও নেই এখানে। আর ত্রিপাল দিয়ে ঢাকা সত্ত্বেও তাঁবুগুলো কি করে ভিজেছে। এবার আর নদীর কাছে নয়। যে-দিকটা আগেই তাঁবু পড়েছে। পাহাড়ের ওপরদিকে গাছপালার মধ্যে একটু জায়গা করে তাঁবু খাটানোর চেষ্টা চলছে তখন থেকে। কিন্তু জলে ভেজা তাঁবু-গুলো কিছুতেই খাড়া থাকছে না। বার বার ভেঙ্গে পড়ছে। পাথুরে মাটিতে শক্ত করে খুঁটি পোতাও যাচ্ছে না।

রাত নটা হয়ে গেল তাঁবু খাটাতে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজেছি। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে মনে হল, যাক তবু একটা আশ্রয় মিলল। ভেজা ঘাসের ওপর মাদুর বিছিয়ে কোন রকমে বিছানা করা হল।

একটু আগেই মণ্ট আর অসিত ঠাকুরপো এসে পৌঁচেছে। পথে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে বলল।

সে তো হবেই। পদযাত্রীদের কষ্ট তো চোখে দেখেই এসেছি। শুনলাম রাতের অন্ধকারে ওই জলকাদায় অনেকে পথেই পড়ে আছেন এখনও।

কি ভাগ্যি বিছানাগুলো ভেজেনি! বিছানায় বসে বসেই সঙ্গে যা শুকনো খাবার ছিল তাই খেয়ে নিলাম আমরা। সবাই ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম তাই। কিন্তু সারারাত ঘুম এলো না চোখে।

আমাদের যেখানে তাঁবু পড়েছে তার খানিকটা ওদিকে মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে। যাত্রীদের এই দুর্গম পথে নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্যই এ ব্যবস্থা। সেখান থেকেই বার বার মাইকে ঘোষণা করছে,—পথে যাত্রী বা ঘোড়াওয়ালা যে যেখানে আছ সেইখানেই থাকো। উদ্ধারকারী দল যাচ্ছে। ভয় পেয়ো না। তোমাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নাম ধরে ধরে বলছে তাই বুঝতে পারছি, কার যেন স্ত্রী পথেই থেকে গেছে। স্বামী এসে পৌঁচেছেন। এখানে এসে স্ত্রীর খোঁজ না পেয়ে মিলিটারির শরণাপন্ন হয়েছেন।

মনে হ'ল কী করুণ অবস্থা ভদ্রলোকের! কোনক্রমে এসে পৌঁচেছেন। ভেবেছেন স্ত্রী হয়ত আগেই এসেছেন। কিন্তু এখানে এসে স্ত্রীর খোঁজ না পেয়ে কি বিপদেই পড়েছেন ভদ্রলোক! আর পথে তাঁর স্ত্রীও হয়ত স্বামীকে না দেখতে

পেয়ে পাগলের মত হয়েছেন। কিছু করারও নেই। এই দুর্গম পথে কোথায় পড়ে আছেন তিনি কে জানে!

বৃষ্টি আবার জোরে শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের গম্ভীর গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে আরো বেশী ভয়ঙ্কর আওয়াজ হচ্ছে, কানে তালা লাগার উপক্রম আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে এই দুর্দান্ত শীতের রাতে ঝড়জলে আশ্রয়হীন ঘোড়াগুলোর কী কাতর আর্তনাদ! অবলা পশুর এই বুকফাটা বিকট চিৎকারে ঘন তিমিররাত্রির বিভীষিকা আরো বাড়িয়ে তুলছে যেন।

রাত. বারোটা বেজে গেল। এখনও সমানে মিলিটারি ক্যাম্প থেকে লাউড-স্পীকারে বলে যাচ্ছে শুনছি, অমুক যাত্রী তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো। উদ্ধারকারী যাচ্ছে। ভয় পেয়ো না।

আমার বার বার মনে হচ্ছে সেই অসহায় দম্পতীটির কথা, যাদের ফেলে এসেছি পথে। তাদের কি হ'ল? মেয়েটি কি বেঁচে আছে? তাদের কি উদ্ধার করা হয়েছে? কে বলবে সে খবর!

আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়েই উদ্ধারকারীদল পেট্রোম্যাক্স হাতে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে আর একদল ফিরে এসেছে কোন বিপন্ন যাত্রীকে নিয়ে। ওদের কথাবার্তায় মনে হল আরো অনেকেরই স্বামী এসেছে স্ত্রী আসেনি, ছেলে এসেছে, মা আসেনি। কোথায় কে আছে, কেমন করে তাঁদের খোঁজ পাবে কে জানে! যদি কেউ সারারাত পথেই পড়ে থাকে, কি হবে?

আমাদের ঘোড়ার সহিসরা দুই তাঁবুর মাঝখানে একটু আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে। এই শীতে ওই আগুনটুকুই যা ওদের ভরসা। শীতবস্ত্র বিশেষ কিছু নেই গায়ে। সারারাত জেগেই কাটাবে হয়ত। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে কিছু ভাত এনেছিল। তাই খেয়েছে। আগুন জ্বালাবার এই কাঠটুকুনও হয়ত ওরা পহল-গাম থেকেই সংগ্রহ করে এনেছে।

মনে হ'ল আমাদেরই একটা ঘোড়া একটু মাথা গোঁজার আশায় আমার ওপাশ থেকে তাঁবুর দেয়ালটা ঠেলছে, ভয় হ'ল যদি আবার হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে! তবু মনে মনে না বলে পারলাম না, আহা, বেচারী!

ঘোড়াওয়ালারা বলাবলি করছিল, কাল হয়ত দেখবে কত ঘোড়া ঠাণ্ডায় জমে মরে গিয়েছে। আমার ভয় হ'ল, আগুনটুকু নিবে গেলে ওদের অবস্থাই বা কি হবে?

রাতের প্রহর গুনছি। মনে হচ্ছে, বুঝি এ কালরাত্রির আর শেষ নেই। মাথার কাছে টর্চটা ছিল, হাত বাড়িয়ে নিয়ে হাতঘড়িটা দেখলাম। রাত দুটো। এখন আর জীবিত কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। মিলিটারি ক্যাম্পের সেই লাউডস্পীকারও চুপ করেছে। শুধু টের পাচ্ছি এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসের শন্ শন্ আওয়াজ কানে আসছে। বাইরে তাণ্ডবলীলা চলেছে সমানেই। মনে হচ্ছে কে যেন আমাদের তাঁবুর ঝুঁটিটা ধরে নাড়া দিচ্ছে। দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসস্থলের কাছাকাছি এসেছি। সন্দেহ হচ্ছে এসব তাঁরই অনুচরবৃন্দের কীর্তি হয়ত। দেবদর্শনের পূর্বে বিভীষিকা দেখাচ্ছে আমাদের।

মনে মনে হিসেব করলাম, কয়েক সহস্র লোক এই পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছে আজ। তারা সবাই এমন নিঃশব্দ হয়ে গেল কেন? কিছু আগেও ঘোড়াগুলোর কাতর ক্রন্দন শুনতে পেয়েছি। তারাও কেন চুপ ক'রে গেল? এই মৃত্যুপুরীতে আমিই কি একলা জেগে আছি শুধু?

একটু আগে ঘোড়াগুলোর অব্যক্ত ক্রন্দন বড় ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে যে কোন জীবিত প্রাণীর সাড়া পেলে যেন ভালো লাগে।

আমরা চার জা এই ছোট্ট তাঁবুতে ঘুমিয়েছি। তাকিয়ে দেখি ওরা তিনজন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে। আমারই চোখে ঘুম নেই।

বিদ্যুতের আলোয় পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছি, দুটো তাঁবু মুখোমুখি খাটিয়ে মাথার ওপর যে আচ্ছাদনটুকু হয়েছে, তার নীচে ঘোড়ার সহিসগুলোও জটলা পাকিয়ে একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। আগুনটুকু নিবে গেছে। তবু একে অন্যের দেহের উত্তাপে ওরাও ঘুমে অচেতন হয়ে ঢ'লে পড়েছে।

লেপের নীচে শুয়েও আমার চেখে ঘুম নেই একবিন্দু। অসহ্য বোধ হচ্ছে।

॥ ১৮ ॥

হয়ত কখন একটু তন্দ্রা নেমেছিল আমার চোখেও, তারই মাঝে একটা মিষ্টি সুর এলো কানে। কি ভালোই লাগল! আনন্দে ভ'রে উঠল আমার মন। তাহলে বেঁচে আছে ঐ ছোট্ট পাখীটাও! রুদ্রের তাণ্ডবে তবে প্রকৃতির সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়নি? বিরাট একটা গাছের তলায় আমাদের তাঁবু। তারই ডালে বসে শিস দিচ্ছে পাখীটা। যেন প্রভাত বন্দনা করছে আপন মনে। পর্দার ফাঁক

দিয়ে ভোরের আলোর নিশানা দেখতে পাচ্ছি।

সব কিছুরই শেষ আছে। এই বিভীষিকাময়ী রাত্রিরও অবসান হ'ল। দুর্যোগ একেবারে না কমলেও দিনের আলোয় যেন প্রাণ ফিরে এলো। একটু বেলা হতেই ছেলেরা সবাই ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে পড়ল। সবার মুখেই এক জিজ্ঞাসা, অমরনাথ যাওয়া যাবে কিনা?

ফিরে এলে ওদের মুখেই খবর পেলাম, ওধারে রাস্তা আরও খারাপ। কোন যাত্রী যদি এখন ওপরে যেতে চেষ্টা করে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই মিলিটারিরা রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। কেউ নীচে যাবে তারও উপায় নেই। সেদিকেও পথ বন্ধ। আরো শুনলাম, কালকেব দুর্যোগে কোন যাত্রীর জীবনহানি হয়নি তবে ঘোড়া মরেছে বেশ কয়েকটা।

বেলা দশটা নাগাদ বৃষ্টি থেমে গেল। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে আকাশে সূর্যদেব দেখা দিলেন। কিন্তু বাতাসে হাড়কাঁপানো শীত।

অনিশ্চিত অবস্থা। কিছু করারও নেই। ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে বের হ'লাম। চাবিদিক ঘুরে দেখার ইচ্ছে হ'ল।

পাহাড়টা ঢালু হয়ে নদী পর্যন্ত নেমেছে। অসংখ্য তাঁবু নদীর কিনারা পর্যন্ত। পিঁপড়ের মত পিলপিল করে লোকজন নীচে ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারারাত একটুও সাড়াশব্দ পাইনি এদের! আশ্চর্য লাগল আমার।

মিলিটারি ক্যাম্প ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই চোখে পড়ল কিছু লোক জড়ো হয়েছে একটা চাঁদোয়ার নীচে। একজন মোহান্ত গোছের কি যেন বলছেন। লক্ষ্য করে দেখলাম, রুপোর বড় বড় দুটো লাঠি দাঁড় করানো আছে। সেখানে পূজো হয়েছে।

কি বলছেন শোনার জন্য আমিও গেলাম ওখানে। বুঝতে পারলাম এরই নাম 'ছড়ি'। সকলের আগে আগে এই 'ছড়ি' নিয়ে যাত্রা ক'রবেন মোহান্ত।

গল্প আগেই শুরু হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে না পেরে পাশের এক ভদ্র-মহিলাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, মোহান্তজী 'অমরনাথের' নাম কি করে হ'ল তারই গল্প শোনাচ্ছেন।—

মহর্ষি নারদ নাকি একদিন কৈলাসে এসে পার্বতীকে বললেন, 'মা, শিব নিজে অমর, কিন্তু আপনাকে অমর করেননি।'

তাই শুনে পার্বতী শিবকে ধরলেন যে তাঁকে অমর করে দিতে হবে। শিব নানাভাবে গিরিসুতা গৌরীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গৌরী মুখ ভার

করেই থাকলেন। অন্য কিছুতেই তিনি খুশী নন।

তখন শিব বললেন, যেখানে সেখানে তো অমর কাহিনী বলা চলে না। সেরকম নির্জন স্থান চাই। কারণ একথা যে শুনবে সেই অমর হয়ে যাবে। তারপর উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা এই গুহায় এলেন। কথা হ'ল শিব বলে যাবেন আর গৌরী হুঁ দিয়ে যাবেন। তাহলেই শিব বুঝতে পারবেন গৌরী শুনছেন কিনা।

এদিকে এক ধার্মিক রাজা এক মুনির অভিশাপে তোতাপাখী হয়ে ঐ গুহায় বাস করছিলেন। কিছুক্ষণ শোনার পরই গৌরী সমাধিস্থ হলেন। তখন ঐ তোতাপাখী হুঁ হুঁ করে যেতে লাগল। শিব ভাবছেন গৌরীই শুনছেন। কাহিনী শেষ হবার পর শিব চোখ খুলে দেখেন, গৌরী ধ্যানস্থা। গৌরীকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, সব শুনেছেন কিনা। তিনি একটু লজ্জিতভাবে জানালেন যে সব কথা শোনেননি।

শিবের মনে সন্দেহ হল তাহলে নিশ্চয়ই আর কেউ আছে সেখানে যে হুঁ হুঁ করছিল। শিব তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন গুহার ভেতর সেই তোতাপাখীকে। ক্রোধে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করলেন তাকে।

ব্যাসদেবের পত্নী সেই সময় গুহার নীচের নদীতে স্নান সেরে তর্পণ করছিলেন। তোতাপাখী প্রাণের ভয়ে তাঁর কোলে গিয়ে আশ্রয় নিল।

শিব আর কি করেন! সতীর কাছে দেবতাকে পরাজয় মানতে হ'ল। তোতাকে আশীর্বাদ করে ফিরে গেলেন শিব। পরে ঐ তোতাই ব্যাসপুত্র শুকদেব-রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

শিব যেখানে এই অমর কাহিনী বলেছিলেন সেই স্থান মহাতীর্থে পরিণত হ'ল। স্বয়ম্ভূ সেই লিঙ্গের নাম অমরনাথ শিব। গুহা অমরনাথ-গুহা নামে বিখ্যাত। নদীর নাম অমর গঙ্গা।

গল্প শেষ হতেই অমরনাথের যাত্রী এক ভদ্রলোক বললেন, এই গুহা প্রথম আবিষ্কার করে এক মেষপালক। জাতিতে মুসলমান। নাম মালিক মুহম্মদ। পাহাড়ের ওপর মেষ চরাতে চরাতে তার একটি মেষ হারিয়ে গিয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতে মেষপালকটি ওখানে গিয়ে হাজির হয়। গুহার ভিতর বরফের তৈরী ঐ লিঙ্গমূর্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে ফিরে এসে গল্প করে অন্যদের। এইভাবেই মুখে মুখে প্রচার হ'ল সে সংবাদ। এখনও প্রতি বছর 'অমরনাথের' প্রণামীর একটা অংশ তাই ঐ বংশের প্রাপ্য। আর শ্রীনগর থেকে 'ছড়ি' অমরনাথ যাত্রার পথে

আবিষ্কারক 'মালিক মুহম্মদ বংশীয়েরা' যে গ্রামে বাস করে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য থামে।

শুনলাম অমরনাথ গুহায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। মনে হ'ল থাকবে নাই বা কেন? অমরতীর্থের এই দুর্গম আর দুস্তর পথে যারা একমাত্র কাণ্ডারী, যে মুসলমান অশ্বরক্ষী ভাইদের সহায়তায় এই পথ পাড়ি দেয় যাত্রীরা, ওখানে পৌঁছে তাদের পরিশ্রম, তাদের দয়া, তাদের ভালবাসা সব কিছু ভুলে তাদেরই দূরে সরিয়ে রাখবে কোন্ অজুহাতে?

তবে শুনেছি সে এমন এক অপার্থিব স্থান যেখানে কোন মানুষেরই জাতিধর্মের প্রশ্ন আসে না মনে।

যাঁরা এতক্ষণ মোহান্তজীর কাছে অমরনাথের কাহিনী শুনছিলেন তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নানারকম গল্প করছিলেন অমরনাথের পথের। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম তাঁদের কথা। কারোরই নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই এ পথের। তাই বই পড়ে, বা বন্ধু-বান্ধব যাঁরা এসেছেন এর আগে তাঁদের কাছে শোনা গল্প বলে যাচ্ছিলেন। আমি সকলের কথার মধ্যেই একটা মিল দেখছি, সেটা হ'ল সকলেই পথের দুর্গমতার বর্ণনা করছেন, কিন্তু চোখে-মুখে উৎসাহ উদ্দীপনার ছাপ। আমার মনে হ'ল এ পথের যাত্রীদের পুণ্যের লোভ যত, দুর্গম পথের আকর্ষণ কোন অংশে কম নয় তার চেয়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পিপাসুদের চেয়ে অ্যাডভেঞ্চারকামীরাও সংখ্যায় কম নয়। তাই এপথে তরুণ যাত্রীদের সংখ্যাই বেশী।

আমি একপাশে দাঁড়িয়ে আছি। মোহান্তজী একটু প্রসাদ আর পূজোর ফুল এনে দিলেন হাতে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি যে, উনি সবাইকে পূজোর নির্মাল্য আর প্রসাদ বিতরণ করছেন। এবার মনে হ'ল অমরনাথ যদি নাও যাওয়া হয়, প্রসাদ পেলাম তো। প্রসাদটুকুন হাতে নিয়ে কিন্তু তাঁবুতে ফিরতে ইচ্ছে হ'ল না।

তখনও ওপরে যাবার হুকুম মেলেনি। সবাই এদিক ওদিক করছে। আমি একটু এগিয়ে গেলাম, কোন্ পথ দিয়ে শেষনাগ যাওয়া যায় তাই দেখব বলে।

শুনলাম পাশের এই নদীটি শেষনাগ থেকেই বের হয়েছে। নাম 'নীলগঙ্গা'। পথের বাঁক ঘুরে একটু এগোতেই দেখি একজন মিলিটারি বন্দুক হাতে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পথেই কি অমরনাথ যাওয়া যায়? আমার ইচ্ছে

ছিল কিছুটা এগিয়ে যেখান থেকে 'পিস্থর চড়াই' শুরু হয়েছে, নীচে দাঁড়িয়ে সে চড়াইটা অন্ততঃ চোখে দেখে আসব। শুনেছি খুব দূর নয় সেটা এখান থেকে। মনে হ'ল যাওয়া তো হবেই না, রাস্তাটা একটু দেখি।

কিন্তু মিলিটারি লোকটি আমার কথা বুঝল কিনা জানি না। শুধু গম্ভীর হয়ে মাটিতে বন্দুকটা ঠুকে উত্তর দিল,—

ঠ্যার যাও। রাস্তা বন্ধ্ হ্যায়।

আমি আর না এগিয়ে নদীর ধারে একটা উঁচু পাথরের ওপর বসে পড়লাম। মনটা ভালো ছিল না। এতদূর থেকে এসে এভাবে ফিরে যেতে হবে ভাবিনি। বহুক্ষণ বসে ছিলাম ওখানে। সামনেই নদীর জল জমে বরফের একটা সেতু হয়েছে। শুনেছি অনেকে চন্দনবাড়ি পর্যন্ত আসে শুধু এই 'আইস ব্রীজটা' দেখার জন্য। নদীর জল জমে দু'তিন ফুট পুরু হয়ে এই সেতুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তারপরেই স্বচ্ছসলিলা নীলগঙ্গার খরস্রোত দেখা যাচ্ছে। সেখানে একটুকরো বরফও নেই। প্রতিবার শুধু এইটুকু জায়গায় কেন বরফ জমে আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম।

একবার মনে হ'ল এই সেতু পার হয়ে ওপারে গেলে কেমন হয়? কিন্তু একা একা যেতে সাহস হ'ল না। আর তাকিয়ে দেখি সেই মিলিটারি লোকটি তখন থেকেই বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করছে। উঠে পড়লাম ওখান থেকে। পিস্থর চড়াইটা আর দেখা হ'ল না।

গাইড বইতে দেখেছি, এখান থেকে মাইল দেড়েক গেলেই পিস্থর চড়াই শুরু। এপথে এমন চড়াই আর নেই। বড় কঠিন এ চড়াই। অত্যন্ত শ্লিপারি। পিস্থ মানেই নাকি পিচ্ছিল। পা পিছলে পড়ার ভয় সব সময়। যাতায়াতে দুবারই যাত্রীরা ভয় পায় এই চড়াইকে। কারণ এপথে নামাটাও খুব সহজ নয়। চড়াই শেষে সমতলভূমি। নাম 'জোথাপাল' বা 'যশপাল'। অনেকেই এতটা চড়াই-এর পর ওখানে বিশ্রাম নেন। তারপর হাজার ফিট নীচে শেষনাগ লেক।

চারিদিকে বরফের পাহাড়। মাঝখানে বিরাট এই লেক। সব্জে নীল রং-এর স্ফটিক-স্বচ্ছ জল। লেকের ধার দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ গিয়েছে 'বায়ুযান'। এরপর চোদ্দ হাজার ফিট ওপরে 'মহাগুনাস পাস' পার হয়ে পথ নেমেছে 'পঞ্চতরণীতে'। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে 'অমরনাথ গুহায়' যায় যাত্রীরা। দর্শন শেষে আবার তখনই ফিরে আসে। কারণ পঞ্চতরণী

ছোট্ট একটা উপত্যকা। তার চারপাশেই তুষারপর্বত। একবার বৃষ্টিতে বরফের ধস নেমে বহু যাত্রী মারা যায় ওখানে। কিন্তু চন্দনবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা অমরনাথের পথে সবচেয়ে ভালো শুনেছিলাম। আমাদের কপালে ঝড়জলে সেই পথই দুর্গম হয়ে উঠল।

প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়' পড়ে মনে মনে যে ছবি কল্পনায় এঁকেছিলাম, যে অপার্থিব শোভা দেখার আশায় এত কষ্ট জেনেও এপথে এসেছি, তাই দেখার সৌভাগ্য হ'ল না। কি করা যাবে? বিধি বাম। ভাগ্যে না থাকলে কিছুই হয় না।

ভারী মন নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। এখনও সবাই চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই সবাইকে প্রশ্ন করছে, কি হল? এবার কি যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে? আর সময় কই? শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন যে 'ছড়ি' নিয়ে গুহায় যেতেই হবে!

কেউ কোন সদুত্তর দিতে পারছে না। মিলিটারি অফিসারদের জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, ওপরে ওয়্যারলেস নিয়ে লোক গিয়েছে। একটু ভালো ওয়েদার দেখলেই খবর দেবে। তখন রাস্তা ছাড়া হবে। চন্দনবাড়িতে এখন বেশ রোদ উঠেছে। মাথার ওপর সূর্য। কোন্ দিকের বাতাস জানি না আকাশের মেঘগুলোকে ঝেঁটিয়ে সাফ করছে। তবে আরো ওপরের দিকে শেষনাগের পথে প্রকৃতির কি খেলা চলছে কে জানে! এই মেঘগুলো কি সেদিকেই চলেছে?

আজ সকালে রওনা হতে পারলে রাত্রিতে 'শেষনাগে' বিশ্রাম করতাম আমরা। জ্যোৎস্না রাতে শেষনাগ সরোবরের শোভা নাকি অতুলনীয়। শেষনাগের আর একটা আকর্ষণও ছিল আমার কাছে। রাজতরঙ্গিণীতে পড়েছি এই সরোবরের কথা। কবি অবশ্য বলেছেন এর নাম ক্ষীরসর। কিন্তু আমার ধারণা চন্দ্রলেখার পিতা নাগশ্রেষ্ঠ শুশ্রবের নামেই পরে এর নামকরণ হয়েছে শেষনাগ। কোন ঐতিহাসিক স্থান দেখে যে আনন্দ হয় এই সরোবর দেখলে আমি সেই আনন্দ পেতাম সন্দেহ নেই। গাইড বইতে দেখলাম পথে যশপালের কাছে আর একটা সরোবর আছে। সেটাই জামাতৃসর কিনা কে জানে! তার নাম অবশ্য 'সাওনসর' লিখেছে।

আনমনা হয়ে ভাবছিলাম বসে বসে। অমরনাথ আর যাওয়া হবে না সে

প্রায় ঠিক। কারণ একটু আগেই ছেলেদের একটা পরামর্শ সভা হয়ে গেল। তাতে ঠিক হ'ল মেয়েদের নিয়ে আর যাওয়া হবে না। যদি পথ খুলে দেয় তখন মণ্টু, অসিত ঠাকুরপো আর অজিত ঠাকুরপো যাবে। খেলুভাই আর অনিলদা আমাদের নিয়ে পহলগাম ফিরে যাবে। অসিত ঠাকুরপো আর মণ্টুর দুটো ঘোড়া জখম হয়েছে বলে আমাদের দুটো ঘোড়া নিয়ে যাবে ওরা। এখন আর নূতন ঘোড়া যোগাড় করা কঠিন। শোনা থেকেই মনটা আরো খারাপ হয়ে আছে। এতক্ষণ তবু মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল পথ ছেড়ে দিলে যাওয়া হবে হয়ত। মনে পড়ল হরিদ্বারের সেই সন্ন্যাসীর কথা—এইজন্যই হয়ত ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন বুঝিনি।

বেলা একটার পর হঠাৎ যাত্রীরা সবাই আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। রাস্তা খুলে দিয়েছে। ওপরে যাবার অনুমতি মিলেছে।

মিলিটারি ক্যাম্প থেকে লাউডস্পীকারে জানিয়ে দিল যাত্রীরা এবার ওপরের দিকে যেতে পারে। দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভোজবাজীর মত ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। অত তাঁবু, লোকজন, ঘোড়া, সহিস কিছু নেই। ওপরের দিকেই বেশীর ভাগ চলে গেল। তবে কিছু কিছু নিচের দিকেও নামছে। আমাদের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে দেখছিলাম, এ যেন একটা মেলা ভাঙ্গার দৃশ্য। এত লোক, এত ঘোড়া ছিল এখানে? আশ্চর্য! কিছু আগে থেকেই সবাই আন্দাজ করছিল হয়ত এই সময় পথ ছেড়ে দেবে। তাই মোটঘাট বেঁধে তৈরীই ছিল সব। হুকুম পাওয়া মাত্র একটা স্তব্ধ জনস্রোত যেন হঠাৎ সচল হয়ে ওপরের দিকে মোড় ঘুরল।

অসিত ঠাকুরপোরাও তিনজনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এমনি অনেক দেরি হয়ে গেছে। সন্ধ্যের আগে পিস্সুঘাটি পার না হ'তে পারলে চলবে না। ওদের যাবার আগে যা কিছু পথে দরকার হ'তে পারে সব গুছিয়ে দিলাম। মনে হ'ল ওদের যেন কোন কষ্ট না হয়।

অনিলদা আর খেলুভাই থেকে গেল আমাদের নিয়ে। আমাদেরও বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। তাঁবু খোলা হয়ে গিয়েছে। আমার বিছানা গুটনোর সময় দেখতে পেলাম কাল একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর শুয়েছিলাম। পিঠের নীচে কি একটা ঠেলা দিচ্ছিল উঁচু হয়ে। আমি ভেবেছিলাম হয়ত পাথরের চাঁই হবে। কালকের অত বৃষ্টিতেও বিছানাটা ভেজেনি এইজন্যই। বিছানার নীচের চাটাই

তুলতে গিয়ে যা চোখে পড়ল তা আর না বলাই ভালো। কাশ্মীর সরকার এই তীর্থযাত্রার সময় বহু অর্থ পান তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে। তাদের জন্য আরো একটু সুব্যবস্থা আশা করা অন্যায় নয়। পহলগাম বা এখানে যাত্রীদের জন্য স্যানিটেশানের কোন ব্যবস্থাই নেই। গাড়োয়ল কর্তৃপক্ষ কিন্তু এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করেছেন। পথ দীর্ঘ সেখানে। কেদারবদ্রীর পথে তবু কোন কষ্ট হয় না যাত্রীদের।

ভাঙ্গা হাটে আর ভালো লাগছিল না। মনটা বিষাদে ভরে ছিল। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নীলগঙ্গার তীরে যাচ্ছিলাম। ইচ্ছে জলটা একটু ছুঁয়ে আসব। আর কোনদিন হয়ত আসব না এখানে। তাই এখানকার মাটি, এখানকার জল সব কিছুর স্পর্শ নিয়ে যেতে চাই।

একজন মিলিটারি অফিসার ঘোড়ার পিঠে ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের রওনা হতে সাহায্য করছিলেন, এগিয়ে এসে বললেন, ওপরে যাবে না মা ?

আমাকে মনমরা দেখে উৎসাহ দিয়ে বললেন, ওপরে চলে যাও। দেরি করো না। রাস্তা ভালো আছে এখন। আরো মন খারাপ হয়ে গেল। ফিরে এসে খেলুভাইকে বললাম, চলো আমরাও নীচে না নেমে ওদের সাথে ওপরেই চলে যাই।

খেলুভাই রাজী হ'ল না। বলল, দুটো ঘোড়া কম। যদি হাঁটতে না পারো তখন কি হবে ? একবার যখন বাধা পড়েছে, আর গিয়ে কাজ নেই। থাক্।

অনিলদারও শেষ পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কেউই জোর করে বলতে পারল না। যদি কোন বিপদ হয় কে ঝুঁকি নেবে ! অগত্যা ফিরতেই হ'ল।

দুটো ঘোড়া কম। কাজেই দুজনকে হাঁটতেই হবে। আমার মনে হ'ল ঘোড়ার জন্যই যখন যাওয়া হ'ল না অমরনাথ, দেখা যাক হাঁটতে পারি কিনা। তাই জানালাম আমি হেঁটেই ফিরব। ওরা অবশ্য আপত্তি করেছিল কিন্তু যখন বললাম, যদি কষ্ট হয়, না পারি হাঁটতে, পথে অপেক্ষা ক'রব। ওদের কারো ঘোড়া নেব সে সময়, তখন ওরা রাজী হ'ল আমার কথায়। নীলিমাও আমার সাথে হেঁটেই চলল। আমরা কিছু আগেই রওনা হ'লাম। ওরা পরে ঘোড়া নিয়ে আসবে।

ছোট্ট একটা ব্রীজ পার হলেই পহলগামের রাস্তা। এখন বেশীর ভাগ পথ নেমে চলা। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, শুকনো খটখটে রাস্তা। কালকের জল-কাদার কোন চিহ্ন নেই এখন। ক'ঘণ্টা আর রোদ পেয়েছে, এর মধ্যেই এত শুকোলো কি করে ? কাল দেখেছি যাঁরা পায়ে হেঁটে আসছিলেন, তাঁদের পা

আটকে যাচ্ছে এঁটেল কাদায়। কোন রকমে পা টেনে তুলতে হচ্ছিল।

নামার সময় এমনি একটু দ্রুত হয় গতি। তার উপর আমরা পাকদণ্ডী দিয়ে নামছিলাম, তাই পথ আরো সংক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এমনি নামতে গেলে যে পথ অনেক ঘুরে জেড্-এর মত হয়ে থাকে থাকে নেমেছে, পাহাড়ীদের সর্টকাট রাস্তা দিয়ে নামলে অনেক তাড়াতাড়ি হয় সেটা। অবশ্য একটু সাবধান হ'তে হয় এপথে। পাথরের নুড়িতে বড় পা হড়কায়। কিন্তু ওদের ঘোড়ার আগে আমরা পহলগাম পৌছাব বলেই করছিলাম এটা।

মনটা বেশ ভারী। এতদূর এত কষ্ট করে এসেও দর্শন হ'ল না। ফিরে যেতে হচ্ছে। নানা চিন্তায় মন ভরে আছে। তবু পথের দৃশ্য বারে বারে মন কাড়ছে। দুচোখ ভরে দেখছি সেই অপূর্ব ছবি। কালকের দুর্যোগের কোন চিহ্ন নেই এখন। কে বলবে কাল এই সময় এই পথেই এত জলকাদা ছিল! প্রতি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা ছিল, এ সেই পথ!

বর্ষণের পর এখন মাথার ওপর নির্মল ঘন নীল আকাশ। আর নীচের উপত্যকায় স্নিগ্ধ সবুজের সমারোহ। নীলগঙ্গাও চলেছে সাথে সাথে। দেখা যাচ্ছে বহু নীচের সবুজ উপত্যকায় রূপুলী জলের ধারা এঁকেবেঁকে চলেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে নীচে নামছি আমরা। আর কখনও কি আসব এ পথে? দু চোখ ভরে দেখে নিচ্ছি তাই।

খেয়াল নেই সামনে পেছনে। আপন মনে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ পেছন থেকে একটা ধাক্কা খেলাম। চম্‌কে উঠলাম, কি হ'ল? সঙ্গে সঙ্গেই একজন ঘোড়ার সহিসের সাবধান বাণী কানে গেল,—হো-ও-ওশ!

অর্থাৎ হুঁশ করে পথ চলো। না হলে ধাক্কা খেতে হবে আরো।

আমার হুঁশ ফিরে এলো ঠিকই। কিন্তু ভাবলাম একটু আগে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করা উচিত ছিল ওর। তাহলে আর ঘোড়ার ধাক্কা খেতে হ'ত না আমাকে। চমকে যদি পড়ে যেতাম কি কাণ্ডই হ'ত তাহলে? লক্ষ্য করে দেখলাম, সহিসটি ক্রমাগত হো-ও-ওশ, হো-ও-ওশ শব্দ করতে করতে চলেছে। সামনের যাত্রী শুনছে কি শুনছে না সে খেয়াল নেই।

ওর ঘোড়া কিন্তু ওর চেয়ে হুঁশিয়ার। নিজে খাদের দিকে না গিয়ে সামনের লোকটিকে পেছন থেকে মাথা দিয়ে আস্তে একটু ঠেলা দিয়ে পথ করে নিচ্ছে। অনেকেই আমার মত চম্‌কে পেছন ফিরে দেখে নিয়ে সরে গিয়ে পথ দিচ্ছে। এবার ভারী মজা লাগছিল দেখতে। আমি অবশ্য এখন হুঁশিয়ার হয়েই পথ

চলছি। কারণ এপথে ঐ একটিই ঘোড়া তা তো নয়। সামনে পেছনে এমন বুদ্ধিমান জীব আরো চলেছে। কারো পিঠে সোয়ারী, কেউ মাল নিয়ে।

এখন দেখছি আমাদের মত আরো বহু লোকই নীচের দিকের যাত্রী। ওদের দেখেও কিছু সান্ত্বনা পাচ্ছি মনে।

সহিসরা সবাই কাশ্মীরী মুসলমান। ওদের কথা ঠিক বুঝি না। আন্দাজে দু-চারটে কথা ধরছি। এ দুদিনে কিছু কিছু কথার আদান-প্রদান করতেই হচ্ছে। কিছু কিছু হিন্দী কথা ওরা বুঝতে পারে দেখলাম। প্রতি বছরই সারা ভারত থেকে কয়েক সহস্র যাত্রী সমাগম হয় এখানে। কাজ চালানোর মত সামান্য কিছু কথা ওরা শিখেছে এইভাবেই। 'হোশ' শব্দটা বারে বারে কানে আসাতে মনে মনে শব্দটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া শুরু করলাম অন্যমনে। এটা কি কাশ্মীরী শব্দ না হিন্দী? বাংলা ভাষাতেও তো হুঁশ শব্দ আছে। অর্থ তো একই। তবে কি বাংলা শব্দই ওদের ভাষায় এসেছে!

শুনতে পাই বহু সংস্কৃত শব্দ হিন্দী এবং বাংলা ভাষায় এসেছে নানা পরিবর্তিত আকারে। কাশ্মীরী ভাষাতেও তেমনি এসেছে হয়ত। তাই যদি হয় তবে আসল সংস্কৃত শব্দের রূপটি কি? কিংবা আরবী বা ফারসী ভাষা থেকে এসেছে শব্দটা?

আবার হয়ত একটু বেহুঁশ হয়েছিলাম ভাষাতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে পড়ে। পেছনের হো-ও-ওশ শব্দে হুঁশ ফিরে এলো। ভাবলাম থাকগে ও নিয়ে আর ভেবে কাজ নেই। ও কাজ যখন আমার নয়। ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিবাবুরাই তো আছেন এ নিয়ে ভাবার জন্য।

আমার পেছনে পেছনেই আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক এবং দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আসছিলেন। খেয়াল করে দেখিনি এতক্ষণ। আমার প্রায় পাশ থেকেই বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা, দেখেছেন ব্যাটাদের আক্কেলের বহর? ধাক্কা দেবার পর ওঁর হুঁশ হচ্ছে সাবধান করার কথা!

তাকিয়ে দেখি উনি নিজে আমার মতই হেঁটে চলেছেন। ওঁর দুটি ছেলেমেয়ে দুটি ঘোড়ার পিঠে। ফুটফুটে ফর্সা ছেলেমেয়ে দুটি। ছেলেটি বড়। হয়ত সাত কি আট বছর বয়স হবে। মেয়েটি বছর পাঁচেকের। বেশ খুশী মনেই পাশাপাশি দুটি ঘোড়ার পিঠে বক বক করতে করতে চলেছে। দুজন সহিস দুজনের ঘোড়ার সাথে সাথে চলেছে দড়ি ধ'রে।

আমি হেসে বৌটির কথার উত্তর দিলাম,—সহিসের আক্কেল না থাক ঘোড়াটি বেশ বুদ্ধিমান লক্ষ্য করেছেন?

দুজনেই হেসে উঠলাম এবার।

সাথী পেয়ে ভালই হ'ল। আমরা গল্প করতে করতে নীচে নামছি। বাচ্চা দুটোর কথা কানে এলো। মেয়েটি তার দাদাকে বলছে ঃ

আমরা আকাশে উঠে গেছি না রে দাদা ?

বোধ হয় নীচের উপত্যকার দিকে চোখ পড়ায় ওর মনে হয়েছে এ কথা। সেখান থেকে এত উঁচুতে উঠেছে যখন, তখন আকাশের সমান উঁচু তো ভাবতেই পারে। কথা শুনে ভারী মজা লাগল তাই তাকালাম ওদের দিকে। দাদাটি দেখলাম বোনটির কথা শুনে মাথার ওপর আকাশটা দেখে নিয়ে বিজ্ঞের মত বলল, আরো অনেক উঁচুতে উঠতে হবে ঐ পাহাড়টার মাথায় !

ওদের কথা শুনে কিন্তু আর একটা ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। মনে পড়ল বদ্রীনাথের পথে এক বৃদ্ধাও বলেছিলেন ঠিক এই ধরনের কথা,—জমিন্‌কা আদমী আসমান পর আগিয়া। সে-পথে পাণ্ডাজীর সাথে গল্প করতে করতে আমি হেঁটে চলেছি। হঠাৎ একটা বাঁকের মাথায় থমকে দাঁড়াতে হ'ল। এতক্ষণ পাহাড়ের যে চেহারা দেখেছি তার সাথে কোন মিল নেই। যেন কালো দৈত্যের মত এক পাহাড় সামনের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে। শুনলাম এটা শ্লেটের পাহাড়। আমার কিন্তু মনে হ'ল মিশমিশে কালো গুঁড়ো কয়লা দিয়ে যেন পাহাড়টা তৈরী। কিন্তু ওপরদিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে বড় বড় পাথরের চাঁই ঝুলে আছে ওপর থেকে। গুঁড়ো পাথরের সাথে যে কোন সময় সরসর করে গড়িয়ে নীচে নেমে আসবে। কুলিরা সব সময় কাজ করছে কোন রকমে যাত্রীদের পথ করে দিয়ে এটুকু পার করার জন্য। নীচে আবার নদী। একটু এদিক ওদিক হলেই গড়িয়ে নীচের সেই পাতাল গঙ্গায় গিয়ে পড়তে হবে।

আমাদের আগেই একটি অবাঙ্গালী বৃদ্ধা সেই ভীষণ পথের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ভীতিবিহ্বল মুখচ্ছবি এখনও আমি ভুলিনি। পাণ্ডাজী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডর লাগ্‌তা কেয়া মাইজী ?

বৃদ্ধা উত্তর দিয়েছিলেন, বাবা জমিনকা আদমী আসমান পর আগিয়া। বহোত্‌ ডর লাগ্‌তা।

ডর আমারও লেগেছিল যখন পাণ্ডাজী নিজেই বলেছিলেন, মেরা জানামে হাজারো আদমী খতম হো গিয়া হিঁয়ে পর।

ওপথে পা বাড়াতে আমারও পা দুটো কেঁপে উঠেছিল মনে পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই পাহাড়টাকে পেরিয়ে গিয়ে পাতাল গঙ্গার সেতুর ওপারেই আবার মাটির পাহাড়। সে-পথ যেন পাড়াগাঁয়ের কাঁচা রাস্তা। একহাঁটু ধুলো।

পাণ্ডাজী হাত ধরে ঐ বৃদ্ধাকে পার করে দিয়েছিলেন ঐ পথটুকু। পরে গল্প করেছিলেন, এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক নাকি কয়েক বছর আগেই সপরিবারে মারা গেছেন এখানে ওপর থেকে ধস নেমে। আমিও ভয়ে ভয়ে ওপরকার সেই ঝুলন্ত পাথরের বড় বড় চাঁই দেখছিলাম পার হবার সময়। কখন ওপর থেকে নেমে আসে মাথার ওপর কে জানে! খুব অল্প নয় এপথ। ভয়ের জন্য আরো একটু দীর্ঘ মনে হয়েছিল হয়ত। শ্লেটের পাহাড় আগেও দেখেছিলাম এই পথেই। পিপলকোঠি থেকে কিছুদূর গেলেই মোড়ের মাথায় সেই পাহাড়গুলো। যেন থাক থাক শ্লেটপাথর সাজিয়ে রেখেছে কেউ। একটু চাপ দিলেই মুড়মুড় করে ভেঙ্গে যায়। তার চেহারা এমন ভয়াল নয়। সে যেন খাঁজে খাঁজে নক্সা করে মন্দিরের মত ওপরে উঠেছে।

যেন কোন প্রাচীন মন্দিরের কার্নিশ দিয়ে যাচ্ছি এমনি মনে হয়েছিল আমার। মনে পড়ল কত বৈচিত্র্যই চোখে পড়ে পাহাড়ী পথে। বদ্রীর পথে যেমন শ্লেটের পাহাড় দেখেছি তেমনি আবার চুনা পাহাড় দেখে মজা লেগেছিল আমার। রুমালে বেঁধে কিছুটা ঐ পাথরের গুঁড়ো নিয়ে এসেছিলাম ফেরার সময়। কত রঙীন পাথরের টুকরো কুড়িয়েছি সেবার। আর একটা মজার ব্যাপার দেখছি, যত ভয় পেয়েছিলাম যত কষ্ট হয়েছিল তখন, ভেবেছিলাম কোন রকমে একবার সমতলে নামতে পারলে আর কখনও পাহাড়ে যাব না। কিন্তু এখনও সে পথের ছবি ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে আর দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করি সেপথে আবার ফিরে যাবার। সুযোগ পেলে হয়ত আবার যাব অমনি ক'রে।

মনে হ'ল 'অমরনাথও' হয়ত আবার টানবেন আমাকে।

॥ ১৯ ॥

আপনারা কি শ্রীনগর ফিরে যাবেন ?

বৌটির প্রশ্নে চমক ভাঙল আমার। বললাম, না, আমরা পহলগাম থাকব কদিন। আমাদের ভেতর কয়েকজন অমরনাথ গিয়েছে। তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করব আমরা।

বৌটি জানালো, ওরা আগামীকালই শ্রীনগর ফিরবে। সেখানে এক বন্ধুর ওখানে দু-চার দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে। বললো, ছেলেমেয়ে দুটো সঙ্গে না থাকলে হয়ত অমরনাথ চলে যেতাম। কিন্তু এদের সঙ্গে নিয়ে যাবার আর সাহস হ'ল না কালকের দুর্যোগের পর।

বললাম, এপথে ওদের না আনলেই ভালো করতে।

মেয়েটি খুশী হয়ে বলে উঠলো, বয়েসে আমি আপনার চেয়ে ছোট, আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন। আমার নাম বেলা।

আমি বললাম, সেই ভালো। তোমাকে আপনি বলে কথা বলতে আমারও ভাল লাগছিল না।

মেয়েটির অসংকোচ ব্যবহার আমার বেশ ভালো লাগলো। বয়েসে মনে হয় আমার ছোট জা নীলিমার বয়েসী। এতক্ষণ ওরা দুজনেই গল্প করছিল। ওরা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। বাপের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ির সব খবর দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে। আমাদের খবরও জেনেছে। কোন আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে না পেলেও, কিন্তু আত্মীয়ের মতই আমাকে আমন্ত্রণ জানালো, কলকাতায় ফিরে যেন অবশ্যই ওদের বাড়িতে যাই। ছেলেমেয়েদের মাসীমা বলে ডাকতে শিখিয়েছে। নিজেও আমাকে দিদি বলে ডাকছে দেখলাম।

স্বামীকে ডেকে বলল, কলকাতায় কিন্তু দিদির ওখানে নিয়ে যাবে আমাকে। দিদিকেও আমরা নিয়ে যাব আমাদের বাসায়।

হেসে জানালাম, নিশ্চয়ই যাব। ওদেরও আমন্ত্রণ জানালাম আমার ওখানে যাবার।

মনে মনে ভাবছিলাম, কত সহজেই আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। এ বোধ হয় আমাদের দেশেরই বৈশিষ্ট্য। আর ঋষিরা যে বলে গেছেন, সাত পা একসঙ্গে হাঁটলেই বন্ধুত্ব হয়! আমরা তো এতটা পথ একসঙ্গে হেঁটে চলেছি। বন্ধুত্ব হবে

নাই বা কেন ? এমনি উদার প্রাকৃতিক পরিবেশেই মানুষ সহজ হয়ে মিশতে পারে অপরের সঙ্গে। ঘরের সংকীর্ণ গণ্ডী যেন মনটাকেও ছোট করে দেয়। সেখানে চার দেয়ালের মাঝে বসে কি এত সহজে মিশতে পারতাম ওদের সঙ্গে ? না বেলা-ই আমাকে এমন অসংকোচে আপন করে দিদি বলে ডাকতে পারত ?

কলকাতা ফিরে আর দেখা হবে কিনা বেলার সঙ্গে জানি না। কিন্তু মনে থাকবে ওর এই মধুর অন্তরঙ্গ ব্যবহারটুকু।

মনে পড়ল আর একটি মেয়েকে। আমার মনের পটে উজ্জ্বল হয়ে আঁকা আছে তার ছবি।

যাচ্ছি 'বদ্রী'র পথে। হাঁটা-পথ। সকাল সন্ধ্যায় রোজ বারো-চোদ্দ মাইল করে হাঁটছি আমরা। ভোররাতে উঠে যখন হাত-মুখ ধুয়ে রওনা হই পরের চটির উদ্দেশে, তখনও আকাশে তারা জ্বলে। ভালো করে আলো ফোটে না। অবশ্য এই সময়ই হাঁটতে ভালো লাগে। তারপর যত বেলা বাড়ে, তত কষ্ট হয়।

সেদিনও ভোর থেকে হাঁটছি। তখন দুপুর। মাথার ওপর প্রখর সূর্য। বদ্রীর পথ কাশ্মীরের মত এমন ছায়া-নিবিড় নয়। এমন মৃন্ময় পাহাড়ও নেই সেপথে। সেদিন যেখানে পৌঁছেছি সেখানে চারিদিকে শুধু লালচে হলুদ রং-এর রুক্ষ গ্রানাইট পাথরের পাহাড়। কোনখানে সবুজের চিহ্ন নেই। পাথরের ফাটলে সামান্য মৃত্তিকার সন্ধান পেয়ে হয়ত কখনও দু-এক গুচ্ছ তৃণ চোখ মেলে-ছিল কোনদিন। কিন্তু শুষ্ক পাষাণের বুকে একবিন্দু মমতা ছিল না তাদের জন্য। প্রাণরসের অভাবে বুঝি তৃণদল অকালে শুকিয়ে খড় হয়ে গেছে। বিবর্ণ হয়ে লেগে আছে পর্বতের গায়ে। আরো ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে দৈত্যাকার পাহাড়গুলোকে।

সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে। আমি পেছিয়ে পড়েছি। পাহাড়ী পথে অবশ্য কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে না। কোন্ চটিতে দুপুরে বিশ্রাম নেওয়া হবে জানাই থাকে। যে যতক্ষণে পারে গিয়ে পৌঁছায় সেখানে।

পাহাড়ী পথে কখনও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তে নেই। তাহলে আর ওঠা যায় না। জানি সবই। কিন্তু সেদিন আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে আর দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়েছি পথের পাশে পাথরে হেলান দিয়ে।

যাত্রীরা যেতে যেতে আমাকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে, থোড়ী দূর আউর। চটি মিল্ যায়েগা। ঘাবড়াও মাত।

কিন্তু আমার তখন কণ্ঠ তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এত অবসাদ বোধ হচ্ছে—আর যে উঠে দাঁড়াতে পারব বা পৌঁছাতে পারব পরের চটিতে সে

ভরসা হচ্ছে না।

একটি বছর-কুড়ির মেয়ে যেতে যেতে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। শাড়ী পরার ধরন দেখে মনে হ'ল দক্ষিণী মেয়ে। একটুকরো তালমিছরি গুঁজে দিল আমার হাতে। যে ভাষায় কথা বলল তার একবর্ণও আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু নিঃসংকোচে হাত পেতে নিলাম সেটা। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। শুধু তাকিয়েছিলাম মেয়েটির মুখের দিকে। মেয়েটি বেশীক্ষণ দাঁড়ালো না। ওর স্বামী হয়ত আগিয়ে গেছে। হাতের ইশারায় আমাকে ভরসা দিয়ে গেল, আবার দেখা হবে। মুখের ভাষা না বুঝলেও চোখের ভাষা পড়তে আমার ভুল হয়নি। নামটাও জানা হয়নি। কিন্তু মেয়েটির সেই মিষ্টি-মধুর হাসিটুকু আর স্নিগ্ধ করুণা-মাখানো চোখের দৃষ্টি আজও ভুলিনি। যেন আমাকে আশ্বাস দিয়ে গেল, ভয় কি! এখনই সুস্থ হয়ে আবার পথ চলবে তুমি।

সুস্থ হয়ে যখন আবার পরের চটিতে পৌছলাম, তখন আর খুঁজে পাইনি মেয়েটিকে। আর কখনই দেখা হয়নি তার সঙ্গে। কিন্তু আজও ভুলিনি মমতা-ময়ী সেই দক্ষিণী মেয়েটিকে।

আবার পাকদণ্ডীর পথ ধরেছি।

বেলাদের ছাড়িয়ে আমরা অনেকটা এগিয়ে চলেছি। বেলা পড়ে গেছে। বড় ক্লান্ত লাগছে এখন। মনে হচ্ছে পহলগাম আর কত দূর?

হাতের লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছি। আশেপাশে কোন লোকালয় চোখে পড়েনি এ পর্যন্ত। পথ এখানে বনের ভিতর দিয়ে। মাথার ওপর বড় বড় গাছের জটলা। মনে হচ্ছে দিনের আলো নিভে এলো বুঝিবা। সন্ধ্যা নামতে আর দেরি নেই। এতক্ষণে মনে পড়ল আমার সঙ্গীদের কথা। মনে হ'ল ওদের সঙ্গে সঙ্গে এলেই ভালো করতাম। পা-দুটো এত ভারী লাগছে, আর বুঝি হাঁটতে পারব না! নির্জন পথে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়াল নেই। হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কানে। শব্দ অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, পাশের পাহাড় থেকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একপাল ভেড়া নেমে আসছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একজন বৃদ্ধ মেষপালক নেমে আসছে। মুখে শব্দ করছে, তুরু তুরু তুরু। বোধ হ'ল রাত্রি আসন্ন দেখে ভেড়াগুলোকে তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরছে। দূর থেকে দেখতে পেয়েই হয়ত বৃদ্ধ লোকটি নেমে এলো ঠিক আমার সামনেই। আমাকে ওভাবে দাঁড়াতে দেখে বোধ হয় অনুমান করল আমি

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর চলতে পারছি না। তাই আমাকে পরম স্নেহে আশ্বাস দিল, থোড়ী দূর। পহলগাম নজ্‌দিগ্‌ মিল জায়েগা।

সাহস ফিরে এলো। আর বেশী দূর নয় পহলগাম। যেভাবে পারি এটুকু পথ যেতে পারবই। কোনক্রমে পা টেনে টেনে আবার চলতে শুরু করলাম। বনপথটুকু আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এগিয়ে দিল সেই বৃদ্ধ মেষপালক। মনে হ'ল বদ্রীর পথেও পথের বাঁকে বাঁকে এমনি কত মানুষেরই দেখা পেয়েছি। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে যখন নিঃশ্বাস আটকে এসেছে, দম ফুরিয়ে গেছে, মনে হয়েছে আর বুঝি বদ্রী পর্যন্ত যেতে পারব না, হতাশ হয়ে বসে পড়েছি পথের ওপর, তখন কেউ হয়ত বদ্রীনারায়ণের দর্শন-শেষে ফিরে চলেছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেছে, থোড়ী দূর আউর। আভি উৎরাই মিলেগি। কিংবা নিকটেই চটি এমন আশ্বাস দিয়ে গেছে কেউ।

এইটুকুনেই বুকে বল ফিরে এসেছে। কেউ কাউকে চিনি না, জানি না। জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই। আপনা থেকেই বলে যায় এ খবর। মনে আছে সকলকেই। এই বৃদ্ধ মেষপালকের স্মৃতিও মুছে যাবে না আমার মন থেকে।

হিমালয়ের বুকের ভেতর না গেলে মানুষের প্রতি মানুষের এই মমত্ববোধ আর কোথাও চোখে পড়ে না। বদ্রীর যে দুর্গম পথ অতিক্রম করা এত কষ্টসাধ্য, সে পথেও দেখেছি একটি অন্ধ মেয়েকে পরম যত্নে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে তার একজন সঙ্গী।

পথের বাঁকে বাঁকে এমনি কত মানুষেরই সাক্ষাৎ পেয়েছি। আর দেখেছি প্রকৃতির খেয়াল-খুশীর অপূর্ব খেলা। বাঁকে বাঁকে হিমালয়ের বিচিত্র রূপ। কখনও শ্যামল সুন্দর, বনরাজিশোভিত নয়ন-ভোলানো রূপ। পাইন বনের ভেতর দিয়ে ছায়াঘন পথ। বৃক্ষরাজি মধুর বিজনে তীর্থযাত্রীদের পথের শ্রান্তি দূর করে। মনে এনে দেয় অপার শান্তি। কোন বাঁকে হয়ত গৈরিকবর্ণের গিরিশ্রেণী গৃহীর মনেও সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য এনে দেয়। কোথাও দৈত্যাকার পর্বতশ্রেণী ভীষণ ভয়াল রূপে যাত্রীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে।

আবার রজত-শুভ্র তুষারমৌলির প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর মূর্তির সামনে দাঁড়ালে আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে আসে। গঙ্গা অলকানন্দার কলতানে মনের মাঝে ঝঙ্কৃত হয় যোগীরাজ গৌরীশংকরের ধ্যানরূপ—ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং…।

মনে হল যুগে যুগে কত সাধু, কত সন্ন্যাসী, কত গৃহী, কত বিবাগী হিমালয়ের ডাক শুনে ছুটে এসেছে তার বুকে কে তার খোঁজ রাখে! এমন পরম নিভৃত আশ্রয় হিমালয় ছাড়া কে দিতে পারে মানুষকে? ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণ প্রান্ত কেরালার কালাডি গ্রাম থেকে বালক শংকরাচার্য তাঁর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার জন্য ছুটে এসেছিলেন বদরীধামে। সেখানে বসেই তো তাঁর মায়াবাদ প্রচার কপলেন,—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ...... ।

অমরনাথের পার্বত্য-পথে বার বার বদ্রীর স্মৃতি জেগে উঠছে মনে। হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থপথের প্রাকৃতিক রূপ হয়ত আলাদা, কিন্তু তবু যেন কোথায় মিল আছে। ভারতের সব প্রান্ত থেকে একই টানে মানুষ এসে মিলেছে এপথে। জনস্রোতে মিশে গেছে সর্ব জাতি, সব প্রদেশবাসী। সকলেই এক পথের পথিক। এপথে অন্ত্যজ বলে কেউ কাউকে ঘৃণা করে না। ধনী দরিদ্রকে দেখে মুখ ফেরায় না। এ দুর্গম পথে হিন্দু তীর্থযাত্রীর পথপ্রদর্শক হয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় মুসলমান ভাইরা। এই দুস্তর ভয়ঙ্কর পথে তারাই ভয়ত্রাতা।

হিন্দু সাধু-সন্তরা অমরনাথের ছড়ি নিয়ে মুসলমান গ্রামে যাত্রাভঙ্গ করে অপেক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। হিমালয় ভারতের শিয়রে দাঁড়িয়ে এমনি করেই চিরকাল সব প্রান্তের লোককে একই টানে বুকে টেনেছে। একই সূত্রে গেঁথেছে তাদের মন।

ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি। টের পাইনি কি করে পার হয়ে এলাম বাকী পথটুকু। লীডারের সেতুর ওপর উঠে হুঁশ হ'ল, যখন তাকিয়ে দেখি সামনেই আলো-ঝলমলে দৃশ্য। পহলগাম দেখা যাচ্ছে।

দূর থেকে পহলগামকে বড় সুন্দর লাগছিল দেখতে। পাহাড়ের বুকে যেন থরে থরে আলোর মালা দুলছে। দীপান্বিতার উৎসবে সেজেছে যেন পহলগাম।

ধীরে ধীরে পরিচিত পরিবেশের মাঝে ফিরে এলাম। কেমন একটা আনন্দের অনুভূতি এলো মনে। চারিদিকে ঘরবাড়ি, দোকানপাট, সুবেশ লোকজন,

তাদের কথাবার্তা, আনন্দ-কোলাহল সব কিছুই ভালো লাগছে যেন। সবার গতিভঙ্গি স্বচ্ছন্দ সাবলীল, কেউ খুঁড়িয়ে হাঁটছে না, পথ চলতে কেউ ধুঁকছে না। কারো মুখে নেই শ্রান্তি বা ক্লান্তির ছাপ। নেই কোথাও অসহায় ভয়ার্ত মুখের ছবি। ওদের দিকে চেয়ে নিজেকেও তাজা লাগছে এখন। রাজপথের এক পাশে দাঁড়িয়ে খুশীমনে উপভোগ করছিলাম এ প্রাণ-চঞ্চলতা।

কোনো হোটেলে বুঝি গানের মিষ্টি সুর বাজছে একটা। সে সুর পাহাড়-ঘেরা এই ছোট্ট উপত্যকার বাইরে ভেসে যেতে না পেরে ঘুরে ফিরে যেন বার বার আমার মনে এসে আনন্দের দোলা দিচ্ছে। আকাশ, বাতাস, নদী, পাহাড়, উপত্যকা সর্বত্র যেন এই মিষ্টি সুরের ছোঁয়ায় আনন্দের ঢেউ জেগেছে।

দেখতে পাচ্ছি আনন্দময়ী লীডারকে।

হিমালয়ের পথে প্রকৃতির রূপ দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছি, আবার হিমালয়ের বুকে মনুষ্যসৃষ্ট এই নগর, এই প্রাণচঞ্চল নরনারী—এদের দেখেও তো ভালো লাগছে এখন। মনে হ'ল, বৈচিত্র্যই আনন্দ।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। যারা ঘোড়ায় আসছে তারা না ফেরা পর্যন্ত কোথায় থাকব আমরা জানি না। তাই বড় রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক মনে হ'ল। এখানে দাঁড়ালে আমরা না দেখতে পেলেও ওরা আমাদের দেখে নেবে ঠিক। ওরা আগে এসে গেছে কিনা তাও জানি না। তবু অমরনাথ থেকে ফেরার পথের দিকেই তাকিয়েছিলাম।

একটু পরেই দেখলাম ওদের ঘোড়া সার বেঁধে এগিয়ে আসছে। ঘোড়ায় এলেও ওদের সকলের মুখেই ক্লান্তির ছাপ। উস্কোখুস্কো চেহারা।

খেলুভাইএর ঘোড়াটা পাশে এসে দাঁড়াতেই বলে উঠলাম, দেখলে তো, তোমাদের আগেই পৌঁছে গেছি আমরা। পায়ে হেঁটে অমরনাথও যেতে পারতাম ঠিক। অকারণ ভয় পেলে তুমি।

খেলুভাই কোন কথা না বলে একটু হাসল শুধু। বোধ হয় ভাবল, নেমে আসা আর চড়াই ভাঙা এক নয়। আর ওপরে যাবার পথ যে আরো দুর্গম সে কথা আমার জানা নেই হয়ত।

ঘোড়া থেকে নেমে সবাই চায়ের খোঁজে ঢুকে পড়ল একটা রেস্টুরেণ্টে। সকলেরই একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। ওখানে বসেই ঠিক হ'ল, দুদিনে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন হয়েছে, এবার একটু আরামের ব্যবস্থা হোক। তবে হোটেলে থাকা

নয়। যাবার আগেই আমরা জেনে গিয়েছিলাম এখানে বড় বড় তাঁবু ভাড়া পাওয়া যায়। তারই একটা যদি পাওয়া যায় সেটাই সব চেয়ে ভালো হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল এবার আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন। একটু নীচেই অমনি একটা তাঁবু খালি আছে। যারা ছিল তারা আজই চলে গেছে।

খেলুভাই আমাদের যত রকমে আরামে থাকার ব্যবস্থা হয় তার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। ওর উৎসাহ দেখে মনে হ'ল, অমরনাথ যেতে না পারার দুঃখ ও নিজেও ভুলতে চায়, আমাদের মন থেকেও মুছে দিতে চায় সে দুঃখ। কোত্থেকে একটা বছর বারো-তেরোর বাচ্ছা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। বলল, এ থাকবে আমাদের সঙ্গে। তোমাদের কাজকর্মের সুবিধে হবে।

তাকিয়ে দেখি একটা ময়লা আংরাখা গায়ে একটি কাশ্মীরী ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কি সুন্দর ঢলঢলে কচি মুখখানা। টুকটুকে রং আর পদ্মের পাপড়ির মত আয়ত দুটি চোখ। যেন তুলি দিয়ে আঁকা দুটি ভুরু। কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুলে ঘিরে রেখেছে সুকুমার মুখখানি।

কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কি নাম তোমার? কাজ করতে পারবে তো?

এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে। আমার কথায় আস্তে করে বলল, ওর নাম মোহন। কাম বিলকুল জানে। রসুই ভি।

আমি হেসে ফেললাম ওর কথায়। আর একটু অবাক হলাম আমার কথার ঠিক ঠিক জবাব পেয়ে।

খেলুভাই বলল, তাঁবুওয়ালাই ঠিক করে দিয়েছে ওকে। এর আগে ঐ তাঁবুতে যারা ছিল তারাও বাঙালী। তাদের কাছেও কাজ করেছে। কাজকর্ম জানে।

কাজকর্ম জানুক আর না-ই জানুক শিখিয়ে নিলেই চলবে। ছেলেটিকে আমাদের সকলেরই পছন্দ হয়েছে। আমরা যতটুকু কাজ-চালানো-গোছের হিন্দী শিখেছি, ততটুকু হিন্দি ও-ও শিখেছে মনে হচ্ছে। আমাদের কথা ও বুঝতে পারলেই হ'ল। ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হ'ল, বাংলা কথাও একটু-আধটু বুঝতে পারে যেন।

সব রকম ব্যবস্থা করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। এবার আস্তানায় যেতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি পা-দুটো একেবারেই অসহযোগ করেছে আমার সঙ্গে। একটু আরাম পেয়েই তারা বেঁকে বসেছে।

কাঠের মত শক্ত হয়ে আছে। একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এক পাও নড়বে না এখান থেকে। ওদের ভাবখানা—অনেক অত্যাচার করেছ আমাদের ওপর, সব সয়েছি—আর নয়।

কিন্তু উপায় কি? ওদের আব্দারে সায় দিলে তো চলবে না! তাঁবু পর্যন্ত যেতেই হবে। তারপর না হয় দুদিন আর হাঁটবই না! শুয়ে থাকব শুধু। দুহাতে হাঁটু দুটোতে চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে মনে বললাম, চল্ বাবা এটুকু। তারপর না হয় একেবারে থেমে যাস।

দোকানগুলোর পেছন দিয়ে একটা পায়ে-চলা-পথ নেমেছে তাঁবু পর্যন্ত। খুব কিছু দূর নয়। তবু এটুকু যেতেই বেয়াড়া পা-দুটো যা হয়রান করল আমাকে! প্রতি পদক্ষেপে বেচাল হচ্ছে তারা। লাঠিটা ভাগ্যি হাতে ছিল! না হলে ওদের ভরসায় এটুকুও যেতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

পাহাড়ে ওঠার সময় যেমন নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়, দম ফুরিয়ে আসে—নামার সময় তেমনি আবার পায়ের ওপর চাপ পড়ে বেশী। হাঁটু দুটো মুড়তে বা খুলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

তাঁবুতে ঢুকেই কিন্তু খুশীতে ভরে উঠল মন। মনে হ'ল, যাক বাবা এত কষ্টের পর এবার সত্যি আরামে থাকা যাবে। বিরাট তাঁবু। দূর থেকে এত বড় বোঝা যায়নি। ভেতরে ছখানা সিংগল্ বেড্ খাট পাতা আছে। বিছানা-পত্র সবই আছে। পেছনে ছোট একটা ঘর। সেখানা ড্রেসিংটেবিল, চেয়ার দিয়ে সাজানো। তাঁবুর সামনে বারান্দা মত। চেয়ার টেবিল দিয়ে বসার ব্যবস্থা করা আছে। মোট কথা সব রকম আরামের ব্যবস্থা আছে।

খেলুভাই বলল, তোমরা স্নান করতে পারো। গরম জলের ব্যবস্থা করেছি।

তাকিয়ে দেখি আরো একজন লোক রেখেছে। সে একটা বড় ড্রামের মত পাত্রে জল গরম করছে।

দুদিন ধরে স্নান হয়নি। স্নান করতে পারলে যে আরাম হবে সন্দেহ নেই। পাশেই ছোট রাউটি খাটানো আছে বাথরুম হিসেবে। মনে মনে খেলুভাইএর সুব্যবস্থার প্রশংসা না করে পারলাম না।

স্নানের পর সত্যিই খুব ভালো লাগছিল। খেলুভাই যখন বলল, রাতের খাবার কি ব্যবস্থা হবে,—এবার আমি এগিয়ে এসে বললাম, সে ভার আমিই নিচ্ছি।

পায়ে এখনও বেশ ব্যথা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওপরে গিয়ে আবার সেই পাঞ্জাবী হোটেলের খানা খাবার উৎসাহ হ'ল না মোটেই। সঙ্গে প্যাকিং-বাক্সে রান্নার সাজ-সরঞ্জাম সবই ছিল। বাড়ি থেকে ভাজা মুগডাল, ভালো আতপচাল, ঘি, তেল, মশলাপাতি সবই আনা হয়েছে। সামনের টেবিলের ওপর মোহনকে দিয়ে স্টোভ ধরিয়ে নিয়ে প্রেসার কুকারে খিচুড়ি চাপিয়ে দিলাম।

সবাই বেশ তৃপ্তি করে খেলো। আর খুশী হ'ল সব চেয়ে খেলুভাই, বার বার বলল, এই সব চেয়ে ভালো ব্যবস্থা হ'ল কি বল ? হোটেলে খেলে কি এত তৃপ্তি হ'ত খেয়ে ?

আমি হেসে বললাম, তোমার ব্যবস্থাপনায় আমরা সবাই খুশী।

রাতে এত আরামের বিছানায় শুয়েও কিন্তু চট্ করে ঘুম এলো না চোখে। মনে পড়ল অসিত ঠাকুরপোদের কথা। সারাদিন ভুলে ছিলাম। এখন মনে হতে লাগল, ওরা হয়ত এতক্ষণে শেষনাগ লেকের ধারে তাঁবু ফেলেছে। সারা বছর ধরে যেখানে কোন মানুষ কেন হয়ত কোন পশুপক্ষীরও সাড়া ছিল না আজ সেই নির্জন উপত্যকা মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে। অসংখ্য তাঁবু পড়েছে লেকের ধারে ধারে।

মনে হ'ল শেষনাগের নীল জলে ছায়া ফেলে রোজই তো চাঁদ ওঠে আকাশে। চারিপাশের তুষারাবৃত গিরিশ্রেণী যখন চাঁদের কিরণে প্রদীপ্ত হয়ে শুভ্র রজত-কান্তিতে ঝলমল করে ওঠে, আর আকাশের চাঁদ আর তারার সঙ্গে হ্রদের নীল জলে দোলে সেই ছায়া, তখন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত তুহিন উপত্যকার সেই অপূর্ব শোভা দেখার জন্য কেউ তো জেগে থাকে না সেখানে ! আজ তাই এতগুলি মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রকৃতি আনন্দে উচ্ছল হয়ে হেসে উঠেছে হয়ত। বুঝিবা প্রকৃতিও এই দিনটির প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল এতদিন !

একসঙ্গে পথে বেরিয়েছি। ওরা চলে গেল, পিছে পড়ে থাকলাম আমি। ভূস্বর্গের সে অপরূপ রূপ আর আমার দেখা হ'ল না। ব্যথায় ভরে উঠল মন।

॥ ২১ ॥

কাল রাতে এখানে বৃষ্টি হয়নি। আজ সকালেও বৃষ্টি নেই, তবে আকাশে মেঘের আনাগোনা চলছে। পাহাড়ের মত বড় বড় কালো মেঘের এক-একটা স্তূপ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলছে। তবে ঝোড়ো বাতাসে স্থির হয়ে জমতে পারছে না বলে বৃষ্টি নামছে না।

এখন আমার কার্জ হয়েছে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে মেঘের গতি-প্রকৃতি অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা। আবহাওয়া অফিসের কর্তারাও হয়ত এত মনযোগ দেন না আকাশের প্রতি। অবশ্য অমরনাথ-যাত্রী প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি আজ আকাশের প্রতি। পাহাড় আর মেঘের রাজ্যে—যেন সবাই আজ মেঘদূত কাব্যের যক্ষের মত বন্দী। তবে প্রিয়ার জন্য নয়, এদের ব্যাকুলতা প্রিয় দেবতা অমরনাথজীর জন্য। এত দুঃখের পরও যদি দর্শন না হয়! মেঘের ফাটলে মুখ বের করে ক্বচিৎ কখনও উঁকি দিচ্ছেন সূর্যদেব। ওঁর অদর্শনে কয়েক সহস্র নর-নারীর এই উদ্বেগ আর দুর্দশা দেখে মনে মনে কৌতুক বোধ করছেন হয়ত।

কাল যে পহলগাম দূর থেকে দেখে অত ভালো লেগেছিল, আজ মনে হচ্ছে চারিপাশের পাহাড়ের দেয়ালের মাঝে আমিও যেন বন্দী হয়ে গেছি। ছটফট করছি মনে মনে। ওই উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়াগুলো ডিঙ্গিয়ে যদি একবার যেতে পারতাম সেখানে! ওখানে আজ প্রকৃতির কী লীলা চলছে দেখতে পেতাম তাহলে।

মোহনকে ডেকে জিজ্ঞেস করি, অমরনাথ পর্বত কি দেখা যায় এখান থেকে?

ও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঐ যে সব চেয়ে উঁচু সাদা মত পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ঐটেই সেই পাহাড়।

এতদূর থেকে সে পাহাড় দেখা সম্ভব কিনা জানি না। তবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি সেদিকে। মনে হয় সত্যি সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে বুঝি।

আবার কখনও মনে হয়, ওটা পাহাড় নয় ওপাশে মেঘ জমে আছে পাহাড়ের মত। বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলে মনে হচ্ছে যেন একটু পরিবর্তন হচ্ছে আকারের। তাহলে ওটা মেঘই! তবে কি বৃষ্টি হচ্ছে ওদিকে? আমার যাওয়া হ'ল না কিন্তু যারা গিয়েছে তাদের অমরনাথ দর্শন হবে তো? এত উৎকণ্ঠা আমার সেই কারণেই।

খেলুভাই আর অনিলদা পহলগামের বাজারে গিয়েছিল। তারাও ওপর থেকে শুকনো মুখে ফিরে এলো। অমরনাথ-যাত্রীদের জন্য এখানে একটা অফিস খুলেছে। সেখানে খবর নিয়ে জেনেছে, আবহাওয়ার খবর ভালো নয়। কাল রাতে শেষনাগে খুব বৃষ্টি হয়েছে। অসম্ভব ঠাণ্ডায় নাকি কয়েকটি শিশু ও বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটেছে। ঘোড়া মরেছে অনেক। বহুলোক ফিরে আসছে শেষনাগ থেকে। 'অয়্যারলেসে' খবর এসেছে।

শুনে আমাদেরও মুখ শুকিয়ে গেল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা না কমে যেন আরো বাড়ছে মনে হচ্ছে। কারণ বৃষ্টি না হলেও বাতাসের দাপট বেড়েই চলেছে। এখান থেকে চন্দনবাড়ি যাবার দিন আশেপাশের পাহাড়ে কোন বরফ চোখে পড়েনি। কিন্তু আজ দেখছি আমরা যেদিকে আছি সেদিকের পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায় বরফ জমেছে। মোহনই প্রথমে দেখালো আমাকে। কালো পাহাড়ের চূড়ায় চুনের মত সাদা আঁকাবাঁকা রেখাগুলো দেখে প্রথমে বরফ বলে বুঝতে পারিনি। কিন্তু সামান্য একটু রোদের ছোঁয়া লাগতেই ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। মনে হ'ল পাহাড়ী ঝরণা জমে বরফ হয়ে ঠিক যেন শিবের মাথায় জটার মত ঝুলছে ওপর থেকে। বরফ দেখে মোহনের আনন্দ। কিন্তু আমার মনে শঙ্কা জাগছে। যারা ওপরে গিয়েছে তারা নিরাপদে ফিরে আসুক প্রার্থনা করছি মনে মনে।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর আর চুপ করে থাকতে ভালো লাগছিল না। ভাবলাম একটু ঘুরেফিরে খবর সংগ্রহ করি। আমাদের একটু নীচেই কুণ্ডু স্পেশালের তাঁবুগুলো দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে নেমে গেলাম সেদিকে, যদি কোন খবর পাওয়া যায় এই ভেবে। নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এক বৃদ্ধা বিধবা মহিলাকে নিয়ে একটা ডাণ্ডি পৌঁছালো ওখানে।

জিজ্ঞেস করলাম, ফিরে এলেন ?

বললেন, কি করব মা, কপালে দর্শন নেই। নাহলে শেষনাগ থেকে ফিরে আসতে হয় ? দু-চোখ ভরা জল। আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

তাকিয়ে দেখি পা দুখানা ফুলে গেছে। উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই। চোখের কোলে কালি। ধুঁকছেন বসে বসে।

বৃদ্ধার চোখের জল দেখে আমার চোখেও জল এলো। নিজের দুঃখ ভুলে গেলাম। মনে হল, আহা, আমার চেয়ে আরও কত দুঃখ ওঁর। কত কষ্ট সহ্য করে শেষনাগ পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসতে হ'ল। ওখান থেকে কতদূরই বা অমর-

নাথ গুহা। একেই বলে ভাগ্য! দেব-দর্শন ভাগ্যের কথা।

দেখি একটি ছেলে এসে কোনরকমে ধরে ধরে নিয়ে গেল ওঁকে তাঁবুর ভেতরে। নিশ্চিন্ত হলাম আমি। যাক এখানে ওঁকে দেখাশোনা করার লোক আছে তাহলে। এখন আর কথা বলার শক্তি নেই বৃদ্ধার। আমিও ফিরে চললাম।

তাঁবুতে ফিরে যেতে ইচ্ছে হ'ল না, তাই একেবারে ওপরে উঠে এলাম। ঘুরে ঘুরে লোকজন দোকানপসার দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হ'ল একটা চেনা-চেনা মুখ যেন! রাস্তার পাশের মুচির কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে আর ছেঁড়া চপ্পলে বোধ হয় পেরেক ঠোকাচ্ছে। কিছুক্ষণ দেখার পরই মনে পড়ল চন্দনবাড়ি যাবার দিন আমার ঘোড়ার পাশে-পাশেই ওর ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিল লোকটি। মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক সোয়ারী ছিল তাতে। আমার সহিসের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছি ওকে। বোধ হয় একগ্রামের লোক তুজনেই। চিনতে পেরে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এত্না জলদি ঘুমা কেইসে?

প্রথমে আমাকে চিনতে পেরে একটু হাসি ফুটলো ওর মুখে। তারপর আমার প্রশ্নের জবাবে বিষণ্ণ মুখে যা বলল, প্রথমটায় আমি তার অর্থ ধরতে পারিনি কিছু।

ও উত্তর দিল, বহুত জারা। আদ্মী ঠান্ঢা হো গিয়া মাইজী।

বুঝতে না পেরে আবার প্রশ্ন করলাম, অমরনাথ তক্ গিয়ে তুম্? যদিও জানি এত তাড়াতাড়ি অমরনাথ দেখে ফেরা যায় না, তবু কেন জানি না জিজ্ঞেস করলাম এ কথা। ভাবলাম ঠাণ্ডার জন্যই কোথাও না থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে হয়ত।

ও আবার বলে উঠল, লেট্ আয়া মাইজী। একদম ঠাণ্ডা হো গিয়া উন্কো দেহ্। এবার ওর মুখের দিকে চেয়ে যা বলল তার অর্থ বুঝতে আর দেরি হল না।

চমকে উঠলাম আমি। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ভদ্রলোকের চেহারা। মাথা থেকে সর্বাঙ্গ বেশ ভালো করে শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল তবু এমন হ'ল? সহিসটির দিকে দৃষ্টি পড়ল। ময়লা শতচ্ছিন্ন সামান্য পোশাকে বেশ সহজভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। যে শীতে ঐ ভদ্রলোকের মৃত্যু হ'ল, এই সামান্য পরিচ্ছদেই সে-শীত তুচ্ছ করে ফিরে এসেছে ও। মনে পড়ল চন্দনবাড়িতে সেই দুর্যোগের রাত কিভাবে কাটিয়েছে ওরা!

আজ পহলগামের শীতাঙ্ক কোথায় নেমেছে কে জানে। হাতের আঙুলগুলো কন্ কন্ করছে বলে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েছি আমি। একবার মনে হ'ল

অসিত ঠাকুরপোদের খোঁজ নিই ওর কাছে। কারণ আমার সেই সহিসটি ওদের সঙ্গেই গিয়েছে। শেষনাগে এদের দেখাও হয়েছে হয়ত। কিন্তু সাহস হ'ল না প্রশ্ন করার। ভয় হ'ল যদি আরও কোন দুঃসংবাদ শুনতে হয়।

মুচিটির দিকে এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি তেমন। পাহাড়ী জায়গায় এ দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়ে। পথের পাশে বসে ওরা দুটো পয়সা রোজগার করে থাকে। এপথে জুতো সারানোর দরকার পড়ে সকলেরই। ওর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটিকে দেখে কষ্ট হ'ল। ফুলের মত সুন্দর ছেলেমেয়েগুলো। কিন্তু কি জীর্ণ পোশাক ওদের গায়ে। বড় মেয়েটি বছর পাঁচেকের বেশী নয়। সব চেয়ে ছোট বাচ্চাটি বছর খানেকের হবে। তার গায়ে যদিও একটা কুর্তা আছে, কিন্তু কোমরের নীচে থেকে একেবারে অনাবৃত। হামা দিয়ে দিয়ে পথের মাঝখানে চলে এসেছে। ঠাণ্ডায় কিছু না হলেও, এপথে অনবরত মোটর যাতায়াত করছে যদি চাপা পড়ে বাচ্চাটি! ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি। বড়লোক টুরিস্টরা শ্রীনগর থেকে গাড়ি নিয়েই আসে এখানে। দামী দামী ঝকৃঝকে গাড়িগুলি পার্ক করছে এখানে এসে। এর পরই চন্দনবাড়ির ওদিকে মোড় ঘুরেছে পথ।

মুচিটি নিজের মনে ঝুঁকে বসে জুতোতে পেরেক ঠুকছে। বাচ্চাগুলোর কি হ'ল সেদিকে খেয়াল নেই। ভাবছি কি করি, ওর বাবাকে ডেকে দেব না তুলে নেব বাচ্চাটিকে—এমন সময় কোত্থেকে ওর মা ছুটে এসে কোলে তুলে নিল শিশুটিকে। বকতে লাগল স্বামীকে এদিকে লক্ষ্য করেনি বলে। বেচারা স্বামী অপরাধীর মত মাথা নীচু করে শুনে গেল বকুনি।

রাস্তার ধারে ওদের কুঁড়ে ঘরখানি চোখে পড়ল। দরিদ্রের সংসার। মা বাবা দুজনকেই সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এই শিশুদের দিকে দৃষ্টি না দিলেই বা চলবে কেন? সংসারের হাজার কাজে ব্যস্ত থাকলেও মায়ের একটা চোখ পড়ে ছিল বুঝি বাচ্চাগুলোর দিকে। একটা দুঃখের ছবি ফুটে উঠছিল মনে, কিন্তু ইতিমধ্যে ওদের ভেতর কি কথা হ'ল জানি না, হঠাৎ দেখি বউটি ফিক্ করে হেসে বাচ্চা কোলে ঘুরে দাঁড়ালো ঘরের পথে। যেতে যেতে কি বলে গেল স্বামীকে। বোধ হয় তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার জন্য অনুরোধ। স্বামীর মুখেও হাসির আভাস। এক ঝলক দম্কা বাতাস এসে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল কালো মেঘ।

আমিও মনে মনে খুশী হলাম। শুধু দুঃখ আর নিরানন্দ নয়, এদের জীবনেও মধুর স্পর্শ লাগে দেখে। এত দুঃখ-কষ্টেও মেয়েটির মনে স্বামীর জন্য কোথায়

একটু দরদ লুকিয়ে ছিল। তাই যাবার বেলায় স্বামীর মনের সব গ্লানি মুছে দিয়ে গেল। এ দৃশ্য চোখে না দেখলে আমার দেখা সম্পূর্ণ হ'ত না। শুধু দুঃখ-দৈন্যই চোখে পড়ে। ওদের জীবনের আর একটা দিক এমন করে চোখে পড়েনি কোন-দিন। ওদের মুখে হাসি দেখে আমার মনও তৃপ্ত হ'ল।

ওদের ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য। তবু এতক্ষণ কেন দাঁড়িয়েছিলাম তাই ভাবছিলাম। বৌটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেন কি জানি মনে পড়ল এমনি আর একটি মুচি-বৌকে। দেখেছিলাম বদ্রীনাথের পথে। যোশীমঠ থেকে বদ্রী যাবার পথে আমার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর যেতে দেখেছিলাম। কত যাত্রীই তো যায়। কিন্তু ওকে মনে আছে আমার একটি বিশেষ কারণে। যোশীমঠ থেকে পথ যেখানে মোড় নিয়েছে বদ্রীর দিকে, সেখানে পাহাড়ের গায়ে একটা খিলানের মত গোল খাঁজ আছে। বসলে ছাদটা মাথায় ঠেকে না কিন্তু দাঁড়ানো চলে না সোজা হয়ে। তারই ভেতর এক মুচি বসে জুতো সারায়। কাছেই যাত্রীদের জন্য জলের কল। আগের দিন স্নান করতে এসে অল্পবয়েসী ওই বউটিকে দেখেছিলাম ওর স্বামীর পাশে বসে থাকতে। পরদিন সকালে বদ্রীর দিকে যেতে যেতে পথে দেখি সেই বৌটি। কোলে মাস দুয়েকের একটি শিশু। আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়েছে বুকের কাছে। ছোট্ট ছোট্ট খালি পা-দুটো বেরিয়ে আছে আঁচলের তলা দিয়ে। নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়। লক্ষ্য করে দেখি মায়ের আঁচল ছাড়া গায়েও বিশেষ কিছু নেই। বাচ্চাটা শীতে সমানে চেঁচাচ্ছে মায়ের বুকে। আমি না বলে পারিনি, এইটুকুন বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছ কেন?

জবাব দিয়েছিল, কী করব মাইজী! ডাক এসেছে। 'ডাক এসেছে' কথাটা কানে যেতেই কী জানি কেন ধক করে উঠেছিল বুকটা। মনে হয়েছিল কার ডাক এসেছে? বাচ্চাটার নয়ত? অদৃশ্য নিয়তি বুঝি টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। শিউরে উঠেছিলাম আমি। আর কিছু বলিনি বৌটিকে। নিষেধ করলেও শুনত না।

তিন দিন ছিলাম আমি বদ্রীতে। ওখানে আর চোখে পড়েনি ওকে। ভুলেই গিয়েছিলাম হয়ত। বদ্রী থেকে ফিরে আবার এলাম যোশীমঠে। স্নান করতে গিয়ে দেখি বৌটি ঠিক আগের মতই বাচ্চা কোলে স্বামীর পাশে বসে। ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—বাচ্চা ভালো আছে তোমার? বদ্রী পর্যন্ত গিয়েছিলে?

ও হেসে জবাব দিয়েছিল, জী মাইজী। না গিয়ে কি উপায় ছিল? ডাক এসে গিয়েছিল যে!

অবাক হয়েছিলাম আমি ওকে দেখে। ওর অন্তরের ব্যাকুলতা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল আমার চোখে। এমনি অন্ধ ভক্তি আর বিশ্বাস না থাকলে কোন মা কি সাহস করে ওইটুকুন শিশু নিয়ে ওভাবে যেতে পারত ?

মনে পড়ল বদ্রীনাথের মন্দিরে দেখেছি কত মেয়েকে আকুল হয়ে কাঁদতে। কানের, হাতের, গলার অলঙ্কার খুলে বিগ্রহের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখেছি। ওখানে পৌছালে বুঝি মানুষের সব চাওয়া-পাওয়ার শেষ হয়ে যায়। মোহ থাকে না আর কোন জিনিসেই। মনে হ'ল ভালো-মন্দ, আগু-পিছু কোন চিন্তা নাই যার মনে তারই হয় দেবদর্শন। আমাদের পথে বাধা অনেক।

সহিসটির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই অসিত ঠাকুরপো মণ্টু আর অজিত ঠাকুরপো যারা অমরনাথ গিয়েছে ওদের জন্য উদ্বেগ আমার আরো বেড়ে গেল। আবার মনে হতে লাগল হয়ত ওরা ফিরেই আসছে। পহলগাম আসার এইটেই একমাত্র পথ। এখানে প্রশস্ত পীচ রোডের দুধারে হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকান-পসার, বাজার সব কিছুই। নীচের উপত্যকায় আর কোন ঘরবাড়ী নেই। যারা সেখানে থাকে তারা তাঁবুতেই থাকে। সেদিকে যাবার পায়ে-চলা-পথও এখান থেকেই নেমেছে। ওরা যদি আসে এই পথেই আসবে। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে চন্দনবাড়ির পথে লীডারের সেতুর কাছে চলে এসেছি। দেখি দু'চারজন করে এখনও ফিরছে। তাদের ক্লান্ত হতাশ মুখের দিকে তাকালে সত্যিই দুঃখ হয়। অমরনাথ যাবে বলে বেরিয়েছিল, দর্শন না করে তাদের কেউ কি ফিরে আসতে চায় ? কত দুঃখেই না জানি ফিরে আসতে হয়েছে এদের। কিন্তু আমি যাদের কথা ভাবছি তারা কেউ ফিরল না দেখে মনে হ'ল ওরা তাহলে পঞ্চতরণীর দিকেই চলে গেছে !

তবু ভারাক্রান্ত মনেই তাঁবুর দিকে ফিরছিলাম। দোকানগুলোর পেছনের সেই পায়ে-চলা-পথে নামতেই কপালের ওপর জলের ফোঁটা পড়ল এসে। চোখ তুলে তাকালাম আকাশের দিকে। দেখি আকাশেরও মুখ ভার, থমথম করছে যেন। জলভরা কালো মেঘে কখন আকাশ ঢেকে ফেলেছে টের পাইনি। কখন সন্ধ্যা নেমেছে আলো জ্বলে উঠেছে পথের দুধারের দোকানগুলোতে, কিছুই খেয়াল করিনি এতক্ষণ। এপথে নেমে খেয়াল হ'ল, তাই তো, রাত হয়েছে ! এ পথটুকুতে আলো নেই। তাঁবুতে অবশ্য বিজলী বাতির ব্যবস্থা আছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা তবু একটা চাপা আলো আসছে। তাইতেই পথ দেখে চলতে লাগলাম। নীচের উপত্যকা অস্পষ্ট ছবির মত চোখে পড়ছে। নদীর

ওপারের পাহাড় ঝাউবন সব ঝাপসা লাগছে। বোধ হয় বৃষ্টি নেমেছে ওপারে। ভেজা বাতাসই বলে দিচ্ছে সেকথা। আকাশটা যেন মাথার ওপর নেমে এসেছে। এখানেও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। এখনই জোরে বৃষ্টি নামবে। হয়ত সারারাত ধরে বর্ষণ চলবে। যারা গিয়েছে তাদের জন্য চিন্তিতমনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, আমাদের সবাই বিকেলে ওপরে বেড়াতে গিয়েছিল দেখেছি ; ওরা যদি আগে তাঁবুতে ফিরে থাকে ? রাত নেমেছে, বৃষ্টিও শুরু হ'ল— হয়ত আমার জন্যও ভাবছে ওরা। একথা মনে হতেই আরো একটু জোরে তাঁবুর দিকে পা চালালাম্।

॥ ২২ ॥

দুপুরে সবাই বিশ্রাম করছে। আমি শুধু একা একা তাঁবুর বাইরে বসে আছি, কিছুই ভালো লাগছে না। আজ সকাল থেকেই মনটা ভারী হয়ে আছে। আজই অমরনাথ দর্শনের দিন। যারা গুহায় পৌঁছতে পেরেছে সার্থক হ'ল তাদের এত দুঃখভোগ।

আজ সকালে আবার সেই পাণ্ডাঠাকুর এসেছিলেন। এবারকার 'যাত্রা' ওঁর নিষ্ফল হয়েছে। রোজগারপাতি হ'ল না দুর্যোগের জন্য। তাই বোধ হয় শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার এসেছিলেন আমাদের খোঁজে। আমরা রাজী হলে এখনও নাকি আমাদের অমরনাথ দর্শন করিয়ে আনতে পারেন। বললেন, বেশী সময় লাগবে না। কাল খুব ভোরে রওনা হলে আড়াই দিনেই ঘুরিয়ে আনব।

আবার সেই বাগাড়ম্বর শুরু করলেন। একটা ঘোড়া পেলে নাকি যেতে একদিন আসতে একদিন দুদিনেই ঘুরে আসতে পারেন দর্শন করে। আমাদের জন্য আরো একবেলা বেশী ধরেছেন। মনে পড়ল যাবার দিন উনিই বলেছিলেন পয়সার জন্য প্রাণ দিতে পারি না তো! সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— বৃষ্টি হলে কি হবে ?

আমার এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, বারীষ আর হবে না। দিন ভালই থাকবে।

আমারও মনে হচ্ছিল তাই। আজ সকাল থেকে সত্যি সুন্দর ঝকঝকে রোদ উঠেছে। মনে হচ্ছে এতগুলো মানুষকে কাঁদিয়ে বর্ষা এবার বিদায় নিল বুঝি। আমাদের সঙ্গে আড়ি করেই যেন এ কদিন এমন দুর্যোগ চলল।

আড়াই দিনে দর্শন করে ফিরে আসা কি করে সম্ভব হবে জানি না। তবু মন চঞ্চল হয়ে নেচে উঠেছিল। খেলুভাইকে বললাম, যাবে নাকি?

ওর সেই একই উত্তর, একবার বাধা পড়েছে আর হয় না। পাণ্ডাজী বিষণ্ণ মনে ফিরে যেতে যেতে বলে গেলেন, অনন্তনাগে ওঁর বাড়ি। ওদিকে গেলে যেন ওঁর খোঁজ করি।

খেলুভাইকে বোধ হয় নামধামও দিয়ে গেলেন। পাণ্ডার সম্বন্ধে আর কোন আগ্রহ নেই আমার। যাওয়া যখন হ'ল না তখন আর কি দরকার ওসব জেনে?

আজই একটি চিঠি পেয়েছি কলকাতার। লিখেছেন অমরনাথ থেকে ফিরে এসে পাব। ফিরে এসেই তো পেলাম। কিন্তু এভাবে ফিরতে চাইনি তো আমি! ভাবলাম যেতে পারিনি সেকথা জানিয়ে দিই। সবে লিখতে শুরু করেছি, দেখি খেলুভাই বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। ওকে দেখেও আমার কিছু মনে হয়নি। তখনও চিঠিটা লিখছি আমি। হঠাৎ দেখি ও আমার হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে শুরু করল। প্রথমটায় ওর কাণ্ড দেখে অবাক হলেও পরে হেসে উঠলাম।

বললাম, তুমি মনে করেছ বুঝি অমরনাথ যাওয়া হ'ল না বলে তোমার নামে নালিশ করছি আমি তোমার দাদার কাছে?

খেলুভাই এবার একটু অপ্রস্তুত হ'ল নিজের কাজে। ফিরিয়ে দিল আমাকে চিঠিখানা। আমি ঠিকানা লিখে আবার ওকেই দিলাম পোস্ট করতে। ও যেতে যেতেও ঘুরে দাঁড়ালো। বলল, নদীর ওপারে শিবমন্দির আছে, বেড়াতে যাবে?

বললাম, চলো ঘুরেই আসি। এখানে বসে থাকলে আরো খারাপ লাগবে।

আমরা চার জা, খেলুভাই, অনিলদা সবাই দল বেঁধে বেড়াতে বের হলাম। সকলেরই খারাপ লাগছে আজকের দিনে।

বড় রাস্তা দিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে কিছুদূর গিয়ে আমরা লীডারের আর একটা সেতু পার হলাম। ওপারে নদীর চরের ওপর দিয়েই খানিকটা যেতেই পাহাড়ের কোলে একটা ছোট্ট মন্দির চোখে পড়ল। একটু যেন নিরাশ হলাম আমি। কারণ কাশ্মীরে আসার আগে রাজতরঙ্গিণীতে পড়েছি, কাশ্মীরের রাজা-রাণীরা নিজেদের নামে নগরপত্তন করেছেন এবং কীর্তিরক্ষার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বিগ্রহ স্থাপনা করেছেন নিজেদের নামে। কাজেই এপারে আসার আগে আমার মনে হয়েছিল, কারুকার্যময় বহু পুরাতন বিরাট কোন মন্দির দেখতে পাব বুঝি। জীর্ণ হলেও

বহুকাল আগের কোন স্মৃতি বহন করবে সেই মন্দির। কিন্তু এ মন্দিরে না আছে কোন স্থাপত্যকলার নিদর্শন, না আছে কোন সৌষ্ঠব। পুরাতনও নয়। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় সে কথা। কাজেই মন্দির দেখার উৎসাহ কমে এলো আমার। কিন্তু এসেছি যখন দেবদর্শন করে যাই। সেইটেই লাভ। ধীরে ধীরে এগোলাম মন্দিরের দিকে।

অসময়ে এসেছি আমরা। মন্দিরের দরজা বন্ধ। লোকজনও নেই। এতটা পথ এলাম আশেপাশে লোকালয় দেখিনি। অত্যন্ত নির্জন পরিবেশ। মন্দির প্রাঙ্গণটুকু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তবে মন্দিরের পেছনেই শুকনো ঝাউপাতার স্তূপ। দেখে মনে হ'ল রোজ কি কেউ আসে এখানে? হয়ত কোন উপলক্ষ থাকলে আসে। আজ সকালেই হয়ত এসেছিল পূজারী। এবেলা আর মন্দির খুলবে বলে মনে হ'ল না।

মন্দিরের সামনেই একটা জলের কুণ্ড। বাঁধানো বড় চৌবাচ্চার মত। ভেতরে স্প্রীং আছে। অনবরত নীচে থেকে জল বেরোচ্ছে। জলের বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে অনেকগুলো জায়গা থেকে। এত স্বচ্ছ জল যে তলার নুড়িগুলোও দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট একরকম মাছও চোখে পড়ছে। কী পরিমাণ জল উঠছে পাশের নালার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বেশ কুল কুল শব্দে জলের স্রোত বয়ে চলেছে পাশের নালা দিয়ে। রাজগিরি এবং বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরেও দেখেছি এমনি প্রস্রবণ। তবে সেগুলো গরম জলের। কিন্তু এ জলে হাত দিয়ে দেখলাম বেশ ঠাণ্ডা।

মোহনকে পাঠানো হ'ল পূজারীকে ডাকতে। মন্দিরের পেছনের বড় বড় ঝাউগাছের মোটা মোটা গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে যেতে দেখলাম ওকে। মনে হ'ল ঝাউবনের ওদিকেই বোধ হয় পূজারীর বাসস্থান। নদীর ওপার থেকে পাহাড়ের গায়ে ঝাউবন চোখে পড়ে, তবে ঝাউগাছগুলো যে এত বিশাল আকারের তা বোঝা যায় না। মন্দিরটা চোখে পড়ে না। ওর ফিরতে দেরি দেখে মন্দিরের আশেপাশে দেখছিলাম ঘুরে ফিরে। সামনের দিকে একটু দূরেই সেই নালার পাশে মোটা মোটা কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। লেখা আছে স্নানাগার। কিন্তু ওখানে ঢুকতে বারণ করছে। এ ধরনের স্নানাগার আর কোন দেবালয়ের কাছে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। একটু আশ্চর্য হলাম তাই। স্নানাগারের পাশেই কাঠের বেড়ার গায়ে ছোট দরজা। মন্দিরে আসার ঐটেই বোধ হয় রাস্তা। আমরা অন্যদিক দিয়ে এসেছি। বেড়ার দরজার পাশেই কাঠের ফলকে লেখা

আছে দেখলাম—Prehistoric. এতক্ষণে আনন্দে নেচে উঠল আমার মন। সমস্ত পরিবেশটাই নূতন রূপে ধরা দিল আমার চোখে। প্রাগ্ঐতিহাসিক শব্দটাই কেমন মনের মাঝে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। মন্দিরটি পুরাতন নয়। কিন্তু বিগ্রহ অতি পুরাতন। ঐতিহাসিকেরাও যে কালের খবর জানেন না সেই কালের স্মৃতি বহন করছে এ স্থান। দেবদর্শনের আকাঙ্ক্ষা যেন শতগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু পূজারীকে নিয়ে মোহন তখনও ফেরেনি, তাই মন্দিরের বন্ধ দুয়ারের সামনে কুণ্ডের ধারে বসে পড়লাম।

নিস্তব্ধ নির্জন চারিদিক। আশেপাশে আর কোন লোকালয় নেই। আমরা ছাড়া আর জনমানবের সাড়াশব্দও নেই। মন্দিরের পেছনেই নিবিড় অরণ্যময় খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। দীর্ঘ সরল ঝাউগাছগুলো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বাতাসে মাথা দুলিয়ে কি যেন বলাবলি করছে ওরা। সেই নির্জনতার মাঝে কান পেতে শুনতে পেলাম বনমর্মর-ধ্বনি। যেন মৃদু গুঞ্জন কানে আসতে লাগল। ওরা যেন বলতে চায় কত যুগের কত কথা! এই বিগ্রহ আর ঐ অরণ্যের যে কাহিনী ওরা আমাকে শোনাতে চায়, মনে হ'ল কবি কহ্লন তাঁর অমর কাব্যে যেন বলে গেছেন সেকথা।

—রাজা ললিতাদিত্য যাবেন দিগ্বিজয়ে। প্রস্তুতি চলছে। সৈন্য-সামন্ত, হাতী-ঘোড়া, তাদের খাদ্য, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সব কিছুর জন্যই চাই প্রচুর অর্থ। রাজকোষে বোধ হয় এত অর্থের সংকুলান হয়নি, তাই তিনি 'ভূতেশ মহাদেবে'র কোষাগার থেকে এক কোটি মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করলেন।

ললিতাদিত্য দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রথমেই গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগ জয় করলেন। কান্যকুব্জ (গাধিপুর) জয় করে রাজা যশোবর্মাকে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। কলিঙ্গ, কর্ণাট, সপ্ত-কোঙ্কন, দ্বারকা, অবন্তী, উজ্জয়িনী, কাম্বোজ, ভুখার, প্রাগ-জ্যোতিষপুর, স্ত্রীরাজ্য (মণিপুর) প্রভৃতি ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্য জয় করে ফিরে এলেন কাশ্মীরে। এবং যে ধনরত্ন সাথে এনেছিলেন তা থেকে ভূতেশ মহাদেবের ঋণ শোধ করলেন। এক কোটি মুদ্রা ঋণ করেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এগারো কোটি মুদ্রা প্রদান করলেন দেবতার ধনাগারে। আর বিজিত কান্যকুব্জ দেশটি দান করলেন দেবতার সেবার জন্য। দেবতার কোষাগার পূর্ণ হয় তিলে তিলে। সহস্র ভক্তের অর্ঘ্যদানে। রাজকোষ থেকে যখন বেশী অর্থ ছিল দেবতার ধনভাণ্ডারে তখন মনে হয় ললিতাদিত্যের বহুপূর্বেই কেউ স্থাপনা

করেছিলেন সে বিগ্রহ।

এখানে যে বিগ্রহ আছে তাও প্রাগৈতিহাসিক। কে স্থাপনা করেছিলেন ঐতিহাসিকেরাও জানেন না। কাজেই কল্পনা করতে বাধা নেই এই সেই ভূতেশ মহাদেব, যাঁর কোষাগারে অফুরন্ত ধন-রত্ন ছিল।

রাজা ললিতাদিত্য অত্যন্ত পরিহাসরসিক ছিলেন। ফিরে এসে তাই পরিহাসপুর নামে এক নগর নির্মাণ করলেন। সে নগর এতই সুন্দর হ'ল যে কাশ্মীরে আর তেমন নগর ছিল না সেকালে। রাজধানী শ্রীনগরও নয়। রাজা অবশ্য আরো নগরপত্তন করেছিলেন। যেমন যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত জেনে সুনিশ্চিতপুর আর ফললাভ হ'ল বলে ফলপুর। তিনি যখন বিদেশে যুদ্ধ করছিলেন তখনই তাঁর ভাস্কর ললিতপুর নির্মাণ করে। তিনি ফিরে এসে সেখানে সূর্যমূর্তি স্থাপনা করলেন।

পরিহাসপুরেই তিনি পরিহাসকেশব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। পরিহাসপুরেই রাণী চক্রমর্দিকাকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। যুদ্ধবিগ্রহের জন্য রাজা ললিতা-দিত্যকে প্রায় সময়ই বাইরে কাটাতে হয় তাই যেটুকু সময় পান আমোদ-প্রমোদে কাল কাটান। ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালবাসতেন। একদিন রাজা এক অশিক্ষিত ঘোড়াকে দমন করার জন্য একা একা এক নিবিড় পার্বত্য-অরণ্যে ঢুকেছিলেন। সেই অরণ্যের মাঝে দেখতে পেলেন দেবদাসীর মত সুবেশা দুটি সুন্দরী মেয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে নৃত্যগীত করছে। রাজা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। ওরা নৃত্য-শেষে কার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে চলে গেল বনের ভেতর। এবার রাজা প্রতিদিন যেতে লাগলেন সেই বনে। রোজই আসে মেয়ে দুটি। রোজই এমনি নৃত্যগীত করে। শেষে কৌতুহলী হয়ে ললিতাদিত্য একদিন প্রশ্ন করলেন, তারা রোজ রোজ কেন এই গভীর বনে আসে এবং এভাবে এখানে নৃত্যগীতের অর্থই বা কি ?

তারা কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। শুধু বলেছিল, তাদের মা, ঠাকুমা এবং বংশপরম্পরায় এই রীতি চলে আসছে। এর কারণ তারা বলতে পারে না। একথা শোনার পর রাজার কৌতুহল আরো বৃদ্ধি পায় এবং এস্থান খনন করার আদেশ দেন। বহুদূর খনন করার পর দুটি মন্দির আবিষ্কৃত হ'ল। দুটি মন্দিরেরই দ্বার রুদ্ধ ছিল। দ্বার খোলার পর দেখা গেল দুই মন্দিরে দুটি কেশবমূর্তি আছে। পাদপীঠের লিখন দেখে তিনি জানতে পারলেন যে শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ যখন কাশ্মীরে এসেছিলেন, তখন তাঁরা ঐ মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রজতময় রামস্বামীর মূর্তিটি তিনি পরিহাসপুরে নিয়ে গিয়ে যেখানে পরিহাসকেশব বিগ্রহ স্থাপনা করেছিলেন, তার পাশে পৃথক মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন। আর রাণী চক্রমর্দিকা চক্রেশ্বর দেবের পার্শ্বে লক্ষ্মণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ লক্ষ্মণ-স্বামী প্রতিষ্ঠা করেন।

এবং বচস্তয়োঃ শ্রুত্বা নৃপোঽত্র্যঃ সবিস্ময়ঃ।
তদুক্ত্যা মেদিনীং কৃৎস্নাং কারুভির্নিদারয়ৎ ॥ ২৭২
দূরং নির্হিতমৃত্তিস্তৈরথা দ্রাক্ষীন্নিবেদিতম্।
নৃপতিঃ পিহিতদ্বারং জীর্ণং দেবগৃহদ্বয়ম্ ॥ ২৭৩
উদ্ঘাটিতাররির্বর্ণৈঃ পিঠোৎকির্ণৈনিবেদিতৌ।
অপশ্যৎ কেশবৌ তত্র রামলক্ষ্মণ নির্মিতৌ ॥ ২৭৪

মনে হ'ল শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ যখন একসঙ্গে এখানে এসেছিলেন সেটা কোন্ সময়? চতুর্দশ বর্ষ তাঁরা বনবাসে ছিলেন সেই সময়ই কি? তাহলে তো সীতা দেবীরও সঙ্গে থাকার কথা! কিন্তু এই শ্লোকে কবি তো তাঁর কথা কিছু উল্লেখ করেননি?

ললিতাদিত্য যেমন এই দুটি পুরাতন মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন, আবার তাঁর সময়েই সে দুটি ধ্বংস হয়েছিল। কিছুদিনের জন্য হলেও ললিতাদিত্য গৌড় জয় করেছিলেন। আর গৌড়রাজকে হস্তীসেনা নিয়ে কাশ্মীরে যেতে বলেছিলেন। গৌড়রাজের হয়ত অবিশ্বাস ছিল ললিতাদিত্যের প্রতি। তাই পরিহাসকেশবকে শপথ-সাক্ষী রেখে তিনি বলেছিলেন যে, গৌড়রাজের কোন অনিষ্ঠ করবেন না। কিন্তু গৌড়াধিপতি কাশ্মীরে পৌছালে তিনি এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি। হত্যা করেছিলেন গৌড়রাজকে।

গৌড়েশ্বরের অনুচরেরা প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য 'শারদা' দেবীকে দর্শন করার ছলে কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং পরিহাসপুরে এসে 'পরিহাসকেশবকে' কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মন্দিরের পূজারীরা ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ করে রেখে বিগ্রহ রক্ষা করে। গৌড়বাসীরা পাশের 'রামস্বামীর' রজতময় মূর্তিকে 'পরিহাসকেশব' মনে ক'রে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। তাদেরও অবশ্য প্রাণ দিতে হয়েছিল কাশ্মীরীদের হাতে। কবি বলেছেন, গৌড় থেকে কাশ্মীর কত সুদীর্ঘ পথ! আর মৃত প্রভুর প্রতি কি অসাধারণ ভক্তি! নিজের প্রাণ দিয়েও তারা প্রতিশোধ নিয়েছিল। সেই শূন্য মন্দির নাকি গৌড়ীয় বীরদের সাক্ষী হয়ে থাকল।

কিন্তু কোথায় সেই পরিহাসপুর ? সেই শূন্য মন্দির কি আজও দাঁড়িয়ে আছে অতীতের সাক্ষ্য বহন করে ? তাদের সে গৌরবের নিদর্শন দেখে যেতাম তাহলে। আমিও যে গৌড়বাসী !

অরণ্যের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম এই সেই অরণ্য নয়ত ? এখানেই হয়ত শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত সে-দুটি মন্দির ছিল। ত্রেতাযুগে এই বনভূমিই হয়ত ধন্য হয়েছিল একদিন জটাবল্কলধারী নরনারায়ণের পাদস্পর্শে।

চোখ পড়ল মন্দিরের দিকে। মনে হ'ল আজ যেখানে ক্ষুদ্র মন্দির দেখছি, সেখানেই হয়ত ছিল কারুকার্যময় বিশাল এক মন্দির। নির্জন নদীতট সেদিন মুখরিত হ'ত কতশত ভক্তের মন্ত্র-উচ্চারণে আর স্তোত্রগানে। সুন্দরী দেবদাসীদের নৃত্যের তালে তালে চঞ্চল হ'ত কত হৃদয়। আরত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি বহুদূর থেকে শোনা যেত। নদীর তরঙ্গাঘাতে স্পন্দিত হয়ে সে ধ্বনি স্রোতে ভেসে যেত দূর থেকে দূরান্তরে।

আমার কল্পনায় বাধা পড়ল। ঝুনঝুন শব্দে মন্দিরের শিকল খোলার শব্দে চমক ভাঙল আমার। তাকিয়ে দেখি উন্মুক্ত দ্বারপথে বিগ্রহ দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় শিবলিঙ্গ। বিগ্রহের মাথায় আজকের টাটকা ফুল। মন্দিরের ভেতর ঢুকেই অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠল মন। চন্দন, ফুল আর ধূপের মৃদু সৌরভে ভরে আছে মন্দির-গৃহ। প্রণাম জানালাম বিগ্রহকে।

মনে মনে বললাম, মহাকাল কালের সাক্ষী হয়ে যুগ যুগ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি ! কোন্ সে ভক্ত যে তোমায় স্থাপনা করেছিল, কি নামে সে ডাকত তোমায় কেউ জানে না। সহস্র ভক্তের কণ্ঠে যে নাম মুখরিত হ'ত একদিন, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'ত পর্বতগাত্রে, এই আকাশে বাতাসে সর্বত্র, আজ তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না সে নাম।

আদিনাথ, যেখানে একদিন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল আজ তার কোন চিহ্ন নেই। শ্মশানের শূন্যতা বিরাজ করছে আজ সেখানে। আমি তাই তোমাকে ভূতেশ ভগবান বলেই প্রণাম জানাই।

প্রণাম করে উঠতেই পূজারী নির্মাল্য দিল হাতে। আনন্দে হাত পেতে নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। সামান্য প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ তখন সন্ধ্যারতির আয়োজনে ব্যাপৃত। ফিরেও তাকালেন না ওদিকে। একবার মনে হ'ল আরতি দেখে যাই। কিন্তু অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে, তাই আর কিছু বলিনি।

আর কোন খেদ নাই আমার মনে। অমরনাথ না যেতে পারার দুঃখও মুছে গেছে আমার মন থেকে। মন আমার কি এক আনন্দে ভরপুর!

॥ ২৩ ॥

এবার পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অন্য পথে ফিরে চললাম। পথের একদিকে অরণ্যময় সুউচ্চ পর্বত। অন্যদিকে লীডার। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। বৃক্ষের শাখায় ঘরে-ফেরা পাখীর কলকাকলি শোনা যাচ্ছিল একটু আগে। তাও থেমে গেছে। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে মনে হলো অরণ্য আর নদী মৃদুগুঞ্জনে অতীতের কাহিনী বলে চলেছে যেন।

অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিলাম। বোধ হয় অতীতের স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। হয়ত কেউ প্রশ্ন করেছে শুনিনি কিন্তু কানে গেল মোহন বলছে, ওটা নীলগঙ্গা। আর ওদিকে সব সাহেবলোকের কুঠি।

চেয়ে দেখি সামনে, বাঁদিক থেকে আর একটা নদী এসে মিলেছে লীডারের সঙ্গে, তারও জল নীল। বোধ হয় এই নদীটিই চন্দনবাড়িতে দেখেছি। সঙ্গমের জায়গায় বিস্তীর্ণ চর। চরে ছোট ছোট কুটির বেঁধেছে কারা যেন। একটু দূরে বিরাট কম্পাউণ্ডে দু-তিনখানা পাকা বাড়ি। নদীর ওপারে পহলগামের আলো দেখা যাচ্ছে। পহলগামে স্বাস্থ্যান্বেষী অনেক আসেন শুনেছি। কাজেই সাহেব-লোক যে এখানে কুঠি বানাবে সে আর বেশী কথা কি!

নদী এখানে একটু দূরে সরে গেছে। তাই এদিকেও চর। ছোট-বড় পাথরের নুড়ি ছড়ানো চরে। সরু একটা পায়ে-চলা-পথ সীমন্তিনীর সিঁথির মত চরের বুক চিরে গিয়েছে নদী পর্যন্ত। জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত চারিদিক। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। কোন কষ্ট হচ্ছে না চলতে।

আমি আবার কখন অতীতের চিন্তায় ফিরে গেছি। ভাবছিলাম মহারাজ ললিতাদিত্য বার বার দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। একবার পঞ্চনদে গিয়ে এমনি এক নদীর সঙ্গমে বড় বিপদে পড়েছিলেন তিনি। সামনে অনেকগুলি নদ-নদীর সঙ্গম। দুস্তর জলরাশি। তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কি করে পার হবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সে-সময় তাঁর মন্ত্রী চঙ্কুণ তাঁকে কীভাবে পার করার ব্যবস্থা করল সেও এক মজার কাহিনী। ঈশ্বরভক্ত মোজেস্ যেমন মিশর থেকে প্যালেস্টাইনে

যাবার সময় সমুদ্রের জল দু'ধারে সরে গিয়ে মাঝখানে পথ করে দিয়েছিল এও অনেকটা তাই। আগেরবার যখন সাম্রাজ্যজয়ে বেরিয়েছিলেন তখন ভুখার দেশ জয় করে সেখান থেকে একজন গুণীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সে রস-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিল। মানে তামাকে রূপো করতে বা লোহাকে সোনা করতে জানত। এইভাবে ললিতাদিত্যের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল সে। কাজেই তাকে রাজা সব সময় সঙ্গে রাখতেন। সেই মন্ত্রী চঙ্কুণ এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলো রাজাকে।

তার কাছে দুটো মণি ছিল। একটা মণি জলে ফেলে দিতেই অগাধ জলরাশি দুদিকে সরে গিয়ে পথ করে দিল। রাজা সসৈন্যে পার হয়ে গেলেন অপর তীরে। আবার আর একটা মণির সাহায্যে ঐ মণিটি তুলে নিল চঙ্কুণ জল থেকে। আর মুহূর্তের মধ্যে আবার সঙ্গম-সলিল ফিরে এলো পূর্বের মত। ললিতাদিত্য তখন ঐ মণি দুটি চেয়ে বসলেন মন্ত্রীর কাছে। কিন্তু প্রথমে মণি দুটি কিছুতেই হাত-ছাড়া করতে চায়নি চঙ্কুণ। বার বার বলার পর শেষে এক শর্তে রাজী হয়েছিল। চঙ্কুণ বলেছিল, আমি ইহকালের সম্পদ এই মণি দুটি আপনাকে দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরকালের জন্য কিছু চাই। অর্থাৎ মগধ দেশ থেকে আনীত স্বর্ণ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তির বদলে রাজাকে মণি দুটি দিয়েছিল সে।

কহ্লন বলেছেন, সে মূর্তিটি এত বড় ছিল যে হাতীর পিঠে আনার সময় লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে আনতে হয়েছিল সেটিকে। নাগবংশজাত রাজা ললিতাদিত্য নিজেও অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন, বলেছেন কবি। সর্বকালে সর্বদেশে যেমন হয়ে থাকে, কীর্তিমান কোন পুরুষের কীর্তি-কাহিনীর সঙ্গে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা মিশে থাকবেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। মনে পড়ল এমনি আর একটি ঘটনা।

দেশজয়ে বেরিয়ে পূর্ব সমুদ্রের কূলে পৌঁছেছেন ললিতাদিত্য। সেখানে অসময়ে তাঁর কতবেল খেতে ইচ্ছে হ'ল। সে সময় একজন দেবদূত ওঁকে কতবেল এনে দিয়ে বলল, দেবরাজ ইন্দ্র নাকি এই ফল পাঠিয়েছেন তাঁকে।

ললিতাদিত্য এর কারণ জানতে চাইলে সে জানালো, পূর্বজন্মে রাজা নাকি খুব দরিদ্র ছিলেন। এক কৃষকের বাড়িতে চাকরের কাজ করতেন। সে-সময় দুপুরবেলা যখন মাঠে কাজ করছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ ওঁর কাছে খাদ্য এবং পানীয় ভিক্ষা করে। উনি নিজে না খেয়ে সেই ব্রাহ্মণকে খাইয়ে তৃপ্ত করে-ছিলেন। তাই দেবরাজ ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন যে ওঁর একশত ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

তবে ইতিমধ্যেই অনেকগুলো পূরণ হয়েছে। কাজেই আর বেশি বার অকারণে চেয়ে সে বর চাওয়ার সুযোগ যেন নষ্ট না করেন উনি। একথা বলে চলে গেল দেবদূত

এরপর দেশে ফিরে এসেছেন। একদিন একজন লোক এলো ওঁর কাছে। তার হাত এবং কান কাটা। প্রচুর রক্ত পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে। সে জানালো, রাজা যখন যুদ্ধে গিয়েছিলেন সেই সময় এই লোকটি যে রাজ্যে থাকে সেখানেও গিয়েছিলেন তিনি। নিজের পরিচয় দিল, সে দেশের রাজার মন্ত্রী বলে। সে রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিল, ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করতে। রাজা তাই ক্রুদ্ধ হয়ে এইভাবে শাস্তি দিয়েছে মন্ত্রীকে।

ললিতাদিত্য তাকে আশ্রয় দিলেন। নিজের চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুললেন এবং নিজের মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করলেন তাকে।

তারপর সেই মন্ত্রির পরামর্শে আবার যুদ্ধযাত্রা করলেন সেই রাজাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য। মন্ত্রী বলল, নূতন এক সংক্ষিপ্ত পথে নিয়ে যাবে তাঁকে। কিন্তু সে পথে জলকষ্ট আছে, কাজেই পনেরো দিনের খাদ্য এবং পানীয় জল সঙ্গে নিতে হবে।

রাজা সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু পনেরো দিন পার হবার পরও সে পথ শেষ হ'ল না। জলের অভাবে সকলেই মৃতপ্রায়। সেই মন্ত্রী তখন উল্লাসে নৃত্য করতে লাগল। সে এবার সত্য কথা স্বীকার করল যে, রাজা ললিতাদিত্য তার প্রভুকে পরাজিত করেছে, তারই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে নিজের অঙ্গচ্ছেদ করে তাঁকে প্রতারিত করে এপথে নিয়ে এসেছে। বলে পারবে না, তাই ছলের আশ্রয় নিয়েছে। এবার রাজা সসৈন্যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তার নিজের প্রাণ যায় যাক, তার জন্য দুঃখ নেই!

রাজা ললিতাদিত্যের মনে পড়ল তখন সেই বরের কথা। একটা অস্ত্র দিয়ে মরুভূমির বালু খুড়তেই স্বচ্ছ সলিলের ধারা বয়ে চলল। পরে ধীরে ধীরে সেটা নদীর আকার নিল। এইভাবে রক্ষা পেলেন সেবার। আর ঐ মিথ্যাবাদী মন্ত্রিকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কিন্তু শেষবারে উত্তরাপথে যুদ্ধযাত্রা করে আর ফিরলেন না তিনি কাশ্মীরে। হয়তো ওঁর আর কোন বর পাওনা ছিল না তাই। ওঁর মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা শোনা যায়। কহ্লন বলেছেন, কেউ বলেন উনি ঐ পথেই সশরীরে স্বর্গে গেছেন। কেউ মনে করেন, উনি দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, কিন্তু শেষবারে হয়ত

শত্রুর হাতে পরাজয়ের ভয়ে আগুনে প্রবেশ করে আত্মহত্যা করেছেন। কেউ বলেন, অতিরিক্ত বরফপাতে সসৈন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছেন।

যাই হোক, উনি আর ফিরে আসেননি। তবে ওঁর সঙ্গে কিছুদূর গিয়েছিল, এমন একজন মন্ত্রির সঙ্গে নাকি বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, ওঁর ছেলেদের মধ্যে কাউকে রাজা না করে ওঁর সর্বকনিষ্ঠ পৌত্র 'জয়াপীড়'কে যেন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। তাকেই উনি উপযুক্ত মনে করেছিলেন। আর যে বিশাল সাম্রাজ্য উনি রেখে গেলেন তা রক্ষার জন্য কিছু উপদেশ পাঠিয়েছিলেন।

আমি ভাবছিলাম, ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত সেই পরিহাসপুর নয়ত এটা? বিপুল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বার বার হয়ত এখান থেকেই দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেছেন তিনি। মনে হ'ল শেষবার উত্তরাপথে গিয়েছিলেন হয়ত এখান থেকেই। 'অমরনাথের' পথে 'মহাগুণাম পাশ' পার হয়ে আরো উত্তরে জোজিলা গিরিসঙ্কট, সেই পথেই হয়ত তিনি তিব্বতে পৌছেছিলেন। অত্যন্ত দুর্গম শুনেছি সে পথ। হয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যই প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।

অতিরিক্ত তুষারপাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ। মনে হ'ল, বহু শতাব্দী পরে তাঁর প্রদর্শিত সেই পথেই হয়ত মধ্য এশিয়া থেকে দুর্ধর্ষ কোন যাযাবর জাতি এসেছিল কাশ্মীরে। দুর্গম পথের শেষে প্রথমেই এমন নয়নাভিরাম জনপদ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল তারা। তাই ওঁর প্রিয় পরিহাসপুর ওদের মুখে পহলগাম হ'ল হয়ত। 'পরিহাস' কথার অর্থও ওদের বোধগম্য হয়েছিল কিনা কে জানে!

দূরাগত সঙ্গীতের মত কানে ভেসে এলো দেবারতির ঘণ্টাধ্বনি। মৃদু হলেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সে ধ্বনি। কী এক মোহের সঞ্চার হ'ল মনে। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল ঐশ্বর্যশালী এক নগরীর ছবি। দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্য ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্য জয় করে বিজিত রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই নগরের। লীডারের এক তীরে বিশাল রাজপ্রাসাদের গগনচুম্বী সৌধ চূড়া আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। অসংখ্য মন্দিরের মাঝে পরিহাসকেশব আর রামস্বামীর সুউচ্চ মন্দিরশীর্ষ গর্বভরে মাথা উঁচু করে আছে। অন্যতীরে ভূতেশ মহাদেবের মন্দিরচূড়া গগন স্পর্শ করেছে। দুই তীরে অগণিত হর্ম্যরাজি। রাজপথে সুন্দর সুঠাম কাশ্মীরী যুবা। অলিন্দে গবাক্ষপথে সুন্দরী কাশ্মীরী ললনার অপূর্ব মুখচ্ছবি চকিতে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হচ্ছে। পরিহাসপুর কল্পনায় ধরা দিল আমার চোখে।

কিন্তু এক ভূতেশ মহাদেব ছাড়া আর কোন সাক্ষী তো নেই সেদিনের! কে বলে দেবে এই সেই পরিহাসপুর কিনা?

যেন স্বপ্নের ঘোরে পথ চলছিলাম। হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। অনুভব করলাম পায়ের তলার মাটি যেন আকর্ষণ করছে আমাকে। মনে হ'ল মাটি যেন কথা বলতে চায়। যেন বলতে চায়, একটু দাঁড়াও, শুনে যাও, আমার বুকেই ছিল সেই নগর। সহস্র সহস্র যোদ্ধার বীরদাপে আর তাদের অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে একদিন আনন্দে গর্বে দুলে উঠত আমার বুক।

নিষ্প্রাণ পর্বতগুলো যেন কথা কয়ে উঠল,—আমাদের বুকেও ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'ত তাদের জয়ধ্বনি।

এতক্ষণে লীডারের সেতুর ওপর উঠেছি। দেখি ফেনিল জলরাশি যেন উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ছে। তরঙ্গের মাথায় মাথায় চন্দ্রের প্রতিবিম্ব যেন লক্ষ মাণিক জ্বলছে। জলে হীরে-পান্নার দ্যুতি। নদীর তরঙ্গলহরী মিষ্টি সুরে গান গেয়ে কানে কানে বলে গেল, সেদিনের সে ঐশ্বর্যের ছায়া বুকে নিয়ে আজও বয়ে চলেছি আমি।

আকাশে চোখ তুলে দেখি পাহাড় আর ঝাউবনের মাথায় উঁকি দিয়ে হাসছেন পূর্ণচন্দ্র। যেন বলছেন, আমিও সাক্ষী।

জ্যোৎস্নার বাঁধ ভেঙেছে আজ। সেই আলোকে নদী, পাহাড়, উপত্যকা, ওপারের ঝাউবন সব মিলে পহলগাম নূতন রূপে ধরা দিল আমার চোখে। মনে হ'ল এই সেই পরিহাসপুর। ঠিক চিনেছি আমি। ভুল হয়নি আমার দেখায়।

॥ ২৪ ॥

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তাঁবুর বারান্দায় বসে সবাই মিলে খানিকক্ষণ গল্পগুজব হ'ল। তারপর একে একে উঠে গেল সব ঘুমোতে। আমার উঠতে ইচ্ছে হ'ল না। এ কদিন দুর্যোগের পর এমন সুন্দর জ্যোৎস্না রাত বড় ভালো লাগছে। ঠিক যেন কোজাগরী পূর্ণিমার রাত আজকে। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। বৃষ্টি-বাতাস থেমে যাওয়াতে শীতের তীব্রতাও নেই। বাতাসে বরং একটা মধুর আমেজ আছে, আকাশে পাখীর পালকের মত লঘু শুভ্র মেঘের সঞ্চরণ দেখছিলাম বসে বসে। চাঁদের কিরণে সাদা মেঘের ওপর কে যেন হাল্‌কা রং-এর তুলি বুলোচ্ছে। কোন্ এক চিত্রকর যেন আপন মনে সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাস করছে মেঘের

গায়ে। ভারী ভালো লাগছিল।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম একখণ্ড সাদা মেঘ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে চাঁদের দিকে আর ধীরে ধীরে রং-এর ছোঁয়া লাগছে তাতে। প্রথমে ফিকে জাফরান রং তারপর যেন উজ্জ্বল সোনালী রং ধরল মেঘে। দেখতে দেখতে কেন কী জানি মনে পড়ল কাশ্মীরের ছুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের উপাখ্যান। তাদেরও মনে এমনি করেই বুঝি রং ধরেছিল। ললিতাদিত্যের পিতামহ নাগরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দুর্লভবর্ধন এবং পিতামহী অনঙ্গলেখার অনেকগুলি সন্তান। এক পুত্র মহ্লন অল্পবয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। দুর্লভক নামে আর এক কৃতী সন্তান মা অনঙ্গলেখার ইচ্ছায় মাতামহ বলাদিত্যের নামানুসারে প্রতাপাদিত্য নামেই বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তিনি নিজের নামে প্রতাপপুর নামে এক অপূর্ব নগর নির্মাণ করলেন। সেখানে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে রোহিতক দেশের এক বণিক এলে রাজার সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। রাজা তাঁকে নিজের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন। পরদিন প্রভাতে অতিথির সুনিদ্রা হয়েছে কিনা খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন এমন সুন্দর প্রাসাদেও তাঁর নাকি নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে। কারণ স্বরূপ বণিক জানালেন, প্রদীপের শিখার ধূমের জন্য তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। এরপর সেই বণিক নিজের গৃহে রাজা প্রতাপকে আমন্ত্রণ জানালেন।

রাজার মনে কৌতুহল হ'ল রাজবাড়িতে সুগন্ধি তেলের প্রদীপের ধূমে যার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় তার নিজের গৃহ কেমন তাই দেখার। সেখানে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন একটি মাণিকের প্রভায় আলোকিত হচ্ছে তাঁর গৃহ। পরদিন যখন তিনি তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে পদচারণা করছিলেন, ওপরের অলিন্দে পরমাসুন্দরী বণিক-পত্নীকে দেখে আরও আশ্চর্য এবং মুগ্ধ হলেন তিনি। এমন অপরূপ রূপ তাঁর রাজপ্রাসাদেও নাই। রাজাও অত্যন্ত রূপবান। সেই বণিক-পত্নীও তাই রাজাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। রমণীসুলভ লজ্জায় অবশ্য সরে গেলেন তিনি কিন্তু থামের আড়াল থেকে ঘোমটা তুলে বার বার দেখতে লাগলেন রাজা প্রতাপকে। সেই কয়েক মুহূর্তের চকিত দর্শনেই রূপমুগ্ধ ছুটি তরুণ নরনারীর হৃদয় বিনিময় হয়ে গেল। রাজা প্রাসাদে ফিরেও ভুলতে পারলেন না সেই হরিণ-নয়নাকে।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির রাজা ছিলেন। পরস্ত্রীর প্রতি এই কামনা যে অন্যায় বুঝতে পারছেন সেটা। প্রজার ধর্মাধর্মের বিচার করেন তিনি। নিজে তাই বিবেকের দংশনে জ্বলতে লাগলেন। অথচ ভুলতেও পারলেন না সেই চকিত-নয়নাকে। কাজেই দিনে দিনে কৃশ ও রুগ্ন হতে লাগলেন। ক্রমে শয্যা-

শায়ী এবং মৃতপ্রায় হলেন। অহরহ সেই সুন্দরীর চিন্তা করতে করতে যেন তার স্পর্শও অনুভব করতে লাগলেন তিনি।

রাজার এক মন্ত্রী শুধু একথা জানতে পেরেছিলেন। কি করে সেই বণিকও এ খবর শুনতে পেয়ে ছুটে এলেন রাজার কাছে। নিজে উপযাচক হয়ে রাজাকে অনুরোধ করলেন তাঁর পত্নীকে গ্রহণ করার জন্য। রাজা প্রথমে স্বীকৃত হননি তাঁর প্রস্তাবে।

বণিক-পত্নী নৃত্যপটিয়সী ছিলেন। উপায় হিসেবে সেই বণিক তখন তাঁর পত্নীকে মন্দিরের নর্তকী শ্রেণীভুক্তা দেবদাসী করে দেন। এরপর আর বাধা থাকল না রাজার। রাজা প্রতাপাদিত্য লজ্জা ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন তাকে। সেই নর্তকীর গর্ভে দিগ্বিজয়ী সম্রাট মুক্তাপীড় বা ললিতাদিত্যের জন্ম হ'ল।

আমার মনে হ'ল শুধু রাজা নয়, সেই বণিকের স্ত্রীর মনের অবস্থাও দুজনের দেখা হওয়ার পর এমন হয়েছিল যে বণিক নিজে থেকে ছুটে এসে তাদের মিলনের ব্যবস্থা করলেন। বণিক বুদ্ধিমান এবং হৃদয়বান ছিলেন বলতে হবে। যে মেয়ের মন অন্যের প্রতি আকৃষ্ট, যতই সুন্দরী হোক না কেন তাকে নিয়ে ঘর করা শুধু বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতে পারে? কিন্তু সেই বণিক-পত্নী এমন হৃদয়বান স্বামীকে ছেড়ে গেল কি করে? চোখের নেশা কি এতই বড়? নাকি কোন-দিনই স্বামীকে ভালোবাসেনি সে? তবে কি রাজরাণী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তার মনের কোণে? অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করে এলো মনে।

মনে পড়ল এমনি দৈবাৎ দেখা হয়েছিল যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে রূপসী মেহের-উন্নিসার। মেহেরউন্নিসার মনেও বোধ হয় প্রেমের চেয়েও বড় ছিল উচ্চাশা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পাশে সিংহাসনে বসার আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছিল মনে বহুদিন ধরে। আর সেলিম এতই পাগল হয়েছিল মেহেরউন্নিষার রূপে যে সিংহাসন লাভ করার পর তার পূর্ব স্বামীকে গুপ্তহত্যা করাতেও দ্বিধাবোধ করেননি। যে ভাবেই হোক দীর্ঘদিন পর লাভ করেছিলেন প্রেয়সী নূরজাহানকে।

যদিও এক প্রকৃতি নয়, তবুও মনে হ'ল রাজা প্রতাপাদিত্য আর সেলিম দুজনেই প্রেমিক ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু পুত্র ললিতাদিত্য কি মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা? কাশ্মীরের অধিপতি হয়েও তিনি সুখী বা সন্তুষ্ট হননি। সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট বা রাজচক্রবর্তী হবার আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে। হয়তো এই প্রেরণাতেই বার বার দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন তিনি। কিন্তু পিতা প্রতাপাদিত্যের মত রাজধর্ম-বোধ তো ছিল না

তাঁর! না হলে রাজা হয়ে বিগ্রহ সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন কি করে?

মনে হ'ল পৌত্র জয়াপীড়ের মধ্যে নিজের স্বভাবের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন বলেই বুঝি তাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেছিলেন।

ওপারের প্রাগৈতিহাসিক বিগ্রহ দেখার পর থেকে আমি যেন নূতন চোখে দেখতে শুরু করেছি পহলগামকে। মনে মনে ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে মিলিয়ে নিচ্ছি যেন। হাসি পেলো আমার। তাকিয়ে দেখি চাঁদ মাঝআকাশে উঠে এসেছে। ঘুমুতে যাবার আগে আর একবার ভালো করে দেখে নিলাম পহলগামকে।

॥ ২৫ ॥

সকালে ঘুম ভেঙে মনে হল আজ ওদের অমরনাথ গুহা থেকে ফেরার কথা। কাল সকালের দিকে দর্শন সেরে নিশ্চয়ই বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসেছে। আজ দুপুর বা বিকালের দিকে যে-কোন সময় এসে যাবে ওরা। বাইরে তাকিয়ে দেখি বেশ ঝলমলে রোদ উঠেছে। খুশীমনে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। কাল বেশী রাতে ঘুমিয়েছি বলে আজ আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে। এদিক-ওদিক চেয়ে নীলিমাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। মোহন ওপাশে কি করছিল, একগাল হেসে এগিয়ে এলো। পাহাড়ের ওপরদিক দেখিয়ে বলল, সবাই ওদিকে বেড়াতে গিয়েছে মাইজী।

বুঝতে পারলাম, ঘুমিয়ে ছিলাম বলে আমাকে আর ডাকেনি। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিয়ে বললাম, চল আমরাও বেড়িয়ে আসি।

কি ভেবে সঙ্গে ক্যামেরাটা নিলাম। ওপরে কোন্ দিকে গিয়েছে ওরা জানি না। তাই নদীর দিকে নীচে নামলাম আমি। এদিকের পথে লোকজন বিশেষ নেই। লীডারের কাছে এসে দেখি বেশ কিছু ধোপা কাপড় কাচছে, কিন্তু নদীতে নয় পাড়ের ওপরেই। নানা রংএর কাপড় কেচে ঘাসে-ছাওয়া জমিতে শুকোতে দিয়েছে। এরাও রং-বেরংএর কাপড়জামা পরা মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে মিলে বেশ একটা দঙ্গল। একটু দূরে নদীর বাঁকে সবুজ ধানক্ষেত। সব মিলিয়ে বেশ লাগছে দেখতে। আমি ওদেরই দেখছিলাম লক্ষ্য করে। এই শীতের দেশে সকাল বেলাই কেমন জলের কাজ করছে তাই।

হঠাৎ মোহন 'ইদ্‌রি মাইজী, ইদ্‌রি' বলে খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার মনযোগ আকর্ষণ করে এক জায়গায় টেনে নিয়ে গেল। দেখি জলভরা একটা ছোট ডোবা মত। বর্ষাকালে বাংলাদেশের মাঠে-ঘাটে বৃষ্টির জলভরা এমনি খানা-খন্দ হামেশাই চোখে পড়ে। এটা দেখানোর কি তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকালাম। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, কি ইদ্‌রি-বিদ্‌রি বকছিস ?

আমাকে বিরক্ত হতে দেখে প্রথমে ও একটু যেন দমে গেল। কিন্তু মুহূর্তেই সে ভাব কেটে গেল ওর। এবার নূতন উৎসাহে বলে উঠল, চশমা, ইদ্‌রি চশমা মাইজী ! জলের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল নীচে থেকে জলের বুদ্‌বুদ্ উঠছে।

এবার বুঝলাম, এটা ডোবা নয়। এর নীচে প্রস্রবণ আছে। প্রস্রবণকেই তাহলে চশমা বলে ! আমি হেসে বললাম, এখান থেকেই খাবার জল নিয়ে যাচ্ছিস নাকি ?

ও লজ্জিত হয়ে জিব কাটল।—নেই মাইজী, উতো উদ্‌রি হ্যায়, বলে পাহাড়ের ওপরদিকে দেখালো।

যদিও জানি এরকম নোংরা জল নিশ্চয়ই খাবার জন্য নিয়ে যায় না। আমরা যে জল খাই তা বেশ পরিষ্কার টলটলে, খেতেও মিষ্টি, তবু ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যই বললাম কথাটা। মোহনই আমাদের খাবার জল নিয়ে আসে। আর স্নান বা অন্য প্রয়োজনীয় জল ভারে করে নদী থেকেই বোধ হয় নিয়ে যায় আর একটি লোক। নীচে থেকেই জল নিয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু মোহনকে আমি যতবার জিজ্ঞেস করেছি, কোত্থেকে জল আনিস, ও আমাকে বুঝিয়েছে, উদ্‌রি আচ্ছা চশমা হ্যায় মাইজী। জলের সাথে চশমার কি সম্পর্ক ? ভালো করে বুঝতে পারিনি ওর কথা তাই ধমক দিয়েছি, চশমা মানে যে প্রস্রবণ এতক্ষণে জানলাম সেটা।

জলে হাত দিয়ে দেখি এ জল অত ঠাণ্ডা নয়। বুঝলাম নদীর জলে না নেমে তাই ওপরেই কাপড় কাচছে ধোপারা।

আমার কৌতূহল দেখে মোহন আরো কত কিছু বলে যাচ্ছে তখন। দূরে পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে বলল, ওধারে নাকি এমন সুন্দর চশমা আছে, যার জল এত ভালো যে বহু লোক যায় সেখানে দেখতে। বহু সাহেবসুবোও আসে। সে জল খেলে নাকি কোন রোগবালাই থাকে না ইত্যাদি। মন দিয়ে ওর সব কথা শুনিনি। পরে শ্রীনগর থেকে চশমাসাহীতে গিয়ে অবশ্য মনে হয়েছিল ঠিকই বলেছিল ও। আমি বরং ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কাল ওপারে মন্দিরের সামনেও তো এমনি জলের কুণ্ড ছিল ! তখন কেন কিছু বলিসনি ? আজ তো খুব খই

ফুটছে মুখে। ও একটু হেসে চুপ করে থাকল। আর কিছু বলল না। বুঝলাম কাল সকলের সঙ্গে গিয়েছিলাম, ও সুযোগ পায়নি এত বকবক করার। আজ একা ওর সঙ্গেই এসেছি। সব কিছু দেখানোর দায়িত্ব আজ ওর। ও আমার গাইড আজকে।

কিন্তু নদীর এত কাছে এরকম প্রস্রবণ আছে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে আমি নদীর কিনারায় গেলাম, এখান থেকে কতটা নীচে নদীর জল তাই দেখতে। সেখানে আরো বিস্ময় জমা হয়েছিল আমার জন্য। খাড়া উঁচু পাড়ের জন্য তফাৎ থেকে দেখা যাচ্ছিল না এতক্ষণ। কাছে যেতেই চোখে পড়ল, একেবারে নির্জন নদীর ঘাটে দুটি বাচ্চা মেয়ে পাথরের ওপর বসে। বড় মেয়েটির বয়েস বছর আট-নয় হবে। একটি বছর তিনেকের মেয়ের মাথায় সাবান দিয়ে স্নান করাচ্ছে। অতিরিক্ত ময়লার জন্য বোধ হয় সাবানে ঠিক সুবিধে হচ্ছে না। আঠা হয়ে গেছে চুল। একখানি ছোট কাঠের চিরুনি, যাকে আমরা কাঁকই বলি, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখি, তাই দিয়ে ছোট বোনের মাথা আঁচড়িয়ে চিরুনি থেকে চেঁছে ময়লা ধুচ্ছে জলে। ময়লা পরিষ্কার করার সহজ উপায় হিসেবে চিরুনি নিয়ে বসেছে। একমনে কাজ করে চলেছে। আমরা যে দেখছি সেদিকে খেয়াল নেই।

কিন্তু উপায়টা সহজ হলেও কাজটা অত সহজে হচ্ছে না। বাঁ হাতে চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে তবে ঐ জটপাকানো-আঠা ঘন চুলের ভেতর থেকে চিরুনি গায়ের জোরে টেনে ছাড়াতে হচ্ছে। বাচ্চা মেয়েটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বড়টির গায়ে তবু একটা সুতীর জামা আছে। মাথা পরিষ্কারের এই অপূর্ব পদ্ধতি, নদীর ধারের ঠাণ্ডা হাওয়া বা ঐ বরফ-গলা জল, কোনটাতেই বাচ্চাটির কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হ'ল না। কান্নাকাটি নেই। বেশ নির্বিকারভাবে শান্ত হয়ে বসে আছে। খুশী-খুশী মুখ। মুখ দেখে মনে হ'ল বরং এটাকে স্নান-স্নান খেলাই মনে হচ্ছে ওর। কিন্তু মায়ের কাছে স্নান করতে এই মেয়েই হয়ত কেঁদে হাট বসাতো।

আমি ঐ আট-নয় বছরের মেয়ের দিদিগিরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম বেশ খানিকক্ষণ। সাতসকালে ছোট বোনটিকে স্নান করাতে ঘাটে নিয়ে এসেছে। মনে হ'ল কী কাজের মেয়ে রে বাবা! টন্‌টনে কর্তব্যজ্ঞান! বড় হলে পাকা গিন্নী হবে ঠিক। ভারী মজা লাগল। তাই আমি আমার ক্যামেরায় ওদের ধরে রাখবার জন্য একটি ছবি নিলাম। দিদিটির কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। ও এখনও একমনে বোনের মাথায় কেশ-সংস্কারে ব্যস্ত। কিন্তু ছোটটি ক্যামেরা দেখেই উৎসুক হয়ে তাকালো আমার দিকে।

ছবি নিতে দেখে মোহনের মুখখানাও গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবার আরো একটু কাছে গিয়ে বড় মেয়েটির সঙ্গে নিজেদের ভাষায় ওকে কথা বলতে দেখে মনে হ'ল, ও যেন নিজের পোজিশান সম্বন্ধে মেয়েটিকে একটু জ্ঞান দিচ্ছে, ও আমার সঙ্গে ঘুরছে, আর আমি যে কেউকেটা নই এটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে বার বার আমার ছবি তোলার যন্ত্রটিকে দেখাচ্ছিল ওদের। বড় মেয়েটিও এবার অবাক হয়ে দেখতে লাগল আমাকে।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। এবার তাঁবুতে ফিরতে হয়। তাই মোহনকে তাড়া দিলাম আমি। না হলে ও আরো কিছুক্ষণ মাতব্বরি করত ওদের ওপর।

এখান থেকে তাঁবু দেখা যাচ্ছে। পাহাড় যেখানে নদীর মতই বাঁক নিয়েছে, ওপরের দিকে ঠিক সেই বাঁকের মাথায় প্রথমেই আমাদের তাঁবু চোখে পড়েছে। ঠিক তার নীচের ধাপেই কুণ্ডু স্পেশালের তাঁবুগুলো। যত সহজে নেমে এসেছি ওপরে ওঠাটা তত সহজ নয়। তবু একটু তাড়াতাড়ি করছি। তাঁবুতে কেউ নেই। ওরাও ফিরল কিনা কি জানি। কিন্তু কুণ্ডু স্পেশালের তাঁবুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হ'ল কালকের ঐ ভদ্রমহিলা কেমন আছেন একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। পাশ দিয়ে যাচ্ছি, একটু ঘুরেই যাই। মনে হতেই ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

দেখি উনি স্নান সেরে ভিজে কাপড় মেলছেন, আর একটি সাতাশ-আটাশ বছরের ছেলে মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে সামনে, তার সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁবুগুলোর চারিধার কানাত দিয়ে ঘেরা। উনি তারই গায়ে কাপড় মেলছিলেন।

আমি জিজ্ঞেসা করলাম, কেমন আছেন মাসীমা? আপনাকে দেখতে এলাম।

উনি একটু ম্লান হেসে জবাব দিলেন, ভালই আছি মা। ঐ দেখ নরেন ফিরে এসেছে দর্শন সেরে। ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি ছেলেটিকে। উস্কোখুস্কো চেহারা। একমুখ দাড়ি। পরনে গেরুয়া রং-এর জামা-কাপড়। ধুলো-মাখা পায়ে ঐ রংয়েরই কেড্‌স জুতো। পাশে লাঠিখানা পড়ে আছে, বোধ হয় একটু আগেই এসে পৌঁছেছে।

আমি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তুমি তো দর্শন করেই ফিরছ? কেমন দেখলে বল ত?—ওর সঙ্গে একটু গল্প করার লোভ সামলাতে পারলাম না আমি।

কিন্তু পথের ক্লান্তি ওর সর্বাঙ্গে। বোধ হয় মনেও। কাজেই কি দেখেছে সে কথা বলার কোন উৎসাহই নেই দেখলাম। শুধু বলল, এবার পূর্ণলিঙ্গ দর্শন হয়নি দিদি। আগেই গলে গেছে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। একটু মনঃক্ষুণ্ন মনে হ'ল ওকে। এত কষ্ট করে যে স্ফটিক-স্বচ্ছ তুষারলিঙ্গের পূর্ণ মূর্তি দেখবে আশা করেছিল, যাত্রাশেষে গুহায় পৌঁছে তাঁর দর্শন পায়নি। হতাশ হয়েছে। কি বলব ভাবছি; কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই ওদিক থেকে মাসীমা বলে উঠলেন,—এইজন্যই পাঁজি-পুঁথি দেখে আগের দিনে তীর্থযাত্রা করার নিয়ম ছিল মা। এবারে যে মলমাস ছিল! যে বছর মলমাস থাকে সেবার তীর্থদর্শনে ফললাভ হয় না বলে লোকে সে বছর তীর্থে যেত না। আমরা তো তা মানি না। ভাবি যে গেলেই দর্শন হবে। বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ছেলেটি কিন্তু মাসীমার কথা মানতে রাজী হ'ল না। বলল, এক মাস আগের পূর্ণিমায় মলমাসের মধ্যে গেলেই বরং পূর্ণলিঙ্গ দর্শন হ'তে—দেরি হবার জন্য গলে গিয়েছে। পাহাড়ে বর্ষা নেমে পথঘাটও আরো দুর্গম করে তুলেছে। এক মাস আগে এলে এত কষ্টও হ'ত না যাত্রীদের।

মাসীমা হয়ত আশা করেছিলেন মলমাস কিংবা পাঁজির কথায় আমিও ওঁকে সমর্থন করেই কিছু বলব। কারণ দুজনের একই দশা তো! দুজনকেই দর্শন না করেই ফিরে আসতে হয়েছে। আমার একটু দুঃখ হ'ল ওঁর জন্য। কিন্তু প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার জন্য নরেনকে বললাম, এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কি করে?

ও এবার হেসে জানালো, এবারই কেদার-বদরী গিয়েছিল পায়ে হেঁটে। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরেই আবার এসেছে এই তীর্থে। কাজেই পাহাড়ে হাঁটতে ও এখন পাহাড়ীদের মতই মজবুত। বলল, হিমালয়ের সবগুলো তীর্থ ঘুরব মনে ভেবেছি। আবার নূতন উৎসাহে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ-চোখ। দেখে মনে হ'ল সত্যি ও হিমালয়ের ডাক শুনতে পেয়েছে। তাই এই ঘরছাড়া ছেলেটিকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে তীর্থের দুর্গম পথ।

বললাম, এখন তুমি বিশ্রাম কর। পরে একসময় এসে তোমার সঙ্গে গল্প করব আমি।

নরেন খুশী হয়ে মাথা নাড়ল।

ফেরার পথে ভাবছিলাম মনে মনে এবার কারো পূর্ণলিঙ্গ মূর্তি দর্শন হয়নি বলে মাসীমা যেন সান্ত্বনা পেয়েছেন কিছুটা। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তোমারও কি তাই? মন ঠিক সায় দিল না। শুধু দেবদর্শন নয়, আরো অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার মনে। না যেতে পেরে বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু কাল সন্ধ্যায় তো সে খেদ মুছে গেছে আমার মন থেকে! তাঁবুতে ঢুকতেই প্রমীলা ছুটে এলো ওধার থেকে।—কোথায় গিয়েছিলেন দিদি?

মোহনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, আপনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন, আমরা কি সুন্দর জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম আজ! আমাদের সঙ্গে গেলে আপনার খুব ভাল লাগত।

আমি একটু হেসে মোহনের দিকে ফিরে তাকালাম। আমরাও কত কি দেখেছি, না রে? আহ্লাদে গদগদ মোহন। ওর সঙ্গেই তো গিয়েছি।

আমি যে কুণ্ডুদের তাঁবুতে গিয়েছিলাম, অমরনাথ থেকে ফিরে এসেছে একজন, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে সেকথা আর বললাম না। অজিত ঠাকুরপো অমরনাথ গিয়েছে মণ্টুদের সঙ্গে। প্রমীলা ভাবতে থাকবে এরা কেন এখনও ফিরল না। সেদিন শেষনাগ-ফেরতা ঘোড়ার সহিসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাও ওকে বলিনি। এমনিই ও খুবই দুশ্চিন্তায় আছে।

। ২৬ ।

সারা দুপুর আজ আর কারো চোখে ঘুম নেই। সবাই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ঘর-বার করছে কখন ওরা ফিরে আসে তাই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল, তাও ওদের পাত্তা নেই।

চা খাবার পর তাঁবুর বাইরে বসে সবাই জটলা করছি এমন সময় ওপরের দোকানগুলোর পেছন দিয়ে ওদের তিন মূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে আসতেই আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম, অনেকক্ষণ ধরে তোমাদের আশা করছিলাম!

অসিত ঠাকুরপো বলল, আরো একটু আগেই আসতাম। কিন্তু তোমরা যে কোথায় আড্ডা গেড়েছ বুঝতে না পেরে একটু খোঁজ করছিলাম, তাই দেরি।

শুনলাম ওদের ওভাবে ঘুরতে দেখে একজন ঘোড়াওয়ালা নাকি আমাদের আস্তানা দেখিয়ে দিয়েছে। বুঝলাম সেই লোকটিই হয়ত। যার সঙ্গে সেদিন, আমি কথা বলেছিলাম। বললাম, পরে কথা হবে। এখন একটু বিশ্রাম করে স্নান-খাওয়া কর।

খেতে বসে ওদের কি আনন্দ! যা খাচ্ছে তাই নাকি অমৃত মনে হচ্ছে। এ কদিন প্রায় অনাহারে কেটেছে। একদানাও ভাত পড়েনি পেটে। সন্ধ্যের পর জমিয়ে আসর বসল। গুহায় ওঠার পথে যে পথটুকু ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে উঠতে হয়, অজিত ঠাকুরপো নাকি শুয়ে পড়তে চাচ্ছিল। কোরামিন দিয়ে চাঙ্গা করেছে ওকে। দুজন ঘোড়ার সহিস দুদিক থেকে হাত ধরে টেনে তবে ওপরে তুলেছে। তাই নিয়ে হাসাহাসি করছিল মণ্টু আর অসিত ঠাকুরপো।

অজিত ঠাকুরপো ওদের হাসাহাসিকে আমল না দিয়ে বলে উঠল, কিন্তু ওপরে উঠে আমি একদম fit, কেমন ভিড় ঠেলে গুহার ভেতরে ঢুকে পূজো দিলাম আবার তোমাদের জন্য পূজোর নির্মাল্য আর অমরনাথের স্নানগঙ্গা ধরে নিয়ে এসেছি দেখ। কোটের পকেট হাতড়ে একটা এ্যালুমিনিয়ামের শিশি আর নির্মাল্য দিল আমার হাতে। শিশিটা যাবার সময় আমিই দিয়েছিলাম ওকে।

হাত পেতে নিয়ে বললাম, আমাদের কথা মনে রেখেছিলে ওখানে গিয়েও এজন্য খুশী হয়েছি আমরা, কি বলিস প্রমীলা?

প্রমীলা খুশী হলেও একটু রাগ দেখালো। বলল, আপনার ঠাকুরপো নিয়ে গেল না তো সঙ্গে! নিজেই পুণ্যি করে এলো!

আমি জানি ওর চাপা অভিমানের কথা। চন্দনবাড়ি থেকে মেয়েদের আর নিয়ে যাওয়া হবে না ঠিক হবার পর অনিলদা আর খেলুভাই দুজনেই আমাদের সঙ্গে ফিরে এলো। কিন্তু অজিত ঠাকুরপো চলে গেল ওদের সঙ্গে। প্রমীলাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না হয়তো। কিন্তু নিজেও না যেতে পারত তো! অজিত ঠাকুরপো অবশ্য বলেছিল, ও নিজের জন্য যাচ্ছে না। মণ্টু আর অসিত ঠাকুরপোকে পথে দেখাশোনার জন্যই ও যাচ্ছে। দুজনেই ছেলেমানুষ। এই দুর্যোগে ওদের একা ছাড়া ঠিক নয়। যাই হোক, এই দুর্যোগের জন্য সব চেয়ে বেশী চিন্তা হয়েছে প্রমীলারই। মুখে অবশ্য কিছু বলেনি। আজ তাই ওর কথা শুনে মনে মনে হাসছিলাম।

অজিত ঠাকুরপো ভাবল অল্পের ওপর দিয়েই ফাঁড়া কাটল বুঝি, তাই হাল্কা মেজাজে ওকে একটু রাগানোর জন্য বলতে যাচ্ছিল—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য…

কিন্তু কথাটা ওকে আর শেষ করতে না দিয়ে রাগে জ্বলে উঠল প্রমীলা—নইলে ঝামেলা বাড়ে কি বল!

কি ভেবে 'খরচের' কথাটা আর মুখে আনল না।

বোধ হয় মনে পড়ল খরচ যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে।

প্রমীলার এতটা রাগ দেখে অজিত ঠাকুরপো হয়তো বুঝল যে কথাটা বেফাঁস বলে ফেলেছে। তাই ওকে শুনিয়ে আমাকে মধ্যস্থ রেখে বলল,—এবার পূর্ণলিঙ্গ দর্শন হ'ল না। আর যা দুর্গম রাস্তা তোমরা যেতেই পারতে না শেষ পর্যন্ত। শুনলে তো আমার কি অবস্থা হয়েছিল। সহিস দুটো টেনে হিঁচড়ে ওপরে না তুললে আমারও দর্শন হ'ত না। তোমাদের অবস্থা কি হ'ত বল তো?

ওর স্বীকৃতি শুনে সবাই হেসে উঠলাম আমরা। কারণ চন্দনবাড়ি থেকে যাবার দিনে প্রমীলা বারণ করেছিল বুঝি যেতে—সেকথা ঠিক জানি না। তবে রওনা হবার মুখে ঘোড়ায় চেপে যাবার সময় বাহাদুরি করে ওকে বলতে শুনেছি—এক হাতে সিগারেট আর এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে অনায়াসে ঘুরে আসবে অমরনাথ থেকে, কিচ্ছু ভয় নেই আশ্বাস দিয়েছে প্রমীলাকে।

কিন্তু যতই বাহাদুরি করুক পথে যেতে যেতে নিশ্চয়ই মনে হয়েছে কাজটা ঠিক হয়নি। তাই ওকে খুশী করার জন্য নির্মাল্য আর চরণামৃত নিয়ে এসেছে। সেটুকু বুঝতে দেরি হয়নি আমার। এই স্বীকৃতিও ওর মন পাবার জন্যই।

বললাম—তোমার বীরত্ব বোঝা গেল। তোমার মত অবস্থা আমাদেরও হ'ত ধরেই নিয়েছ বুঝি? হলে আমাদেরও যা হোক ব্যবস্থা হ'তই। প্রমীলা নরম হয়েছে একটু, তবু আরো একটু খোঁচা দিতে ছাড়ল না—নাকি পুণ্যের লোভে মাঝ পথে আমাদের ফেলে দিয়েই চলে যেতে?

এবার অজিত ঠাকুরপোর মুখখানা দেখার মতই হ'ল। বুঝলাম প্রমীলার রাগ এখনও যায়নি। বেচারা অজিত ঠাকুরপোর জন্য মায়া হ'ল। তাই কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যই বললাম—কাল রাতে কোথায় ছিলে তোমরা?

অন্য কথায় আসতে পেরে ও বেঁচে গেল যেন। বেশ রসিয়ে এবার গল্প শুরু করল। সারাদিন পথশ্রমের পর 'যোজাপালে' কি ভাবে রাত কাটিয়েছে, ভাগ্যিস শুকনো খাবার তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই চিবিয়ে কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়েছে। নইলে কী যে হ'ত! বলল, এখন কদিন একটু ভালো-মন্দ খাবার ব্যবস্থা কর দেখি।

প্রমীলাকে বলল,—দেখছ না, এ কদিনের উপোসে শরীর একেবারে কাহিল!

আমি হেসে বললাম, এখন আর মোটেই কাহিল দেখাচ্ছে না যতই চেষ্টা কর মুখের চেহারা করুণ করার।

হেসে উঠল প্রমীলা। তবু ফোড়ন কাটল, এমন পেটুক দেখিনি আর। কেবল খাবার কথা।

এ কদিনের দুশ্চিন্তার পর আজ ও বড় নিশ্চিন্ত। আমাদের তাঁবুর খানিকটা ওপাশে ওদের একটা ছোট তাঁবু খাটানো হয়েছে। পাহাড়টা এখানে ঢেউ খেলানো হয়ে নীচের দিকে ঢালু হয়েছে। নীচে নামার পথ এপাশ দিয়েই। ওরা তিনজন ঘুমুতে চলল। খেলুভাই আর অনিলদাও চলল পিছে পিছে। অজিত ঠাকুরপো ভালোমানুষ। তাই ওকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা চলছে ওদের। এখান থেকেই ওদের হাসির হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে। ওরা ফিরে আসায় আজ সবাই নিশ্চিন্ত।

হালকা মনে হাসি-গল্পে যোগ দিতে ওদের ছোট তাঁবুতে আমরাও গিয়ে ভিড় করলাম। ওরা তিনজন লেপের তলায়। অসিত ঠাকুরপোর খাটটা দোরের সামনেই। আমাদের দেখে ও উঠে বসে জায়গা করে দিল বসার। আসর আরো জমে উঠল। খুঁটিনাটি নানা প্রশ্ন করছি, পথের গল্প শোনার আগ্রহ। অসিত ঠাকুরপো একসময় বলে উঠল, এবার তো দেখে এলাম সামনের বার তোমাদের নিয়ে যাব আমি। কত বুড়ো-বুড়ী গিয়েছে দেখলাম। তোমরাও যেতে পারতে ঠিক। বললাম, এখনও বিয়ে-থাওয়া করনি ভাই, তাই বৌদিদের ওপর একটু দরদ আছে দেখছি। তুমি যে নিয়ে যাবে বলেছ, এতেই আমরা খুশী।

প্রমীলা ওকে একটু রাগাবার জন্যই বলল, তোমাকে আর কি বলব, তোমার ছোড়দা তো বউ ফেলেই চলে গেলেন।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে অসিত ঠাকুরপো বলে উঠল, সত্যি বলছি আগে জানলে আমি তোমাদের নিয়েই যেতাম। কি আর হ'ত! কত লোক তো গিয়েছে দেখলাম।

ফুলুদি আর নীলিমা ওপাশে বসে মুখ টিপে হাসছিল এতক্ষণ। এবার মুখ খুলল ফুলুদি। চোখ পাকিয়ে ধমক দিল, খুব তো বলছ এখন, যাবার আগে একবার জিজ্ঞেস করেছিলে আমাদের, যেতে পারব কিনা বা যেতে চাই কিনা?

নীলিমাও সায় দিল।

ওর মুখ দেখে আমি হেসে ফেললাম।—কাশ্মীরে বেড়াতে এসে খুবই আরামে রেখেছ সেকথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তীর্থে যেতে হলে আর তোমাদের

সঙ্গে নয়। কোন স্পেশাল-টেশালের যাত্রী হয়েই আসব আমরা।

অসিত ঠাকুরপো ধুপ করে শুয়ে পড়ে লেপ টেনে নিল।

রাত হয়েছে এবার ঘুমোও—বলে আমরা চারজন হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছি তাঁবু থেকে, পেছন থেকে অনিলদার হাসি শুনতে পেলাম।—অসিতকে বেকায়দায় পেয়ে খুব ঠুকেছে বৌদিরা।

খেলুভাই একেবারে চুপচাপ। ওর কোনো মন্তব্য শোনা গেল না।

॥ ২৭ ॥

আজ কদিন হ'ল পহলগাম এসেছি। দুপুরে বিশ্রামের সময় রোজই আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁবুর বাইরে বসে থাকি। তাঁবুর সামনেটা ঘাসে-ছাওয়া ছোট লনের মত। কদিনের বৃষ্টিতে ঘাসগুলো আরো সবুজ, আরো সুন্দর হয়েছে। কচি কচি ধানের চারার মত বড় হয়ে উঠেছে। একটু বাতাসেই দোলা লেগে শিরশিরিয়ে ওঠে। সামনে অনেক নীচে সবুজ উপত্যকা আর নদী। ওপারের পাহাড়ে ঝাউবন। আকাশে সাদা খণ্ডমেঘের দল পালতোলা নৌকোর মত সারি সারি ভেসে চলে। বেশ লাগে দেখতে।

পাহাড় ধাপে ধাপে নীচে নেমেছে। ওপাশটায় বাঁক নিয়েছে তাই আমাদের তাঁবুর সামনের এই জমিটুকু গোল হয়ে ঝুল-বারান্দার মত একটু সামনে এগিয়ে গেছে। নীচের ধাপেই কুণ্ডুদের তাঁবু। কিন্তু ওপাশের রাস্তায় না নামলে সেটাও চোখে পড়ে না। এদিকেও পাহাড়ের গায়ে একটা খাড়া পথ আছে। আগে দেখতে পাইনি। সেদিন প্রথম টের পেলাম সেটা। আমি বসে আছি, দেখি সামনে থেকে শুধু একটা কাপড়ের গাঁঠরি উঠে আসছে। প্রথমে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। পরে অবশ্য গাঁঠরির মালিক ফেরিওয়ালাও উঠে এলো। একেবারে কিনারায় না গেলে এদিকে যে কোন পথ আছে বোঝাই যায় না। অবশ্য এ পথে একমাত্র পাহাড়ীরাই যাতায়াত করতে পারে। এটাকে পথ না বলে পথের চিহ্ন বলাই ভালো। কোন রকমে পাহাড়ের গায়ে একটা করে পা রাখার জায়গা। তাও অনেকটা তফাতে একটা করে ধাপ। মনে হয় ফেরিওয়ালাটি নীচের তাঁবুতে জিনিস বেচে সোজা ওপরে উঠেছিল। এখানেও কিছু বেচবে আশায়।

কাশ্মীরে এসেছি সবার জন্য কিছু নিয়ে যেতে হবেই। সকাল থেকে এমনি একজন নয় বহু ফেরিওয়ালার আনাগোনা চলে। ফুল, ফল, শাল, কার্পেট সব কিছু তাঁবুতে বসেই দেখি। মাথায় করে নিয়ে আসে ওরা। জানায় বাজারে দাম বেশী। ওদের কাছে কিনলে সস্তায় পাবো। ঠকতে হবে না। কিন্তু আমাদের ছেলেদের ফেরিওয়ালা এলার্জি। দেখলেই চটে যায়। বলে, সব কিছুই নাকি দাম বেশী ওদের কাছে। কোন্ জিনিসের ঠিক কত দাম জানা নেই তো! কাজেই কিনতে সাহস হয় না।

প্রথম প্রথম ওদের ডেকে দেখতাম জিনিসগুলো। এখন আর দেখি না। না দেখেই ফিরিয়ে দিই। তবু ওদের আসার বিরাম নেই। শুধু একবার দেখবার জন্যই কত অনুরোধ। মোহন সেদিন এক ফেরিওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে এলো আমার কাছে। দেখি ছোট ছোট গোল ফল আছে ঝুড়িতে। সবুজ রং। কি ফল এগুলো বুঝতে না পেরে মোহনের দিকে তাকালাম।

ও বলল, এগুলো কাঁচা আখরোট।

কাঁচা আখরোট খাইনি কোনদিন। কাজেই কেনার উৎসাহ ছিল না। কিন্তু মোহন বার বার বলাতে কিনতে হ'ল। লোকটির ফ'লের ঝুড়িতেই ছুরি ছিল। একটা ফল কেটে দেখালো ভেতরে সাদা ধবধবে শাঁস। কিনলাম খানিকটা। মোহনই সুন্দর করে ছাড়িয়ে খেতে দিল। খেয়ে দেখি শুকনো আখরোটের চেয়ে ঢের ভালো। ভারী সুন্দর খেতে। কোন কোন শুকনো আখরোট বরং বিশ্রী লাগে অনেক সময়।

সেই থেকে এই ফেরিওয়ালা এলে ওকে আর ফেরানো হয় না। আর দুপুরে বিশ্রামের সময়ে আখরোট ছাড়ানো মোহনের একটা বাঁধা কাজ। তবে গল্প করার এবং শোনার লোভেই অবশ্য এ সময় আখরোট ছাড়াতে বসে। দু'চারটে ছাড়িয়ে আমাকে খুশী করে দেয়, তারপরেই গল্প শোনার বায়না ধরে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ও আখরোট ছাড়াচ্ছে। আমি লক্ষ্য করে দেখছিলাম ওকে। যেদিন থেকে এসেছি ওকে এই একই পোশাক পরতে দেখছি। সাদা ময়লা একটা ঢিলে আংরাখায় গলা থেকে প্রায় পা অব্দি সর্বাঙ্গ ঢাকা। সুন্দর ঢলঢলে মুখখানা শুধু চোখে পড়ে। দেখে দেখে ভাবছিলাম এমন সুন্দর রং, যা শুধু ফুলের সঙ্গেই তুলনা করা চলে, আর এমন সুশ্রী মুখ—এ ছেলে বুঝি রাজার ঘরেই মানায়। এখানে আসার আগে আমার ধারণা ছিল কাশ্মীরী মাত্রেই বুঝি

এমনি সুন্দর। কিন্তু তা তো নয়। আর একটি লোক যে আমাদের কাজ করছে সে তো একটুও সুন্দর নয়। বরং কুৎসিতই বলা চলে।

হঠাৎ ওকে প্রশ্ন করলাম, হ্যাঁ রে, একদিনও জামা ছাড়তে দেখলাম না, স্নান করিস না বুঝি ?

মোহন উত্তর না দিয়ে হাসে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে।

আমি বলি, আমরা গরম দেশ থেকে এসেও রোজ স্নান করি এই শীতে, আর তুই এখনই স্নান বন্ধ করেছিস, শীতের সময় যখন বরফ পড়ে তখন কি করিস বল তো ?

এবারও হাসে। পরে উত্তর দেয়, আংরাখার ভেতরে বুকের কাছে একটা আগুনের মাল্‌সা ঝুলিয়ে রাখে গলা থেকে।

আমি অবাক হই ওর কথায়। ভয় পেয়ে প্রশ্ন করি, আগুন ধরে যায় না জামা-কাপড়ে ?

আমার ভয় দেখেও মুখের হাসি ওর লেগেই থাকে। আমাকে আশ্বস্ত করে, আগুনের ভয় নেই। বুঝিয়ে দেয়, ওপরে নীচে ছাই চাপা থাকে কাজেই জামা-কাপড়ে আগুন লাগে না।

মনে হ'ল কাশ্মীর থেকে গরম কাপড় যায় সারা ভারতে। কাশ্মীরের শাল, সাতুস ভারতের বাইরেও যায় আর ওরা শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বুকের কাছে আগুনের মালসা ঝুলিয়ে ! এ কদিনে বেশ মায়া পড়েছে ছেলেটার ওপর। তাই কথায় কথায় জেনে নিলাম পহলগামের পথের পাশে ওদের গ্রাম। মা নেই। বাড়িতে বাবা আর ছোট ছোট ভাইবোন আছে। দরিদ্রের সন্তান তাই এই বয়সেই বাড়ি ছেড়ে এসেছে উপার্জনের চেষ্টায়। কিন্তু ছেলেমানুষী যায়নি।

কি মনে হ'ল, বলি—যাবি আমাদের সাথে আমাদের দেশে ?

ও এক কথায় রাজী। কিন্তু কি ভেবে নিয়ে বলল, একদিনের জন্য বাড়ি যাবে, গিয়ে বাবাকে বলে আসবে।

আমি হাসি ওর কথা শুনে। ওর বাবা যেন রাজী হবে ওর কথায় ! তবে আমার কথাটা যে একেবারে উড়িয়ে দেবার নয় তাই বোঝাতে ওকে বললাম, জানিস তোদের দেশের এক রাজপুত্র গিয়েছিলেন আমাদের দেশে। সেখান থেকে বিয়ে করে এনেছিলেন আমাদের রাজকন্যাকে। কাশ্মীরের রাণী হয়েছিলেন তিনি।

সাচ্‌ ? বিস্ময়ের অবধি থাকে না ওর।

হয়ত কাশ্মীরীদের সঙ্গে আত্মীয়তার একটা সূক্ষ্ম সূত্র খুঁজে পাই আমি, তাই ওকে দেখে জয়াপীড়ের কাহিনী মনে এলো—

বললাম,—সত্যি না তো কি ? বইতে লেখা আছে যে ! আর জানিস খালি হাতে একটা সিংহ মেরেছিল সেই রাজকুমার ? জয়াপীড়ের বীরত্বের কথা শুনে মোহনের মুখ আনন্দে গর্বে ঝক্‌মক্ করে উঠল। কৌতূহল দমন করে আর বসে থাকা সম্ভব হল না ওর। উঠে এসে আমার চেয়ারের হাতল চেপে ধরে অধীর আগ্রহে বলে উঠল, গপ্ বাতাও। ওকে দেখে মনে পড়ল বাড়িতে ছেলেমেয়েরা এমনি করেই গল্প শোনার বায়না ধরে। সংক্ষেপে বলতে হ'ল জয়াপীড়ের সিংহ-বধ কাহিনী।

॥ ২৮ ॥

মোহন গল্প শুনে চলে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু জয়াপীড়ের কাহিনী ঘুরেফিরেই মনে পড়ছিল আমার। তাই জয়াপীড়ের কথাই ভাবছিলাম বসে বসে।

—কাশ্মীররাজ জয়াপীড় প্রথম বাংলাদেশে গেলেন তা নয়। রাজতরঙ্গিনীতে দেখেছি সর্বপ্রথম ললিতাদিত্যের মাতামহ, গোনন্দ বংশীয় শেষ রাজা বলাদিত্য বাংলা জয় করেছিলেন। উনি 'বংকালা' জয় করে সেখানে কলম্বী নামে এক নগরও নির্মাণ করেছিলেন। কবি বাংলা দেশকেই 'বংকালা' বলেছেন মনে হয়।

তারপর ললিতাদিত্য স্বল্পকালের জন্য হলেও বাংলা জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বাঙালীর মনের যোগ হয়নি। গৌড়রাজকে হত্যা করে বাঙালীর কাছে চিরদিনের শত্রু হয়ে থাকলেন তিনি। পৌত্র জয়াপীড় কিন্তু বাংলায় গিয়ে যুদ্ধ করেননি। বাঙালীর সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। গৌড়াধিপ জয়ন্তকে সন্তুষ্ট করে তিনি তাঁর কন্যা কল্যাণ দেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। পিতামহ ললিতাদিত্যকে বাঙালী-শত্রু মনে করত কিন্তু জয়াপীড়ের সঙ্গে মধুর রক্তের সম্পর্ক গড়ে উঠল, যখন রাজা জয়ন্তর দৌহিত্র, কল্যাণ দেবীর গর্ভজাত সন্তান সংগ্রামপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন। সংগ্রামপীড়ের মা কাশ্মীরী কন্যা নন তবু কাশ্মীরবাসী সকলেই তাঁকে এত ভালবাসত যে তাঁর আর এক নাম দিয়েছিল পৃথিব্যাপীড়।

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর যদিও তিনি বারণ করেছিলেন তবু তাঁর দুই ছেলে

কুবলয়াপীড় আর বজ্রাদিত্য অল্প কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা পিতার মত কীর্তিমান হননি।

তারপর পৌত্র জয়াপীড় রাজসিংহাসন পেলেন। তিনি পিতামহের মতই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাই দিগ্বিজয়ে বের হলেন তাঁর মতই। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাঁর পিতামহের আমলের এক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ললিতাদিত্য এত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন কিনা? তাতে সেই বৃদ্ধ বলেছিলেন, আপনার পিতামহের সঙ্গে সওয়া লক্ষ রথ গিয়েছিল আপনার সঙ্গে আশী হাজার রথ যাচ্ছে মোটে। এ কথা শুনেও তিনি হতোদ্যম হননি নিশ্চয়ই। কারণ সংখ্যার দিক দিয়ে আশী হাজারও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। পিতামহের মত না হলেও জয়াপীড় বিপুল সৈন্য-সামন্ত নিয়েই যুদ্ধযাত্রা করলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং গুণীর আদর জানতেন। দেশ-বিদেশের গুণী ব্যক্তিদের সমাদর করে নিজের রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন। গুণমুগ্ধ বহু রাজা তাই তাঁদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।

কিন্তু কাশ্মীর থেকে সমতলে নেমে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেতে হলে সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। বহু ক্লেশস্বীকার করতে হয় এপথে। এবং সময়সাপেক্ষও বটে। গুণমুগ্ধ রাজাদের কিন্তু এত ক্লেশ সহ্য হ'ল না। দিগ্বিজয়ের মোহ কেটে গেল। একে একে তাঁরা নিজেদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে গেলেন।

জয়াপীড় অবশিষ্ট নিজের সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রয়াগে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গঙ্গার তীরে ছাউনি ফেলে থাকার সময় তিনি প্রচুর দক্ষিণা সহ একটা কম এক লক্ষ (ইচ্ছে করেই) অশ্ব দান করলেন। আর দূর দেশ থেকে যারা গঙ্গাজল নিতে আসত তাদের কলসীতে 'বিখ্যাত রাজা জয়াপীড়'—এই কথা কটির ছাপ দিতে লাগলেন।

বহু দূর দেশ থেকে গঙ্গাজল নিতে আসত লোকে। জল নিয়ে ফিরে গেলে এই ছাপ দেখে সেই সব দেশের রাজারা জয়াপীড়ের কথা জানতে পারলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যদি কোন রাজা তাঁর চেয়ে একটা ঘোড়াও বেশী দান করেন মানে পুরোপুরি এক লক্ষ ঘোড়া দান করতে পারেন তবে সেই রাজা তাঁর নিজের শীলমোহর ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ দানে তাঁর রেকর্ড ভঙ্গ হ'ল বলে ধরে নেবেন।

জয়াপীড় বাল্যকাল থেকেই স্বপ্ন দেখতেন পিতামহের মত দিগ্বিজয় করে যশস্বী হবেন। কিন্তু সঙ্গী নৃপতিরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ায়, যখন পিতামহের মত যুদ্ধ করে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের নিজের পরাক্রম দেখানো সম্ভব হ'ল না, তখন এইভাবেই বিখ্যাত হবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু এত দানধ্যানের ফলে উনি বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন কিনা সে ইতিহাস কারো জানা নেই। কিন্তু উনি নিঃস্ব হয়ে পড়ায় ঠিকমত সৈন্যদের বেতন এবং আহার যোগাতে পারেননি মনে হয়। কাজেই তারাও অসন্তুষ্ট হয়ে দেশে ফিরে যেতে চাইল। তাদের দেশে ফেরার অনুমতি দিয়ে একদিন রাত্রে একজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। এবার তিনি গৌড়েশ্বরের অধীনে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

একদিন সন্ধ্যায় সেখানে কার্তিকের মন্দিরে একখণ্ড পাথরের ওপর বসে অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী দেবদাসী কমলার নাচ দেখছিলেন মুগ্ধ হয়ে। ভরতশাস্ত্র অনুসারে নির্ভুল মুদ্রায় এবং তাললয়ে নেচে চলেছেন কমলা। বায়ুভরে আন্দোলিত কুসুমিত লতার মতই নৃত্যচ্ছন্দে হিল্লোলিত হচ্ছে সে কমনীয় দেহবল্লরী।

জয়াপীড সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উনি তাই তন্ময় হয়ে কমলার অপূর্ব নৃত্য দেখছিলেন। আর স্থানকাল ভুলে আত্মবিস্মৃত জয়াপীড় অন্যমনস্ক হয়ে বার বার ঘাড়ের কাছে একখানি হাত পাতছিলেন।

তাঁর সুন্দর আকৃতি দেখে কমলাও আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর প্রতি। আর ওভাবে হাত পাততে দেখে সন্দেহ হ'ল নিশ্চয়ই উনি কোন বড় ঘরের ছেলে। দাসীর হাত থেকে তাম্বুল গ্রহণ করার অভ্যাস আছে, তাই নাচ দেখতে দেখতে অভ্যাসবসে ওভাবে হাত পাতছেন।

কমলা তাঁর এক সখীকে পাঠালেন জয়াপীড়ের কাছে। জয়াপীড হাত পাততেই সে একখণ্ড সুপুরি দিল হাতে। অন্যমনস্ক জয়াপীড় মুখে ফেলে দিলেন সুপুরিখণ্ড কিছুই না ভেবে। সখী তখন পরিচয় দিল নিজের এবং কমলার কাছ থেকে এসেছে জানালো সেকথা। কমলাও জয়াপীড়ের রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। তাই নিঃসঙ্গ বিদেশী যুবক জয়াপীড়কে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিল। তাঁকে পরম আদরে রেখেছিল কমলা। কিন্তু তাঁর মনে তখনও আকাঙ্ক্ষা পিতামহের মত শৌর্যে-বীর্যে বিখ্যাত হবার। তাই শুধু নাচ-গানের চর্চায় আর আদর-যত্নে কাল কাটাতে তাঁর ভালো লাগছিল না।

সুযোগ এলো একদিন। খবর পেলেন একটি সিংহ বহুলোকের প্রাণনাশ

করছে। কিন্তু কেউ সে সিংহকে বধ করতে পারছে না। তখন একাকী চুপি চুপি রাত্রিবেলা গিয়ে সেই সিংহকে বধ করলেন। সিংহকে ছুরিকাঘাতে বধ করার সময় তাঁর হাতের একটি কঙ্কণ সিংহের মুখের ভেতর থেকে গিয়েছিল। তাতে নাম লেখা ছিল তাঁর। তাতেই লোকে জানল তাঁর বীরত্বের কথা। গৌড়ের রাজা জয়ন্ত এ সংবাদে অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর একমাত্র কন্যা কল্যাণ দেবীর সঙ্গে জয়াপীড়ের বিয়ে দিলেন।

জয়াপীড় প্রচুর ধনরত্ন এবং স্ত্রী কল্যাণ দেবী এবং কমলাকে নিয়ে কাশ্মীরে ফিরেছিলেন।

ঐতিহাসিকেরা কি বলবেন জানি না, কারণ সমগ্র বাংলাদেশকেই নাকি এক সময়ে গৌড় বলা হ'ত। আমার কিন্তু মনে হ'ল কহ্লন গৌড়ের পৌণ্ড্রবর্ধন নামে যে নগরের কথা বলেছেন সেটা বোধ হয় বর্তমান পাণ্ডুয়া। মালদহ জেলায় গৌড় এবং পাণ্ডুয়া দুইটিই ঐতিহাসিক স্থান। অতীতের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় গৌড়ের মত এখানেও একসময় বাংলার রাজধানী ছিল হয়ত। গৌড় থেকে পাণ্ডুয়ার দূরত্বও খুব বেশী নয়। রাজা যত্নর রাজধানী ছিল এখানে সেকথাও জানা যায়।

জয়াপীড়ের বীরত্বের কাহিনী বলতে গিয়ে উনি হয়ত বাঘের বদলে সিংহ লিখে থাকবেন। কারণ বাংলাদেশে কোনকালে সিংহ ছিল একথা জানা যায় না। তবে গৌড় এবং পাণ্ডুয়াতে বাঘ এখনও আছে। আর কাতিকের মন্দির না থাকলেও, এখনও কাতিক পূজোর ধুম আছে মালদায়। প্রতি বৎসর কার্তিকের মেলাও হয় এখনও। বাংলার আর কোন জেলায় কার্তিক পূজো উপলক্ষে এমন উৎসব আর হয় বলে জানি না।

তাহলে মালদহেও এককালে ভারত-নাট্যের চর্চা ছিল! সেযুগেও মালদহ-বাসীর সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল বলেই সঙ্গীত এবং নৃত্যের মত চারুকলা চরম উৎকর্ষলাভ করেছিল। মনে মনে আনন্দ পেলাম আমি।

পিতামহের মত জয়াপীড়েরও ঘটনাবহুল জীবন। মনে পড়ল এমনি আর একটি ঘটনা। ধাত্রীপান্না যেমন নিজের সন্তানের জীবনের বিনিময়ে রাণা উদয়ের প্রাণরক্ষা করে চিতোরের রাজবংশ রক্ষা করেছিলেম, তেমনি মন্ত্রী দেবশর্মাও নিজের জীবন দিয়ে জয়াপীড়ের জীবন রক্ষা করেছিলেন। রাজভক্তির এমন দৃষ্টান্ত কমই দেখা যায়।

জয়াপীড় সর্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। নিজে গুণী ছিলেন বলে গুণের আদর জানতেন। অন্য রাজ্যে বিদ্বান বা পণ্ডিত ব্যক্তির সন্ধান পেলেই সম্মান করে নিয়ে আসতেন তাঁকে। এদিক দিয়ে তিনি পিতামহের তুলনায় কম খ্যাতি অর্জন করেননি। কিন্তু তবুও পিতামহের মত রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিরদিনের। কাজেই মধ্যে মধ্যে যুদ্ধযাত্রা করতেন। পিতামহের মতই স্ত্রীরাজ্য (মণিপুর), কান্যকুব্জ প্রভৃতি রাজ্য জয়ও করেছিলেন তিনি।

এমনি জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন একবার। সঙ্গে প্রচুর সৈন্য-সামন্ত। সেবার নেপাল জয়ের বাসনা। নেপাল-রাজ অরমূড়ি কিন্তু সম্মুখযুদ্ধ না করে জয়াপীড়কে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। কখনও কাছে এসে দেখা দেয়, আবার কখনও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দূরে পালিয়ে যায়। জয়াপীড়ও পেছন পেছন যান। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে পূর্ব সমুদ্রের কাছাকাছি কালগণ্ডিকা নদীর দুই তীরে দুই পক্ষের দেখা হ'ল সামনাসামনি। নদীতে তখন সামান্য জল। জয়াপীড় ক্রোধে অন্ধ হয়ে পায়ে হেঁটেই যাত্রা করলেন সৈন্যদের নিয়ে। ইতিমধ্যে নদীতে জোয়ারের জল এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সৈন্য-সামন্ত সব। জয়াপীড়ও ভেসে যাচ্ছিলেন। অরমূড়ি তাঁকে চামড়ার ভেলার সাহায্যে ধরে এনে বন্দী করে রাখলেন কারাগারে।

মন্ত্রী দেবশর্মা প্রভুকে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখে মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। নেপালরাজ অরমূড়ির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানালেন, তিনি তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করেন। আর খবর দিলেন, জয়াপীড়ের বহু ধনরত্ন তাঁর সঙ্গেই ছিল, তার সন্ধান দেবেন তিনি অরমূড়িকে। তবে তার জন্য রাজা জয়াপীড়ের সঙ্গে গোপনে একবার দেখা করা দরকার কারাগারে গিয়ে। কারণ কোন্ কোন্ সৈন্য সে ধনরত্ন রক্ষা করছে, উনি ফাঁকি দিয়ে জেনে নেবেন সেটা রাজার কাছ থেকে।

অরমূড়ি ধনরত্নের লোভে দেবশর্মার ছল বুঝতে পারলেন না। রাজী হলেন তাঁর কথায়। তিনি নিজেও কম ধূর্ত ছিলেন না। না হলে নেপাল থেকে জয়াপীড়কে খেলিয়ে নিয়ে সমুদ্রতীর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন! দীর্ঘদিন ধরে জয়াপীড়ের সঙ্গে ছলনা করেছেন। এবার ধনরত্নের লোভে নিজেই দেবশর্মার ছলনায় ভুললেন।

নদীর তীরেই কারাগার। দেবশর্মা দেখা করে জয়াপীড়কে কারাগারের গবাক্ষপথে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপর পারে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু অত উঁচু থেকে ঝাঁপ দিলে প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন তাই প্রথমে জয়াপীড় রাজী

হলেন না। তিনি বললেন, এভাবে মৃত্যু হলে লোকে তাঁকে ভীরু এই অপবাদ দেবে। লোকে বলবে, অরমূড়ির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

তখন দেবশর্মা বললেন, আপনি একটু বাইরে যান। আমি আপনার পলায়নের ব্যবস্থা করে রাখব। তাঁর কথামত ঘরের বাইরে থেকে ঘুরে এসে জয়াপীড় দেখতে পেলেন দেবশর্মা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন। আর তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের এক অংশে নিজের রক্তে লিখে রেখে গেছেন, 'আপনি আমার এই দেহ ভেলার মত করে আপনার দেহের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গবাক্ষপথে ঝাঁপ দিয়ে নদী পার হয়ে পলায়ন করুন।'

বন্দীদশা থেকে এইভাবে মুক্ত হয়ে পরে অবশ্য তিনি নেপালরাজকে পরাজিত করেছিলেন। বন্দী জয়াপীড়ের প্রাণ এবং মান দুই-ই রক্ষা হ'ল এভাবে। ইতিহাসে জয়াপীড়ের স্থান আছে, কিন্তু প্রভুভক্ত মন্ত্রী দেবশর্মার আত্মোৎসর্গের কাহিনী কজনেই বা জানে!

রাজা জয়াপীড়ের জীবনের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বিয়ে এবং বন্দীত্ব—দুটিই হয়তো বাংলাদেশেই ঘটেছে। বাংলা দেশের নীচেই তো পূর্ব সমুদ্র। মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদীকেই কালগণ্ডিকা বলেছেন নাকি! কেলেঘাই তো পূর্ব সমুদ্রেই মিশেছে। আর এখনও তাতে জোয়ার-ভাটা খেলে।

মনে হ'ল মোহনকে এ গল্পটাও শোনালে হ'ত। একটু আগে জয়াপীড়ের সিংহবধ কাহিনী শুনে প্রচুর আনন্দ পেয়েছে ও। আমি অবশ্য ভাবছিলাম, ও আমার সব কথা বুঝবে না বুঝি। কিন্তু গল্পটা মোহন ঠিকই বুঝেছে। কারণ মাঝে-মাঝেই ও প্রশ্ন করছিল, সাচ্? অর্থাৎ সত্যি বলছ? তাইতেই মনে হ'ল ও বুঝতে পারছে আমার কথা। কিন্তু কি করে বুঝল সেটাই আশ্চর্য! তবে গল্প শোনার সময় বোধ হয় ভাষাটা খুব একটা বাধা হয় না। কারণ কল্পনাও খানিকটা সাহায্য করে এসময়।

মোহনের বিস্ময়-মাখানো আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা মনে পড়তেই ভাবলাম এই সব ঐতিহাসিক কাহিনী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প করে শোনালে ওরা আনন্দ পায় বেশ। যেমন ধাত্রীপান্নার গল্প, বালক বাদলের বীরত্বের কাহিনী, পদ্মিনীর জহরব্রতের কথা কত ছোটবেলায় গল্প শুনে জেনেছি আমরা। আর তখন থেকেই চিতোর দুর্গ দেখার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে মনে। মোহনেরও হয়ত বাংলায় যাবার আগ্রহ জাগবে আমার গল্প শুনে।

মনে পড়ল চিতোর দুর্গে গিয়ে গাইডের পেছন পেছন ঘুরছি আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছি,—জহরব্রত কোথায় হয়েছিল, আলাউদ্দীন আয়নায় পদ্মিনীর রূপ দেখে পাগল হয়েছিলেন সে কোন্ ঘর? ধাত্রীপান্না কোন্ পথে শিশু রাণা উদয়কে নিয়ে পালিয়েছিলেন? ম্যায় ভুখা হুঁ বলে যে চিতোরেশ্বরী দেখা দিলেন রাণাকে, কোথায় সে দেবীমূর্তি? কত পরে চিতোর গিয়েছি। কিন্তু সেই ছেলেবেলার কৌতূহল নিয়েই যেন প্রশ্ন করছিলাম আমি।

আমার সে প্রশ্ন শুনে আর দেখার আগ্রহ দেখে রাজস্থানবাসী এক ভদ্রলোক, উনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, বলেছিলেন, আপনারা রাজস্থানকে যত ভালো করে জানেন আমরাও ততো জানি না।

উনি বিনয়বশতঃ একথা বললেও কিছু সত্য এতে আছে বৈকি। টড্ সাহেবের রাজস্থান কাহিনী যে বহু বিদেশীর মনেও রাজস্থান দেখার আগ্রহ জাগায় একথা মিথ্যে নয়। তবে আমাদের কথা স্বতন্ত্র। রাজস্থানের প্রতিটি কাহিনী এবং ইতিহাস নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যত কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস লেখা হয়েছে এমন বোধ হয় আর কোন ভাষায় লেখা হয়নি। ডি. এল. রায়ের মেবার পতন, বঙ্কিমের রাজসিংহ, অবনী ঠাকুরের রাজকাহিনীর প্রতিটি চরিত্র, রাণা প্রতাপ, বাপ্পা, হাম্বির, রাণা কুম্ভ প্রভৃতি বীর চরিত্র যেন জীবন্ত আমাদের কাছে। উদয়পুর, চিতোর, হলদিঘাট, অচলগড় প্রভৃতি প্রতিটি স্থান এবং আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী যেন স্বপ্নদৃষ্ট স্থান আমাদের কাছে। এমন কি রাণা প্রতাপের ঘোড়া 'চৈতক'ও বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে আমাদের মনে। তাই হলদিঘাটে গিয়ে যেখানে নালা পার হতে গিয়ে প্রভুভক্ত চৈতক প্রাণ হারিয়েছিল সেখানে তার সমাধি এবং উদয়পুরে গিয়ে রাণাদের আস্তাবলে চৈতকের মর্মরমূর্তি না দেখে ফিরতে পারিনি আমরা।

রাজস্থানের বীরত্বের কাহিনী আমাদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়েছে। বাঙ্গালী মাত্রেই তাই রাজস্থানে গেলে তার আশৈশবের স্বপ্নে দেখা রাজস্থানকে ভালো করে দেখে আসতে চায়।

কাশ্মীরের ইতিহাস আমার ভালো জানা নেই। তবু রাজতরঙ্গিনীর এই সব কাহিনীর জন্যই কাশ্মীর আমার কাছে আরো আকর্ষণীয়। মনে হ'ল কাশ্মীরী কবি কহ্লন বাঙালীর বীরত্বের কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি বাংলার রাজকন্যার প্রতি জয়াপীড়ের প্রেমের কথাও বিশেষ স্থান পেয়েছে তাঁর কাব্যে। জয়াপীড়ের আরো রাণী ছিলেন। তাঁদের কথা তো কিছু বলেননি। লিখেছেন, প্রিয় মহিষী

কল্যাণ দেবীর প্রেমে মুগ্ধ জয়াপীড়। তাই তাঁর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য নিজে তাঁর প্রতিহার-পদ গ্রহণ করেছিলেন।

কবির ভাষায়—

মহাপ্রতীহারপিঠোধিকারং প্রতিপন্নবসঃ।
কল্যাণদেবীদাক্ষিণ্যাদকবোদধিকোন্নতিম্॥

মনে হ'ল কবি কি বাঙালীকে একটু বেশী প্রীতির চক্ষে দেখতেন? উনি কি বাংলায় গিয়েছিলেন কখনও?

॥ ২৯ ॥

পহলগাম আসা আজ কদিন হয়ে গেল। অমরনাথ থেকে ফিরে ওরাও এ কদিন বিশ্রাম নিল। কাল সকালের বাসে আমরা এখান থেকে শ্রীনগর ফিরব। রোজকার মত আজও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁবুর বাইরে বসেছি। শীতের আমেজ আছে বাতাসে। রোদটা ভালো লাগছে, বসে আছি চুপচাপ। পহলগাম ছেড়ে যাব ভাবতে একটু খারাপ লাগছে, মোহনও চলে গেল আজ সকালে। ও না থাকায় একটু ফাঁকা লাগছে যেন। আমাকে এভাবে চুপ করে বসতে দেখলেই ও গল্প শুনতে চাইত। এ কদিন ছিল ছেলেটা। সব সময় কাছে কাছে ঘুরত ফিরত। কাজের ফাঁকে গল্প শোনার ছেলেমানুষী বায়না। ভালো লাগত আমার। সবাই ভালোবাসত ওকে। সঙ্গে গেলে নিয়ে যেতাম কলকাতায়। ওর যাবার ইচ্ছেও ছিল। বাবাকে জিজ্ঞেস করে বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে বলেছিল। কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলা বুড়োমত কে একজন লোক হঠাৎ এসে জানালো ওর বাবার খুব অসুখ।

মনে পড়ল কাল বিকেলে একবার ওর খোঁজ করে পাইনি। মনে হয় আমার কাছে গল্প শুনে তক্ষুনি চলে গিয়েছিল বাজারে। আমাদের সঙ্গে নূতন দেশে যাবে সেই আনন্দে বাজারে ওর চেনা-জানা কাউকে গল্প করেছে গিয়ে। আর তাই শুনতে পেয়ে ঐ বুড়ো নিজেই ছুটে এসেছিল, ও যদি সত্যি সত্যি চলে যায় ভেবে। বুড়ো ওদের গ্রামেরই কেউ মনে হ'ল। হিতাকাঙ্ক্ষী ওদের।

সকালে যাবার বেলায় ওকে চুপিচুপি কটা টাকা দিয়ে বললাম, বাবার জন্য ওষুধ-পথ্য কিনিস। একটু হাসি ফুটল ওর মুখে। যেতে যেতে ও ফিরে এসে

বলে গেল, বাবা ভালো থাকলে আবার চলে আসবে ঠিক। তখনও বোধ হয় ওর মনের কোণে আশা ছিল নূতন দেশে যেতে পাবে আমাদের সঙ্গে।

ও ফিরতে পারবে আমার বিশ্বাস হয়নি। তবু ওর কথা শুনে একটু মন খারাপ করেছিল। একটু মায়া পড়েছিল যেন ছেলেটার ওপর।

আমাদের পাশের তাঁবুর ভদ্রলোকও আজ চলে গেলেন। ওদিকটা তাই ফাঁকা। খেলুভাইদের সাথে আলাপ হয়েছিল। একাই ছিলেন ভদ্রলোক ঠাকুর চাকর নিয়ে। মেয়েরা সঙ্গে এলে আলাপ করতাম। কাল উনি ভদ্রতা করে আমাদের জন্য কতকগুলো ভুট্টাপোড়া পাঠিয়েছিলেন। নুন, তেল, লঙ্কা মাখিয়ে বেশ যত্ন করেই একটা প্লেটের ওপর সাজিয়ে ওপর থেকে কাশ্মীরী কাজ করা একটা ট্রে-ক্লথ দিয়ে ঢেকে দিয়ে গেল ওঁর চাকর। খেতে অবশ্য ভালোই। কিন্তু নিশ্চয়ই খুব ভালো কাশ্মীরী খাবার আছে ভেবে প্রথমেই ঢাকা তুলে অসিত ঠাকুরপো খুব বেকুব হয়েছিল। তারপরই মন্তব্য করল,—কাশ্মীরীদের আপেল, আখরোট, বাদাম, কিসমিস খেয়ে অরুচি হলে বোধ হয় ভুট্টাপোড়া খায়। তাই আমাদের জন্যও পাঠিয়েছে।

ওর কথায় আমরা সবাই হেসেছিলাম। মোহনকে বলেছিলাম, তোদের দেশে ভুট্টা পাওয়া যায় না বুঝি? আমাদের দেশে চল্, কত খাবি!

ও কি বুঝেছিল কি জানি। কিন্তু হেসেছিল আমাদের সঙ্গে।

আর একজন কাশ্মীরী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রথম দিনই। উনি শ্রীনগরের এস. ডি. ও.। অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষে এসেছিলেন এখানে। শুনে-ছিলাম সঙ্গে মা, বৌ, ছেলেমেয়ে ছিল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা হয়ে ওঠেনি। পরদিন সকাল থেকে যা বৃষ্টি শুরু হল! তারপর আমরা চলে গেলাম চন্দনবাড়ি। ওখান থেকে ফেরার পথে অবশ্য দেখেছিলাম ভদ্রলোককে, বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ওপরের দিকে যাচ্ছেন। দুর্যোগের জন্য আগেরদিন যাননি। পরদিনই সবাইকে পহলগামে রেখে একা গিয়েছেন। আমাদের দেখে চিনতে পেরেছিলেন। ওঁর সঙ্গে পরের দিন গেলে আমাদেরও অমরনাথ যাওয়া হ'ত।

অমরনাথ থেকে ফিরে বেশীর ভাগ যাত্রীই শ্রীনগরের দিকে চলে গেছে। যারা এখনও আছে তারা ওপরে ঘর ভাড়া করে বা হোটেলে আছে। সেও খুব বেশী নয়। কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রীরা অমরনাথ থেকে ফেরার পরদিনই চলে গেছে, নরেন যাবার আগে এসে দেখা করে গেছে, ওদিকটাও খালি। কাল আমরা চলে

গেলে যদি নূতন লোক আর না আসে তবে বাজারের নীচে পাহাড়ে আর কোন লোক থাকবে না। তবে নূতন ভ্রমণকারী আসবেই মনে হয়। বর্ষা কেটে গেল। সেপ্টেম্বর অক্টোবর এ দুমাসই তো কাশ্মীরে বেড়াবার মরশুম। যারা স্বাস্থ্যের জন্য বা শুধু বেড়াতে আসে তাদের ভিড় হবে এখন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর জল-বাতাস দুটোর জন্যই পহলগামে আসে লোক। শ্রীনগরকে যতটুকু দেখেছি তার চেয়ে পহলগামই আমার বেশী ভালো লেগেছে। শ্রীনগরে শহর গড়ে উঠেছে কিন্তু পহলগামে এলে প্রকৃতির কোলে ঠাঁই মেলে। এ কদিনে পহলগাম তার সৌন্দর্যে আনন্দে ভরে দিয়েছে আমার মন। ভুলব না লীডারকেও। ওর টানে রোজ একবার করে নীচে নামি। লীডারের তীরে কিছুক্ষণ ঘুরে না বেড়ালে ভালো লাগে না আমার। আজও উঠে দাঁড়ালাম নীচে নামার জন্য। অমনি মনে পড়ল, রোজ মোহন থাকে আমার সঙ্গে। আজ ও নেই।

॥ ৩০ ॥

পহলগাম থেকে রওনা হতে আমাদের একটু দেরি হ'ল। সকালের বাসে না গিয়ে বেলা একটা পনেরো মিনিটের বাস ধরলাম। এ বাসটা সোজা শ্রীনগর না গিয়ে পথে 'মার্তণ্ড', 'অনন্তনাগ' ইত্যাদি ঘুরে যাবে। কাজেই এই বাসেই যাওয়া ঠিক হ'ল।

পহলগামকে শেষ বিদায় জানিয়ে বাসে উঠলাম। বাস বাঁক ঘুরতেই হারিয়ে গেল পহলগাম। লীডার তখনও সঙ্গ ছাড়েনি। সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। লীডারের কুলু কুলু ধ্বনি যেন পিছুটানের মত মনে হতে লাগল। যেন বার বার বলছে, আবার এসো—আবার এসো।

আমি একটু আনমনা হয়ে খুঁজছিলাম আর একজনকেও. যদি দেখা যায় পথে। মোহন বলেছিল, পহলগামের পথের ধারেই ওদের গ্রাম। মনে মনে আশা করেছিলাম, হয়তো কোন এক বাঁকে দেখতে পাব পথের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ও। হাসিমুখে বিদায় জানাবে আমাদের। দেখা গেল না। আর এই ফাঁকে লীডারও কখন অদৃশ্য হয়েছে টের পাইনি। এ কদিনের নিত্যসঙ্গী ছিল লীডার। একটু আগেও সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে কখন পাহাড় থেকে নেমে সমতলের পথ ধরেছে বাস। ক্ষেত-খামার, ছোট ছোট গ্রামের পাশ দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে গাড়ী। মনেও হয়তো কিছু গতি সঞ্চার করেছে। পেছনে যাদের ফেলে এলাম তাদের কথা ভাববার আর সময় পেলাম না। চোখ আবার সাগ্রহে লক্ষ্য করছে সব কিছু। কাশ্মীরকে ভালো করে দেখে নিতে চায় আমার উৎসুক মন। নদী-নালা, শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার এসবই তো বাংলার ছবি হুবহু। বাংলা দেশই মনে হচ্ছে যেন। কিন্তু দূরের ঐ নীলাভ পাহাড়ের সারি মনে করিয়ে দিচ্ছে কাশ্মীর উপ-ত্যকায় এসেছি আমি। আর সমতল পথ দিয়ে বাস ছুটে চললেও মোটেই সমতল নয় এটা। সমুদ্র সমতল বা বাংলা দেশ থেকে কয়েক হাজার ফিট ওপরে আছি এখন।

এতক্ষণ কোন লোকজন নজরে পড়েনি। কিন্তু একটু দূর থেকেই হঠাৎ নজরে পড়ল কাঁটার বেড়া-ঘেরা একটা সবজি-ক্ষেত। একজন লোক কাজ করছে বসে। আর মনে হ'ল একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। আমাদের বাসখানি যখন পথের বাঁক ঘুরে সবজি ক্ষেতের পাশে এসে গেল, তখন দেখি ছেলেটি কাজ ফেলে কৌতূহলী হয়ে দেখছে আমাদের—আর মেয়েটি ছুটে এসে বেড়ার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো,—বোধ হয় আরো কাছে থেকে ভালো করে দেখবে বলে। মেয়েটির পরনে শাড়ী নয়, রঙীন সালোয়ার আর গায়ে হাল্কা ফিরোজা রংএর ফেরাঙ্গ। মাথার কেশরাশি ওড়নার মত একফালি টুকটুকে লাল কাপড়ের টুকরো দিয়ে পেছন দিকে বেঁধে রেখেছে। তবু তু'এক গুচ্ছ অবাধ্য কুন্তল আঙুরলতার মত সুন্দর শুভ্র ললাটে আর গালের তুপাশে তুলছে। রোদে আর পরিশ্রমে গাল তুটিতে রক্তাভা ফুঠে উঠেছে। পুষ্পিত তনুলতার সর্ব অঙ্গে লাবণ্যের জোয়ার যেন ঢেউ তুলেছে।

মাথার ওপর চন্দ্রাতপের মত উজ্জ্বল ঘন নীল আকাশে শুভ্র মেঘের দল যেন গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের মত শোভা পাচ্ছে। আকাশের নীল রং ক্রমশঃ ফিকে হয়ে ফিরোজা রং ধরে দিকচক্রবালের নীলাভ পাহাড়ের সারির সঙ্গে মিশেছে। নীচে সবুজের ছড়াছড়ি। আকাশে মাটিতে সর্বত্রই রংএর বাহার। উজ্জ্বল সূর্যকিরণে সবই আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এমন প্রাকৃতিক পটভূমিকায় মেয়েটিকে বড় সুন্দর লাগল আমার। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম শুধু। যেন কোন গুণী চিত্রকরের আঁকা অপূর্ব চিত্র একখানি।

বাস ছুটে চলেছে। যতক্ষণ দেখা যায় আমি চেয়েছিলাম ওদিকপানে।

ক্রমশঃ দূরে সরে গেল ছবিটা। মুখখানা অস্পষ্ট হয়ে গেল। শুধু ফিরোজা রংএর একটা আভাস আর মাথায় বাঁধা লাল কাপড়ের ফালিটার পেছনের অংশটুকু হাওয়ায় উড়ছে মনে হতে লাগল। শেষে একেবারেই মিলিয়ে গেল।

ছেলেটিও সুন্দর। তারও পরনে রঙীন পরিচ্ছদ। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে কি জানি কেন মনে পড়ল আমার সেদিনের দেখা অপূর্বসুন্দর একগুচ্ছ ফুলের কথা।

শুনেছিলাম কাশ্মীর ফুলের দেশ। ভেবেছিলাম এখানে পাহাড়ে পর্বতে মাঠে ঘাটে সর্বত্রই ফুলের শোভা দেখতে পাব বুঝি। কিন্তু তেমন ফুল আমার চোখে পড়েনি। হয়তো এটা ফুলের সময়ও নয়। তবু একগুচ্ছ অপূর্বসুন্দর ফুল হঠাৎই দেখতে পেয়েছিলাম।

সেদিন পহলগাম থেকে বেড়াতে বেড়াতে কিছুদূরে চলে গিয়েছিলাম। পাহাড়ী গ্রামের পথে একটা ছোট্ট সবজি ক্ষেতের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, চলতে চলতে চোখে পড়ল বেড়ার কোণে একটা সতেজ সবুজ ডাঁটার মাথায় অদ্ভুত সুন্দর একগুচ্ছ ফুল। পাপড়িগুলির শুভ্রবর্ণের মাঝে সূক্ষ্ম গোলাপী আভা। নাম-না-জানা সে ফুল কোনো ফুলবাগিচার যত্নের ফসল নয়। প্রকৃতির খেয়াল-খুশীর সৃষ্টি। তাই বুঝি অত সুন্দর লেগেছিল।

আজকের এই মেয়েটিকে দেখে আমার ঐ কুসুম স্তবকটির কথাই মনে হতে লাগল। এমন সুন্দর মুখখানি শুধু ঐ ফুলের সঙ্গেই তুলনা করা চলে বুঝি। আর চারিদিকের এই রমণীয় প্রাকৃতিক [illegible]ভূমিকায় একটি কৃষক রমণীর এমন অনবদ্য রূপ দেখতে পেলাম বলেই বুঝি আমাকে এমন আকৃষ্ট করেছিল। আমার মুগ্ধ চোখ দুটো যেন আটকে গিয়েছিল একটা রঙীন ছবিতে। কাশ্মীরী মেয়েদের রূপের খ্যাতি শুনেছিলাম। আজ প্রত্যক্ষ করলাম। শ্রীনগর বা পহলগামে এমন রূপ আমার চোখে পড়েনি তো! অমনি মনে হ'ল ঐ জংলা ফুল যেমন কোন দামী ফুলদানিতে রাখলে তার যে সৌন্দর্য আমাকে তেমন মুগ্ধ করত না, তেমনি কোন সুসজ্জিত ড্রইংরুমে বা অন্য কোন পরিবেশে এই মেয়েটিকে দেখলেই কি এত ভালো লাগত! কী জানি?

বাস এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো। প্রথম স্টপেজ শুনেছিলাম 'মার্তণ্ড'। বাস থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। কিন্তু কিছুটা গিয়ে মন্দিরে পৌঁছে ভুল ভাঙল আমার। মহারাজা ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত সূর্যমন্দির দেখব আশা করে-ছিলাম। কিন্তু এ মন্দির তো অত পুরাতন নয়। সাধারণ পাকা দালান যেমন হয় তেমনি। কোন বিশেষত্ব নেই। মন্দিরের ঘরের দেয়ালে সূর্যমূর্তি আঁকা থাকলেও সন্দেহ হ'ল মনে। পুরোহিতকে প্রশ্ন করে জানলাম মার্তণ্ডমন্দির পাহাড়ের মাথায়। এখান থেকে অন্ততঃ দু মাইল দূরে। যদিও মার্তণ্ডমন্দির দেখার খুবই আগ্রহ ছিল কিন্তু দূরত্ব শুনে আর যাবার সাহস হ'ল না। যদি বাস ছেড়ে দেয় বিপদে পড়ব আমরা।

এই মন্দিরের সামনে বেশ বড় একটা জলের কুণ্ড। পুকুরের মতই। নাম মোক্ষকুণ্ড। পবিত্র জলের উৎস আছে এখানে। কুণ্ডে বড় বড় মাছ আছে। আমাদের সঙ্গে এদেশীয় যারা এসেছে এই বাসে, তারা বলল 'হোলি ফিশ'। হরিদ্বারের মতই মাছকে রুটির টুকরো খাওয়াচ্ছে দেখলাম। এ জায়গাটার নাম 'মাওন'। 'ভাবন'ও বলে। আমি বোধ হয় মাওনকেই মার্তণ্ড শুনেছিলাম। যাই হোক এটাও একটা তীর্থস্থান। বিজয়-সপ্তমীর দিন বহু দূর দূর থেকে সাধু-সন্ত এবং তীর্থযাত্রীরা আসে এখানে। এই কুণ্ডে স্নান করে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ করে। এখান থেকে এক মাইল দূরেই 'বুমজ্জ' নামে এক গুহা আছে। সেখানে এক সন্ন্যাসী যোগসাধনায় দেহরক্ষা করেছিলেন। তাঁর অস্থিকঙ্কাল এখনও নাকি দেখতে পাওয়া যায়। শুনলাম শ্রীনগর থেকে 'ছড়ি' নিয়ে অমরনাথ যাত্রার পথে এখানে একদিন যাত্রাবিরতি হয়। সাধু-সন্তরা পবিত্র ঝরণার পাশে অবস্থান করেন এক রাত।

বাস থেকে নামার সময় মনে হয়েছিল, 'কোনারকের' মত অমনি আশ্চর্যসুন্দর কোন মন্দির দেখতে পাব বুঝি। রাজতরঙ্গিনীতে মার্তণ্ডমন্দিরের যে বর্ণনা আছে তা থেকে আমার এমনি ধারণাই হয়েছিল। রাজা ললিতাদিত্য যখন দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিলেন তখনই তাঁর স্থপতি এক নগর নির্মাণ করেন—নাম দিলেন ললিত-পুর। সুবিশাল এক মন্দিরগৃহ নির্মিত হ'ল। ফিরে এসে তিনি সেই মন্দিরে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। কবি লিখেছেন,—

'অখণ্ড প্রস্তর দিয়ে সেই মন্দির প্রস্তুত হয়েছিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণ দ্রাক্ষাকুঞ্জে সুশোভিত ছিল।

এখন হয়তো সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জের শোভা নেই। কিন্তু এত কাছে এসেও মার্তণ্ড-মন্দির দেখতে পেলাম না বলে আফসোস হ'ল মনে। আর একটা কথাও মনে হ'ল। এত সুন্দর মন্দির এবং নগর শুধু তাঁর নামেই যেখানে তৈরী হ'ল, সেখানে কিন্তু তিনি বাস করেননি। তিনি নিজের তৈরী পরিহাসপুরেই থাকতে ভালো-বাসতেন। ললিতপুর নামটা তাই আর টিকলো না বোধ হয়। মার্তণ্ডমন্দিরের নামে মার্তণ্ডই নাম হয়ে গেল জায়গাটার। আজও সেই নামেই পরিচিত সে স্থানটি।

ডাঃ এস. কে. অত্রি তাঁর কাশ্মীর-গাইডে মার্তণ্ডমন্দির সম্বন্ধে লিখেছেন,—খৃষ্টজন্মের পর পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজা রামাদিত্য এবং তাঁর স্ত্রী অমৃতপ্রভা এই মন্দির প্রথম স্থাপনা করেছিলেন। প্রায় তিনশত বৎসর পর অষ্টম শতাব্দীতে রাজা ললিতাদিত্য এ মন্দিরের সংস্কারসাধন করেন। তিনি মন্দিরের বর্ণনায় বলেছেন চুরাশীটি বৃহদাকার অপূর্ব কারুকার্যময় স্তম্ভের উপর মন্দিরশীর্ষ স্থাপিত। এত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা এই মন্দির প্রস্তুত হয়েছে যে অবাক হয়ে ভাবতে হয় এই পাথরগুলো কি করে ঐ পাহাড়ের মাথায় তোলা হয়েছিল! কবি কহ্লনও বলেছেন, ললিতাদিত্য অখণ্ড প্রস্তর দ্বারা মার্তণ্ডমন্দির প্রস্তুত করেছিলেন। যাঁর কীর্তিই হোক, এত কাছে এসেও [illegible] দুর্লভ কীর্তি দেখার সৌভাগ্য হ'ল না বলে দুঃখ হ'ল মনে। আমাদের বাস সেখানে যাবে না। তাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই আবার বাসে উঠলাম। পূর্ণবেগে ছুটে চলল বাস তার গন্তব্যপথে।

বাসের জানালা দিয়ে দূর থেকেও মার্তণ্ডমন্দির আমার চোখে পড়ল না। তবু ঐ মন্দিরের কথাই ভাবছিলাম। মনে পড়ল এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাশ্মীরের আর একজন বিখ্যাত রাজার নাম—রাজা হর্ষ।

ললিতাদিত্য যেমন বীর এবং দিগ্বিজয়ী হিসেবে ভারতের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন, তেমনি নানা গুণের অধিকারী এই রাজাও কাশ্মীরের ইতিহাসে বিশেষ স্থান পেয়েছেন। রাজা হর্ষের পিতা রাজা কলস এই মন্দিরে এসে প্রাণত্যাগ করেন। [illegible]আবহমান কাল থেকেই তীর্থস্থানে মৃত্যু হিন্দুধর্মে চিরঈপ্সিত বস্তু। কিন্তু রাজা কলসের মৃত্যুর একটু ইতিহাস আছে। বড়ই করুণ সে কাহিনী।

রাজা কলসের দুই পুত্র। উৎকর্ষ ও হর্ষ। ছোট ভাই হর্ষ যেমন রূপবান তেমনি গুণবান। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুকবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতকারও বটে।

তাঁর রচিত সঙ্গীত চারণদের মুখে মুখে কাশ্মীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। গৃহস্থের ঘরে ঘরে যেমন তাঁর গানের আদর তেমনি শস্যক্ষেত্রে কর্মরত কৃষকদের কণ্ঠে এবং পাহাড়ে উপত্যকায় মেষপালকদের কণ্ঠেও তাঁর গানের কলি শোনা যেত। তাঁর গান এত হৃদয়স্পর্শী যে সে সঙ্গীত শ্রবণে কেউ চোখের জল রোধ করতে পারে না। হর্ষ নির্জন গৃহে একমনে সঙ্গীতরচনা ও সঙ্গীতসাধনায় মগ্ন থাকেন।

হর্ষ এবং উৎকর্ষ দুটি ছেলেই পিতৃভক্ত। রাজা কলস তাই বৃদ্ধ বয়সেও নিশ্চিন্ত মনে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করেছেন।

কিন্তু রাজঅমাত্য ও মন্ত্রীবর্গের এতটা শান্তি সহ্য হ'ল না। তাই তারা রাজপুত্র হর্ষকে পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। বলতে লাগল, রাজার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে এখন ছেলেকে সিংহাসন দিয়ে কোন তীর্থস্থানে চলে যাওয়াই তাঁর উচিত।

প্রথমে হর্ষ অমাত্যদের কথায় বিরক্ত হয়ে তাদের তিরস্কার করে বিদায় দিলেন। কিন্তু তারা অপমানিত হয়েও হাল ছাড়ল না। কারণ তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কম নয়। তরুণ রাজপুত্র এখন বিরক্ত হলেও একদিন যে তাদের কথা শুনবেই, এ বিশ্বাস তাদের ছিল। তাদের স্বার্থ—হর্ষ রাজা হলে তাদের হাতেই ক্ষমতা আসবে। হর্ষ হয়তো নিজের মনে কাব্য এবং সঙ্গীত-চর্চা করেই কাল কাটাবে। এদিকে ফিরেও দেখবে না। এই কারণেই উৎকর্ষের চেয়ে হর্ষ তাদের অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত মনে হয়েছিল।

বার বার প্ররোচনা ও প্রলোভনে কাজ হ'ল। হর্ষ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন পিতার বিরুদ্ধে। এবং একজন গুপ্তঘাতককেও নিযুক্ত করলেন পিতাকে হত্যা করার জন্য।

রাজা কলস কিন্তু এই চক্রান্ত বুঝতে পেরেই বন্দী করলেন হর্ষকে। কিন্তু সন্তানস্নেহে অন্ধ রাজা ছেলেকে কারাগারে রোজ নিজের আহার্য থেকে অন্নব্যঞ্জন পাঠাতে লাগলেন। কারাগারের কদর্য আহার্য ছেলে খাবে কি করে এই ভেবে।

হর্ষ কিন্তু সে আহার্য ছুঁতেনও না। তাঁর ভয় হ'ত পিতা বুঝি তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চান। রাজা কলস এ সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। অবশেষে ছেলেকে মুক্তি দিয়ে তার সব অপরাধ ক্ষমা করার জন্য পিতার কাছে ডেকে পাঠালেন। পরম স্নেহে হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে জানতে চাইলেন, সে কি স্ব-ইচ্ছায় এ কাজ করতে চেয়েছিল? হয়তো বৃদ্ধ পিতা আশা করেছিলেন ছেলে অস্বীকার করবে তার অপরাধ।

হর্ষ হয়তো তখন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছিলেন নিজের কাজে। কিন্তু কোন জবাব দেননি।

রাজা কলস পুত্রের মুখে অপরাধীর ভাব দেখে বুঝতে পারলেন তার জীবন-নাশ পুত্রের অভিপ্রায় ছিল। তিনি তারপর নিজের জীবনে এতই বীতস্পৃহ হয়েছিলেন যে, একদিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় আসনের ওপর একটা ধারালো অস্ত্র রেখে তার উপর চেপে বসে পড়লেন। এভাবে বসাতে সেই অস্ত্রটি তাঁর শরীরে আমূল প্রবেশ করল। রানী বুঝতে পেরে যখন সেটা টেনে বের করলেন, অসম্ভব রক্তপাত হ'ল তাতে। কিন্তু কলস রাজবৈদ্যকেও সংবাদ দিতে দিলেন না। শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হতে লাগল। যখন বুঝলেন তাঁর আর জীবনের আশা নেই, তখন তীর্থস্থানে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন শুধু।

হর্ষ যদি একবার মুখ ফুটে বলতেন যে একাজ তিনি করতে চাননি, তাহলে হয়তো কলস এভাবে নিজের জীবন শেষ করতেন না। প্রজারা রাজা কলসকে ভালোবাসত। একথা জানতে পারলে হয়তো হর্ষের জীবনসংশয় হবে—রানী তাই প্রচার করলেন বৃদ্ধ রাজার অর্শ হয়েছে।

শ্রীনগর থেকে রাজা কলসকে মার্তণ্ডমন্দিরে নিয়ে আসা হ'ল। এখানে এসেও তিনি যতক্ষণ জীবিত ছিলেন তাঁকে তাঁর ইষ্টদেবের সামনে শুইয়ে রাখা হ'ল।

মন্দিরের বাইরে তখন এক চারণ হর্ষের রচিত গান গেয়ে চলেছে আপন মনে। গান কানে যেতেই পিতৃস্নেহে অন্ধ রাজার দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর মৃদুস্বরে হর্ষের নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন শুধু। ভুলে গেলেন ইষ্টনাম। মৃত্যুপথযাত্রী পিতার চোখ দুটি খুঁজে বেড়াতে লাগল সেই অপরাধী সন্তানকে। বুঝতে পেরে সঙ্গের এক অমাত্য তখন হর্ষের একখানি প্রতিকৃতি তাঁর চোখের সামনে ধরল।

দু-চোখের দৃষ্টিতে তাঁর ফুটে উঠল ক্ষমার সঙ্গে শেষ আশীর্বাদ। মুখে মৃদু হাসি। ইষ্টদেব নয়—সেই দুর্বিনীত ছেলের মূর্তি দেখতে দেখতেই রাজা কলস চির-দিনের জন্য শান্তিতে চোখ বুজলেন।

এরপর অবশ্য বড় ভাই উৎকর্ষের রাজা হবার কথা। কিন্তু হর্ষের তখন শোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্রের অবস্থা। যে করেই হোক সিংহাসন লাভ করতেই হবে। বড় ভাইকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত নন তিনি তখন। কুচক্রী অমাত্যদের সাহায্যে

উৎকর্ষকে পরাজিত করে হর্ষ নিজে রাজা হলেন কাশ্মীরের। অদ্ভুত পরিবর্তন হ'ল হর্ষ-চরিত্রের।

আমার মনে প্রশ্ন জাগল, রাজা হবার পর আর কোন সঙ্গীত রচনা করেছিলেন কি তিনি ?

দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছেন তিনি কাশ্মীরে। রাজা হর্ষের মত এমন বিপরীতধর্মী চরিত্র ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। তাঁর সুব্যবস্থায় প্রজারা সহস্র প্রকারের সুখ-সুবিধা ভোগ করেছে। আবার যথেষ্ট অসুবিধাও ভোগ করতে হয়েছে তাদের। তিনি দর্পোদ্ধতের দর্প চূর্ণ করতেন—আবার তাঁর আদেশ-লঙ্ঘনকারীর সংখ্যাও কম ছিল না। সদনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব দান করতেন তিনি। চম্পক বৎসরে সাতদিন নন্দীক্ষেত্রে বাস করতেন। এসময় তাঁর সমস্ত অর্থ—যা তিনি সারা বছরে সঞ্চয় করতেন সমস্তই বিলিয়ে দিতেন। দয়ালু রাজা এসময় কোন প্রার্থীকেই নিরাশ করতেন না। আবার ভয়ঙ্কর নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর দ্বারাই।

তাঁর রূপের খ্যাতি ছিল। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। কেউ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস করত না।

বিলাসী রাজা দিবসে দুই প্রহর পর্যন্ত নিদ্রিত থাকতেন। তাই রাত্রিকালে তাঁর রাজসভার অধিবেশন হ'ত। সহস্র দীপ জ্বলে উঠত এসময়। কবি, গায়ক ও নর্তকীরা সমস্ত রাত্রি উৎসবে যাপন করত। কোন প্রসঙ্গ শেষ হলে বিরতির সময় শুধু তাম্বূল চর্বনের শব্দ এবং নর্তকীদের কবরীচ্যুত শেফালী পুষ্পের পতন-জনিত মর্মরধ্বনি শ্রুতিগোচর হ'ত। কোন ব্যক্তি এসময় উপযুক্ত সাজ-সজ্জা এবং অনুচর সঙ্গে না নিয়ে তাঁর সভায় প্রবেশ করার অনুমতি পেতো না। মাথায় উষ্ণীষ এবং স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত না হলে তাকে কোন কারণেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হ'ত না।

মনে হ'ল কবি তাঁর রাজসভার যা বর্ণনা করেছেন তা বুঝি ইন্দ্রসভার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। তাঁর অন্তঃপুরে ডোম এবং চণ্ডাল ব্যতীত সকল জাতির সুন্দরীই ঠাঁই পেয়েছিলেন।

রানী বসন্তলেখা শ্রীনগরে মঠ, অগ্রহার এবং ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু হর্ষ নিজের নামে কোন মঠ বা মন্দিরস্থাপনা করেননি। পিতা কলস কৃপণ ছিলেন। তাঁর সঞ্চিত ধনরত্ন তিনি দু'হাতে ব্যয় করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর প্রতি সদয় হননি, বরং বিদ্রূপ করে তাঁর নাম

দিয়েছিলেন 'পাপসেন'।

মনে মনে আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম, কবি এবং বিদগ্ধ একজন নৃপতির এ কেমন চরিত্র!

এই অনাচারী রাজার মৃত্যুও ঘটেছিল অদ্ভুত ভাবে। জ্ঞাতিভাই উচ্চলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। কোনখানে আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর রাজা এক ভিক্ষুকের পরিত্যক্ত কুটিরে লুকিয়ে ছিলেন। জানতে পেরে সেখানেই এক গুপ্তঘাতক হত্যা করে তাঁকে।

সবই অদ্ভুত তাঁর জীবনের। রাজা হর্ষের উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া জীবনের শেষ পরিণতিও কি করুণ এবং মর্মান্তিক!

তাঁর সঙ্গীতের মত তাঁর মৃত্যুও কি কারো চোখে জল এনেছিল?

॥ ৩২ ॥

আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। বাস এসে দাঁড়ালো 'অনন্তনাগে'। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সুন্দর স্থান। পর্বতের সানুদেশে মন্দির। সেখানে গিয়ে দেখি পুকুরের মত বেশ বড় একটা কুণ্ডের মাঝখানে ছোট একটা মন্দির। মন্দিরের দুয়ার বন্ধ, তাই ভেতরের বিগ্রহ দর্শন হ'ল না। এপাশে কুণ্ডের ধারে এক ঘরে শিবলিঙ্গ, অন্যটায় দেয়ালে 'অনন্তশায়ী' নারায়ণের পট টাঙানো আছে দেখতে পেলাম। বড় বড় গাছের ছায়াঘেরা স্থানটি ভালো লাগল। আমরা কুণ্ডের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এমন সময় দেখি আমাদের সেই পাণ্ডা এসে হাজির। তার কাছেই শুনলাম, 'অনন্তনাগ' ঝরণার উৎসমুখ বাইরে। সেই জল এই কুণ্ডে এক পথে প্রবেশ করে আবার অন্য পথে বেরিয়ে যায়। পাণ্ডাজী মুখে মুখে আমাদের গল্প শোনাচ্ছিলেন। বহুকাল আগে এক রাজা নাকি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন এখানে দ্বারকার মত এক পুরী নির্মাণের। তিনিই এই মন্দির স্থাপনা করে গেছেন। কতকাল আগের এই মন্দির কেউ নাকি জানে না। গল্প শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ল রাজতরঙ্গিনীতে কবি কহ্লন এমনি এক কিংবদন্তীর কথা লিখেছেন।

রাজা জয়াপীড় নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাশ্মীরে দ্বারকার মত এক পুরী নির্মাণ করেন। সেই মন্দির নির্মাণের সময় তিনি লঙ্কায় দূত পাঠালেন ওখান থেকে

ভালো কারিগর পাঠানোর জন্য। লঙ্কায় তখন বিভীষণ রাজা। তিনি সেই দূতকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের দেশ থেকে গিয়েছে ঐ দূত। আর রাম মানুষ ছিলেন বলেই মানুষ মাত্রই তাঁর প্রিয়।

বিভীষণ সেই দূতের সঙ্গে পাঁচজন দক্ষ কারিগর পাঠালেন। তারা এই মন্দির এবং জলাশয় নির্মাণ করল। রাজার সেই দূত লঙ্কায় যাবার সময় নাকি সমুদ্রে তিমি মাছের কবলে পড়ে। পরে বহু কষ্টে রক্ষা পায়। জয়াপীড় এইভাবে যে পুরী নির্মাণ করলেন তার নাম দিয়েছিলেন 'জয়পুর'। কিন্তু যে জলের উৎস থেকে এই জলের কুণ্ড পূর্ণ হচ্ছে তার নাম অনুসারেই হয়তো পরে এস্থানের নাম 'অনন্তনাগ' হয়ে গেছে।

অষ্টম শতাব্দীতে ললিতাদিত্যের রাজত্বের পর তাঁর পুত্রেরা কিছুদিন রাজত্ব করেছে। তারপর হয়তো সেই শতাব্দীর শেষভাগে জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসন পেয়েছেন। প্রায় বারোশত বৎসর পূর্বের কাহিনী। লোকের মুখে মুখে এই কাহিনীর কত নূতন সংযোগ হয়েছে তার ঠিক কি? যাই হোক আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে এই সব প্রাচীন কিংবদন্তী শুনতে। আর কাশ্মীর তো কিংবদন্তীরই দেশ!

মাঝখানে আবার এ জায়গাটার নাম হয়েছিল ইসলামাবাদ। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অধীনে ইসলাম খান নামে এক শাসনকর্তা ছিলেন এখানে। সম্রাট তাঁর নাম অনুসারেই স্থানটির নামকরণ করেছিলেন।

বহুদিন পর আবার 'অনন্তনাগ' নাম ফিরে এলো। কাশ্মীরের মহারাজা গুলাব সিং পুরাতন নামের পুনঃপ্রচলন করলেন।

মনে হ'ল কাশ্মীরের রাজারা রাজধানী শ্রীনগরেই শুধু মঠ-মন্দির স্থাপন করেননি, সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যেরই মনোরম স্থানগুলি বেছে নিয়ে তাঁরা তাঁদের কীর্তি রেখে গেছেন। শুনলাম শ্রীনগরের পর অনন্তনাগই সব চেয়ে বড় শহর। আমরা অবশ্য শহরের ভেতর ঢুকলাম না। তবে গাইড-বইতেও দেখেছি লোকসংখ্যার দিক দিয়ে শ্রীনগরের পরই অনন্তনাগের স্থান। এখানে অজস্র স্প্রীং আছে। এখানকার দক্ষ শিল্পীদের হাতের কাজ বিখ্যাত। এখান থেকেই আখরোট কাঠের ওপর খোদাই-এর কাজ করা সুদৃশ্য আসবাবপত্র এবং সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের নিদর্শন শাল-শাড়ী ইত্যাদি ভারতের বাইরেও বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। আচ্ছাবলের পথের ধারে রাজগীরের মত এখানেও একটা গন্ধক-মিশ্রিত জলের ঝরনা আছে। এখানে মুসলমানদেরও বহু পবিত্র জিয়ারত আছে।

আমরা ফিরে গিয়ে বাসে বসলাম। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাণ্ডাজী আমাকে বললেন, মা, এখানে অনেক জিনিস দেখার আছে। কষ্ট করে এ গরীবের বাড়ীতে একদিন থাকলে ভালো করে দেখাতাম সব কিছু।

পথের ধারেই আম বাগানের মত বড় বড় গাছের ছায়ায় একটা টিনের বাড়ী দেখিয়ে বললেন—ঐটেই ওঁর বাড়ী। বেশী দূরও নয়।

ওঁর মনে হয়েছে মন্দির দেখানোর সময় যে গল্প করে শোনাচ্ছিলেন, আমরা সেকথা বিশ্বাস করিনি হয়তো। তাই বোধ হয় আবার আমাকে বললেন, পুরাতন পুঁথি আছে আমার ঘরে, দেখাতাম আপনাদের। গরীবের ঘরে থাকতে আপনাদের কষ্ট হবে হয়তো কিন্তু যত্নের ত্রুটি হবে না।

পুরাতন পুঁথির কথা শুনে তা চোখে দেখার যথেষ্ট লোভ হয়েছিল। যদিও জানি যে লিপিতে লেখা তার এক বর্ণও আমার বোধগম্য হবে না। কিন্তু তখন আর নামার উপায় নেই। এক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে। তাকিয়ে দেখি বিভিন্ন বয়সের অপূর্বসুন্দর কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পাণ্ডাজীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হ'ল না এরা পাণ্ডাজীর সন্তান। পিতার দারিদ্র্যের ছাপ এদের মলিন বেশে। এবার উনি শূন্যহাতে ফিরেছেন পহলগাম থেকে। এদের জন্য হাতে করে কিছুই আনতে পারেননি। কি মনে হ'ল জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পাঁচটা টাকা দিলাম পাণ্ডাজীর হাতে।

পাণ্ডাজী হয়তো এতটা প্রত্যাশা করেননি। দেখি তাঁর চোখের কোণে জলের আভাস চিক্‌চিক্ করে উঠল। মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি। ওঁর নাম-লেখা একখানি ছোট কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, কখনও যদি আবার এদিকে আসেন, আমার কুঁড়েতে উঠবেন। আমি আপনাদের অমরনাথ দর্শন করাতে পারিনি মা—, আরো কি যেন বলছিলেন কিন্তু গাড়ির গর্জনে আর শোনা গেল না। বাস ছেড়ে দিল। আমিও আর ফিরে তাকালাম না ওদিকে। কাগজটুকু রেখে দিলাম ব্যাগে।

আমার মনে হ'ল এই ফুলের মত শিশুদের কথা মনে করেই হয়তো উনি আমাদের সঙ্গে সেদিন ঐ দুর্যোগে যেতে রাজী হননি। ওঁর কোন বিপদ ঘটলে এদের কে দেখত? অর্থের খাতিরেও তাই উনি বিপদের ঝুঁকি নিতে পারেননি। আমাদেরও নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন।

পহলগামে কিন্তু সেদিন ওঁর কথাগুলো শুনতে আমার ভালো লাগেনি। মনে হয়েছিল ওভাবে ভয় দেখিয়ে হয়তো আমাদের কাছে বেশী টাকা আদায় করতে

চান। কিন্তু কই আজ পর্যন্ত টাকার কথা তো কখনও বলেননি আমাকে! আজও হাত পেতে নিতে ওঁর সঙ্কোচ হচ্ছিল টের পেয়েছি। পাণ্ডাজীর ছলছল চোখ দুটি মনে পড়ল আমার। আজ আমার ভুল ভাঙল। নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল, এতদিন এই নির্লোভ ব্রাহ্মণকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করেছি বলে।

বাস ছুটে চলেছে তার গন্তব্যপথে। অন্য কোনদিকে মন দিতে পারছি না। বার বার পাণ্ডাজীর মুখখানা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। মনে হ'ল ওঁর নামলেখা কাগজখানা কখনও যদি হারিয়েও যায়, কিন্তু ভুলব না এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে।

॥ ৩৩ ॥

ভাবছিলাম কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা চিরকালই দরিদ্র। সেকালে এঁরা অর্থোপার্জনের দিকে মন না দিয়ে বিদ্যার্জনের দিকেই বেশী ঝুঁকেছিলেন। এককালে সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ছিল কাশ্মীর। অবশ্য তখনকার দিনে রাজারা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এই ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণকে দান করা তখনকার দিনে রীতি ছিল। বিদ্বান এবং গুণীর আদর ছিল কাশ্মীরে। তেমনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের প্রতাপও ছিল দোর্দণ্ড। অনেক সময় রাজ্যশাসনে রাজারা তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। রাজা কোন অন্যায় কাজ করলে ব্রাহ্মণরা তার প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করতেন না।

কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে রাণী যশোবতীকে বসানোর জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে আসতে হয়েছিল কাশ্মীরে। কারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা আপত্তি তুলেছিলেন সেসময়। আবার রাজা জয়াপীড়ের মৃত্যুও নাকি এই ব্রাহ্মণদের অভিশাপে। সেও কিংবদন্তীর মতই এক কাহিনী।—

রাজা জয়াপীড় বিখ্যাত রাজা কাশ্মীরের। বিদ্যায় জ্ঞানগরিমায় উজ্জ্বল ছিল তাঁর চরিত্র। গুণীর আদরও করতেন তিনি। যে কোন লোকের মধ্যে গুণের পরিচয় পেলে সম্মান করতেন তাঁকে। তাঁর এক মন্ত্রীর পাবকের পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাকেও রাজসভায় ডেকে এনে সম্মানিত করেছেন তিনি। নানা দেশ থেকে গুণী ব্যক্তি এসেছে কাশ্মীরে জয়াপীড়ের আগ্রহে। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের প্রচুর দানধ্যান করতেন। কবি বলেছেন যেমন দুখানা আয়না সামনে পেছনে রাখলে একই মানুষের বহু প্রতিমূর্তি দেখা যায়, তেমনি এক জয়াপীড় যেন সহস্র জয়াপীড় হয়ে

ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু শেষজীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন হ'ল তাঁর। উনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে মহাপদ্ম নামে নাগরাজ যেন ওঁকে দেখা দিয়ে বলছেন যে একজন মন্ত্রসিদ্ধ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ তাঁকে নিয়ে যেতে চায়। মরুভূমিতে জলকষ্ট নিবারণের জন্য সেখানকার অধিবাসীরা প্রচুর অর্থ দিয়েছে ঐ ব্রাহ্মণকে। নাগরাজকে ধরে নিয়ে যেতে পারলে তাদের জলকষ্ট দূর হবে। নাগরাজ মহাপদ্ম যে সরোবরে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করছেন জানালাম রাজাকে। আর তিনি যদি মহাপদ্মকে রক্ষা কবতে পারেন তবে এক স্বুবর্ণ-প্রসবকারী পর্বতের সন্ধান দেবেন তাঁকে।

পরদিন প্রভাতে সন্ধান নিয়ে জানা গেল সত্যি এক দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ এসেছে কাশ্মীরে। তাকে ধরে আনা হলে সে স্বীকার করল। জয়াপীড় দেখতে চাইলে সে মন্ত্রের বলে সরোবরের সব জল শুকিয়ে ফেলল। তখন সত্যি দেখা গেল মহাপদ্মকে, যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। আর দেখা গেল তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের। আধহাত লম্বা ছোট ছোট সাপ কিন্তু তাদের মানুষের মত মুখ। তারা লজ্জায় মুখ ঢাকতে চায়, কিন্তু জল কোথায় যে মুখ লুকোবে! তাই করুণভাবে মহাপদ্মের মুখের দিকে তাকাচ্ছে সব। নাগরাজ এতে খুব চটে গেলেন। কারণ তার মনে হ'ল এভাবে তাঁর স্ত্রীদের অপমান করা হ'ল। জয়াপীড যদিও সে ব্রাহ্মণকে সাপ ধরতে দেননি তবু তার রাগ গেল না। তাই সোনার পর্বত আর দেখালো না জয়াপীডকে। তবে শেষে জয়াপীড়ের অনুরোধে একটা পাহাড়ের সন্ধান দিল, যেখানে তামা পাওয়া যায়।

এই তামার পাহাড়ের সন্ধান পেয়েই কিন্তু জয়াপীড়ের ধনলিপ্সা এত বেড়ে গেল যে তাঁর স্বভাবের একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেল। আগে গুণীজনের আদর করতেন। বহু অর্থ দান করতেন তাঁদের। এখন শুধু পরস্ব অপহরণের দিকে মন গেল। এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার এমন কি ব্রহ্ম-হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। বহু ব্রাহ্মণ তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চন্দ্রভাগার জলে প্রাণত্যাগ করল। লোকে তখন তাঁকে বিদ্রূপ করে পাণিনির সঙ্গে তুলনা করতে লাগল। পাণিনি কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করছেন আর রাজার অত্যাচারে গুণীদের প্রত্যয় নষ্ট হচ্ছে।

একদিন রাজা জয়াপীড় চন্দ্রাতপের নীচে বসে আছেন। কয়েকজন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে অভিশাপ দিল যে এমন অত্যাচারী রাজার মৃত্যু হোক।

রাজা তাঁদের কথা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ঠিক সেই

মুহূর্তেই তাঁর চন্দ্রাতপের প্রধান দণ্ডটি অকস্মাৎ তাঁর মাথায় ভেঙে পড়ল। আর সেই আঘাতেই জয়াপীড়ের মৃত্যু ঘটল।

মনে হ'ল পিতামহ ললিতাদিত্যের মত হতে চেয়েছিলেন তিনি। বিদ্যানুরাগী জয়াপীড় শেষজীবনে তাঁর মতই স্বৈরাচারী হয়ে উঠলেন। তাই বুঝি তাঁর মৃত্যুও হ'ল সেইভাবেই। দুজনেই দৈব দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারালেন।

মনে পড়ল এই পথেই সোফালেম বলে একটা জায়গা আছে। কোকড়নাগ থেকে কিছু দূরেই। সেখানে নাকি একটা পুরাতন খনির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। সেইটেই সেই তাম্রখনি নয়ত? অনন্তনাগ থেকে কোকড়নাগ মাত্র তেরো মাইল পথ। জয়াপীড় হয়তো খনির সন্ধান পেয়ে শ্রীনগর থেকে অনন্তনাগেই ছিলেন এসে। এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটেনি তো?

কবি কহ্লন তাঁর রাজতরঙ্গিনী কাব্যে বাহান্ন জন রাজার ইতিহাস এবং রাজ্য-শাসন প্রণালী বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ললিতাদিত্য এবং জয়াপীড়, পিতামহ এবং পৌত্র এই দুজন বিখ্যাত নৃপতির অসামান্যতা বোঝাতে গিয়ে তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনার কথাই লিখেছেন। তবে প্রায় বারোশত বৎসর পূর্বের সেই যুগের আর কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না বলেই হয়তো এখনকার ঐতিহাসিকরাও ললিতাদিত্য এবং জয়াপীড়ের কথা লিখতে গিয়ে রাজতরঙ্গিনীর কথা উল্লেখ না করে পারেন না। তাই মনে হয় কাব্য হলেও সেটা যে ইতিহাস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবিও সেকথা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে, রাজতরঙ্গিনী শুধু কাব্য নয় ইতিহাসও বটে।

॥ ৩৪ ॥

'আছাবলে' এসে সত্যি আমার ভারী ভালো লাগল। কাশ্মীরে এসে এই প্রথম চোখে পড়ল একসঙ্গে অজস্র ফুল। পাহাড়ের গা বেয়ে থাকে থাকে নেমেছে এই উদ্যান। নীল আকাশের গায়ে পাহাড়ের মাথা ঠেকেছে। ঝাউবনের ফাঁকে ফাঁকে চুনা পাথরের সাদা অংশগুলো চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন বরফ জমেছে পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড়ের বুকে অজস্র ফোয়ারা। নির্ঝরের জলধারাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই মিলিত হয়ে জলপ্রপাতের মত নেমে এসে নীচের দিকে একটা তটিনীর আকারে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। কাশ্মীর সরকার এই জলেই 'ট্রাউট'

মাছের চাষ করেছেন। কিন্তু তাঁদের ধন্যবাদ দিলাম মনে মনে শুধু মাছের চাষ না করে ফুলের আবাদও করেছেন বলে। কিছু ফুল চেনা আবার কিছু নাম-না-জানা ফুল। ওরা ওপরের দিকে গেছে, আমি নীচেই ঘুরে ঘুরে সমগ্র ছবিটা দেখছিলাম।

কিন্তু শুধু ফুল নয়। জলের ধারে এসে কিসের টানে যেন দাঁড়িয়ে পড়লাম। নদীনালায়-ঘেরা পূর্ব বাংলার মেয়ে আমি। তাই জলের এই মিষ্টি কুলু কুলু ধ্বনি আমার বড় চেনা। পায়ের চটিটা খুলে রেখে ভিজা মাটির ওপর পা রাখলাম। লোভ সামলাতে না পেরে ঘাসের ওপর বসে পড়ে জলে পা নামিয়েছি, দেখি ওধার থেকে দুজন বাঙালী ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছেন। উঠে দাঁড়াবো কিনা বা কি করব ভাবছি। দেখলাম ওঁরা আমার দিকে না তাকিয়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন।

এ বাগান কার তৈরী তাই নিয়ে কথা চলছে। একজন বলছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর, আর একজন বলছেন সম্রাট সাজাহানের নাম। দুজনের কথার সুরেই প্রত্যয়। কথা শুনলে মনে হয় যেন ইতিহাসের ছাত্র। কিন্তু আসলে হয়তো দুজনের একজনও ইতিহাসের ধার ধারেন না। পেশায় ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে মজা দেখেছি বেড়াতে বের হলে সকলেরই কিছু কিছু ছোটবেলায় পড়া ইতিহাসের কথা মনে পড়ে যায়। তখন নীরস মনে হলেও এ সময় বেশ সরস মনে হয় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো। আমারও মনে পড়ল 'মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা' বলে একখানা চটি বই পড়েছিলাম কবে যেন। বইখানা স্যার যদুনাথ সরকারের ভূমিকা লেখা। তাতে লিখেছে সাজাহান-কন্যা জাহানারা কবি ছিলেন। তাঁর সুন্দর কবিতার মতই কাশ্মীরের 'আচ্‌বল' নামে অপূর্ব উদ্যানও তাঁর রচনা। সাজাহান বা জাহাঙ্গীর নয়, এ উদ্যান রচনা ও পরিকল্পনা জাহানারার।

মনে হ'ল এ উদ্যান রচনায় জাহানারা সত্যি কবিমনের পরিচয় রেখে গেছেন। কোনখানে কৃত্রিমতা নেই। বাঁধানো ঘাট বা বসার কোন বেদী নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা স্রোতস্বতী নির্ঝরিণীর দুপাশে সরস ভেজা মাটি। ইচ্ছে করলে ফুলবাগিচার ভেতরে সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাটিতে বা গাছের ছায়ায় বসে পড়া যায়। মনে পড়ল জাহানারার প্রকৃতিপ্রেম। মৃত্যুর পরও তাঁর কবরে যেন শ্যাম তৃণ-আচ্ছাদন ছাড়া আর কোন আস্তরণ না থাকে বলে গিয়েছিলেন সেকথা।

আর একজনের কথাও মনে পড়ল। আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবউন্নিসা। তিনিও কবি ছিলেন। সফীউদ্দিন নামে এক কবিকে তিনি নাকি ভালোভাবে

সাহিত্য এবং কাব্যচর্চার জন্যই নিজের খরচে কাশ্মীরে রেখেছিলেন। পিসীমা এবং ভাইঝি দুজনেই যেমন কবি ছিলেন, তেমনি অকবি অদরদী এবং বাস্তববাদী সম্রাট আওরঙ্গজেবের রূঢ় আঘাতে দুজনেই শেষ জীবনে দুঃখ পেয়ে গেছেন।

শান্ত নির্জন পরিবেশে প্রায় সাড়ে আট হাজার ফিট উপরে এই উদ্যান। তাই প্রভাত না হলেও মধ্যাহ্নের খরতাপ নেই। বড় বড় চেনার গাছের শীতল ছায়ায় ঘেরা মনোরম স্থানটি। ঘন পাতার ফাঁকে সূর্যরশ্মি এসে জলের ওপর আলোছায়ার আলপনা এঁকেছে। ছায়াটা দুলছে ঝিলমিলিয়ে। পাখীর মিষ্টি ডাক কানে আসছে। মনে হ'ল এই চেনারের ছায়ায় বসেই হয়তো কোন কবি কাব্য রচনা করে থাকবেন।

কবি না হলেও কবিগুরুর দেশের মাটিতে জন্ম আমার। তাই বুঝি বাগানের নিরালা এই কোণটিতে বসে আমার প্রাণেও কাব্যের ছোঁয়া লাগল। মনের মাঝে গুনগুনিয়ে উঠল তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান!
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, আমার খোঁজে ওরা এদিকে আসছে সাড়া পেয়েই স্বপ্নভঙ্গ হ'ল আমার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গ নিলাম ওদের।

॥ ৩৫ ॥

'কোকড়নাগ' যখন পৌঁছালাম তখন বিকেল হয়ে গেছে, বাস থেকে নেমে প্রথমেই চোখে পড়ল বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী ও শিশু নানা বর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বাগানে এবং লেকের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতায় লেকের ধারে যেমন দেখি। আমাদের আসার আগেই শ্রীনগর থেকে আরো কয়েকটি বাস এসেছে এদের নিয়ে।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিরাট ময়দান। তারই মাঝে ফুলবাগান। তবে সমতলে আছি বলে ভুল হবার কারণ নেই। সামনেই অরণ্যময় পর্বত। সেখান থেকেই ঝরণার জল নেমে এসে এই লেকের সৃষ্টি করেছে। এখানকার উচ্চতা কতটা

জানি না। তবে কাশ্মীরের এই একটা বৈশিষ্ট্য দেখছি সাত-আট হাজার ফিট ওপরেও তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি দেখে পাহাড়ে এসেছি সেকথা ভুলে যেতে হয়।

বাঁদিকের পথ ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম। টুরিস্ট অফিস, রেস্ট হাউস ছাড়িয়ে একটু উঁচুতে কয়েকটি কটেজ। মনে হ'ল বিদেশী দম্পতি এসেছে কাশ্মীর ভ্রমণে। এরাই কাশ্মীরের লক্ষ্মী। তাই কাশ্মীর সরকার বিদেশী পর্যটকদের থাকার জন্য সব রকমের ভালো ব্যবস্থা করেছেন। ওধারে ফুলবাগানের ভেতরেও সবুজ রংএর ছোট ছোট তাঁবু খাটানো রয়েছে। যার যেমন অভিরুচি থাকতে পারেন।

লেকের ধার দিয়ে পথ। দুধারে ফুল। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে দেখি একটা পায়ে চলা পথ রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। ওপথ দিয়ে লেকের ওপারে যাওয়া যায়। কিন্তু তার তলা দিয়েই তোড়ে জল বেরিয়ে আসছে। মাটির পাহাড়। তাই জলে ভেজা পথটুকু একটু সাবধানে পার হতে হ'ল। পাহাড়ের গায়ের আগাছাগুলো ধরে ধরে পার হচ্ছিলাম। অন্য ভালো পথও আছে। একটু আগেই একটা বাঁধানো পুলও আছে। বেশির ভাগ লোকই পুলের ওপর দিয়ে পার হচ্ছে। তবে এভাবে পাহাড়ী পথে যেতেই ভালো লাগছিল। আবার ভয়ও করছিল। যদি জলে পড়ে যাই! বলা তো যায় না এখানে কত জল?

জলে পড়ার কথা মনে হতেই গা ছমছম্ করে উঠল। কাশ্মীরে নাগেদের নিয়ে যত গল্প আছে এখানেও কোন নাগটাগ নেই তো? ওমনি মনে হ'ল 'কর্কট নাগের' নামেই হয়তো কোকড়নাগ নাম হয়েছে এই ঝরণা এবং জায়গাটার। মনে পড়ল সে কাহিনী।

গোনন্দ বংশের শেষ রাজা বালাদিত্যের মৃত্যুর পর কর্কটনাগ বংশজাত জামাতা দুর্লভবর্ধন রাজা হলেন। এঁর অবশ্য রাজা হবার কথা নয়। কারণ তিনি বালাদিত্যের অশ্বের খাদ্যরক্ষকের কাজ করতেন। বালাদিত্যের কন্যা অনঙ্গলেখা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু এক দৈবজ্ঞ গণনা করে রাজাকে বলেছিলেন যে গোনন্দ বংশের এখানেই শেষ হবে। এবং এই কন্যাকে যে বিবাহ করবে সেই জামাতাই এখন থেকে এই বংশের রাজা হবে। এই কথা জানতে পেরে রাজা অন্য বংশের কোন রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে তাঁর অশ্বের খাদ্যরক্ষকের হাতেই কন্যা সম্প্রদান করলেন, যাতে সে কখনও রাজসিংহাসনে বসতে না পারে। তিনি জানতেন না যে নাগশ্রেষ্ঠ কর্কট দুর্লভবর্ধনের পিতা।

দুর্লভবর্ধন নিজেও প্রথমে জানতেন না সেকথা। কারণ তাঁর পিতা নাগরাজ

কর্কট তাঁর মায়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে মিলিত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। এই অবৈধ মিলনের কথা তাঁর মা বলতে পারেননি কারো কাছে। পুত্রের কাছেও বহুদিন গোপন রেখেছিলেন তার পিতৃপরিচয়।

দুর্লভবর্ধনও খুব সুপুরুষ ছিলেন। বিয়ের পর তিনি তাঁর শ্বশুরকে রাজকার্যে সব রকম সাহায্য করতে লাগলেন। তাঁর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি এবং রাজ্যপরিচালনার দক্ষতায় তিনি চমৎকৃত হলেন। তাঁকে অসাধারণ প্রজ্ঞাশালী দেখে প্রজ্ঞাদিত্য নাম দিলেন তিনি।

কিন্তু যতই রূপগুণ থাক এবং শ্বশুর জামাইকে যতই স্নেহ করুন, ঘোড়ার সহিসের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে রাজপুত্রী অনঙ্গলেখা সুখী হলেন না এমন স্বামী পেয়েও। ফিরেও তাকালেন না স্বামীর দিকে। তিনি তাঁর পিতার এক মন্ত্রী খঙ্খকে প্রেম নিবেদন করলেন।

দুর্লভবর্ধন একদিন রাতে শোবার ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন একই পালঙ্কে খঙ্খ এবং অনঙ্গলেখা ঘুমিয়ে আছেন। দেখে মনে হ'ল এইমাত্র তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত রাজকন্যার শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও স্বাভাবিক ভাবে পড়ছে না। একটু যেন কাঁপা-কাঁপা নিশ্বাস থেমে থেমে নিচ্ছেন। শুভ্র ললাটে মুক্তাবিন্দুর মত স্বেদবিন্দু ফুটে আছে। তখনও শুকোয়নি। কবরী খুলে গিয়ে কুসুমজড়িত বেণীটি পালঙ্কের পাশে দুলছে। ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসির রেখা তখনও মিলিয়ে যায়নি। হয়তো কোন সুখস্মৃতির রেশ।

খঙ্খও গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত।

দুর্লভবর্ধন প্রথমে এ দৃশ্য দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। মনে হ'ল সেই মুহূর্তেই হত্যা করবেন খঙ্খকে। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। তাঁর মনের কোণে বুঝি কি এক দুর্বলতা ছিল স্ত্রীর প্রতি। ভালো করে চেয়ে দেখলেন অনঙ্গলেখাকে। ঘুমন্ত রাজকন্যার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দেখতে দেখতে মমতায় আর্দ্র হ'ল তাঁর মন। মনে হ'ল তাঁর মত ঘোড়ার সহিসের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে আদরিণী কন্যা যেন পিতার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই এভাবে বিপথে গিয়েছে। বিচারবুদ্ধি ফিরে এলো তাঁর মনে। ভাবলেন কি হবে খঙ্খকে বধ করে? এ মেয়ে কি কখনও সদয় হবে আমার প্রতি? বরং আরো বিরূপ হবে। তবে কেন শুধু শুধু নরহত্যার পাতকী হতে যাব?

কিন্তু তিনি যে এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন তারই প্রমাণ স্বরূপ খঙ্খের কাপড়ে লিখে রেখে গেলেন যে, ইচ্ছা করলেই তিনি তাকে বধ করতে পারতেন তবু যে

ক্ষমা করে গেলেন একথা যেন সে মনে রাখে।

নিদ্রাভঙ্গের পর খঙ্খ ঐ লিখন দেখে বুঝতে পারল সব। শ্রদ্ধা হ'ল তুর্লভ-বর্ধনের ওপর। কারণ আর কোন পুরুষ এ অবস্থায় দেখলে ক্ষমা করত না তাকে। সেই দিন থেকে খঙ্খ রাজকন্যার সংস্রব ত্যাগ করল। আর কিসে তুর্লভবর্ধনের মঙ্গল হয় সেই চিন্তা করতে লাগল। তুর্লভবর্ধনের এই মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে অনঙ্গলেখাও ক্রমে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। খঙ্খ সরে যাওয়াতে মন থেকে আপনিই মুছে গেল তার স্মৃতি। এঁরা তখন এক সুখী দম্পতি।

বালাদিত্যের মৃত্যুর পর খঙ্খের চেষ্টাতেই তুর্লভবর্ধন রাজসিংহাসনে বসলেন। শুরু হ'ল নাগবংশের।

অনঙ্গলেখা আর তুর্লভবর্ধনের ধর্মভীরু পুত্র রাজা প্রতাপাদিত্যই মহারাজ ললিতাদিত্যের পিতা। অর্থাৎ ভারতবিখ্যাত রাজা ললিতাদিত্যের পিতামহ আর পিতামহী এঁরা।

আমার মনে হ'ল তুর্লভবর্ধন যে ওদের ক্ষমা করেছিলেন সে কি শুধু তিনি জ্ঞানী ছিলেন বলে, না তাঁর নিজের জন্মবৃত্তান্ত মনে পড়েছিল—তখন তাই এদের ক্ষমা করতে পেরেছিলেন ?

লেকের এদিকটায় কেমন একটা আদিম আরণ্যক পরিবেশ। পাহাড়ের কোলে বড় বড় গাছের-জটলার মাঝে সরু পায়ে-চলা-পথ। চলতে চলতে আমার মনে হ'ল প্রায় তের-চোদ্দশ বছর আগে হয়তো এইখানেই দেখা হয়েছিল সেই সুন্দরীর নাগরাজ কর্কটের সঙ্গে। ঝরণার জলে স্নান সেরে সিক্তবসনে ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি। কিংবা হয়তো স্নানরতা সেই রূপসীকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন নাগরাজ।

কল্পনায় অতীতে বিচরণ করছিলাম। অনিলদার কথায় চমক ভাঙল।—এধারে কিছুই দেখার নেই, শুধুই জঙ্গল।

আমি একটু পেছনে পড়েছিলাম। বললেন, তাড়াতাড়ি এসো, ওদিকে আবার বাস না ছেড়ে দেয়।

এবার পুল পার হয়ে লেকের ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে যখন আমরা আবার ফিরে এলাম তখন বাসগুলো একে একে ছাড়ছে। আমাদের বাসও তক্ষুনি ছাড়বে মনে করে আমরা তাড়াতাড়ি দোকানের দিকে গেলাম। রাস্তার দুপাশের দোকানেই বেশ ভিড়। সবাই কিছু খেয়ে নিচ্ছে এখানে। কারণ শ্রীনগর পৌঁছাতে কত রাত হবে কে জানে! মনে হ'ল আমাদের মত টুরিস্ট, যারা একঝলক দেখে

নিয়েই ফিরে যেতে চায়, কাশ্মীর সরকার তাদের কথাও ভোলেননি। দোকানে চা এবং খাবার সব সময়েই রেডি। তবে ভিড় ঠেলে অতদূর এগোনো যাবে না। তাই আমরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে হাতে হাতেই খেয়ে নিচ্ছিলাম। দেখি কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল আমাদের।

সবার মুখেই এক বুলি, বিবিজী এক পয়সা দে, সাহেবান এক পয়সা দে।

বাচ্চাগুলো কি সুন্দর দেখতে! ফর্সা ফুটফুটে রং। গালগুলোও আপেলের মত টুকটুকে লাল। ময়লা ছেঁড়া জামা গায়ে, তবু দেখলেই মনে হয় কোলে তুলে নিই, একটু আদর করি। হয়তো এরা আশপাশের গ্রামেই থাকে। এদের মা-বাবাও সুন্দর নিশ্চয়ই।

আমি ওদের হাতে কিছু খাবার দিয়ে ভাবলাম এবার ওরা হয়তো চলে যাবে। কিন্তু আমার হাতে ঘড়ি দেখেই বোধ হয় ওদের ভেতর বয়সে বড় একটি ছেলে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, বিবিজী, কত্ত বাজে?

আমি ঠিক বুঝলাম না সময় জানাটা কি এমন জরুরী ব্যাপার ওর কাছে! তারপরই দেখি সবাই আমাকে ঘিরে ধরেছে আর সকলের মুখেই এক কথা— বিবিজী, কত্ত বাজে?

আমাকে অবাক করে দিয়ে যখন সব চেয়ে ছোটটি, বছর তিনেক বয়স হবে— সামনে এগিয়ে এসে ওদের স্বরে স্বর মিলিয়ে আধো-আধো বুলিতে প্রশ্ন করল কত্ত বাজে, তখন সবাই একসঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ল।

এতক্ষণে বুঝলাম এটা ওদের একটা মজার খেলা। আমারও মজা লাগল তাই হেসে ওদের সময় জানিয়ে দিয়ে বাসে উঠলাম। মনে হ'ল বিদেশী মাত্রেই ওদের কাছে সাহেব, বিবি। আর তাদের দেখেই বুঝি ঘড়ি সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে ওদের মনে। খেলার এই নূতনত্ব ওদের মনে আনন্দ যোগাচ্ছে প্রচুর।

আবার সেই চেনা পথেই ফিরে চলেছি। তবে এবার আর কোথাও থামবে না বাস। ধীরে ধীরে রাত নেমে এলো। আমরা যখন শ্রীনগর পৌঁছালাম তখন বেশ রাত। টুরিজিমের সেই বাড়িটাতে এসে বাস থামল।

এবার কিন্তু এখানে জায়গা পেলাম না আমরা। মহা মুশকিল হ'ল। এত রাতে কোথায়ই বা যাব? আমাদের অবশ্য ভাবতে হ'ল না বেশী। অফিসারটি আমাদের রাস্তার ওপাশের তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অগত্যা দুটো তাঁবু ভাড়া করে রাতের মত আশ্রয় নিলাম আমরা। একটাতে মাটিতে সতরঞ্চি পাতা। তার ওপর ওরা হোল্ডল বিছিয়ে নিল। আর আমরা চার জা পাশের তাঁবুতে ঢুকলাম।

যেখানে চৌকির মত লোহার খাট আছে। কোনরকমে বিছানাটা খুলে ঘুমিয়ে পড়লাম গিয়ে। সারাদিন পর বড় ক্লান্ত লাগছে এখন।

॥ ৩৬ ॥

সকালবেলা ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়েছে। তাঁবুর বাইরে বেরোতেই অনিলদা খবর দিলেন—এখানে থাকা যাবে না।

বললেন,—ব্যারোয়ারী বাথরুম পায়খানা। আর তা যা নোংরা! তোমরা ওদিকে যেতে পারবে না, তাই বালতি করে জল আনিয়ে রেখেছি। মুখ হাত ধুয়ে নাও।

কাল রাতে ভালো ঠাহর হয়নি। আর সারাদিন বাসে ঘোরার পর এত ক্লান্ত লাগছিল তাই কোনরকমে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আজ দেখি বিরাট ময়দানের চার পাশ দিয়ে অগুনতি তাঁবু। আর সবগুলো থেকেই পিল পিল করে বেরোচ্ছে মেয়ে আর পুরুষ। মাঝের অতবড় ফাঁকা জায়গাটাতেও বেশ লোক। কিন্তু সবাই মনে হ'ল একদিকেই যাচ্ছে, হাতে গামছা বা তোয়ালে, বালতি-মগ। অতএব ওদিকে না যাওয়াই ভালো।

যেন সর্বভারতীয় সম্মেলন। মনে হ'ল এত লোক এসেছে কাশ্মীরে বেড়াতে? তারপরই মনে পড়ল অমরনাথ থেকে ঘুরে দেশে ফেরার আগে কাশ্মীরটা একটু না দেখেই বা ফিরবে কেন লোক? তাদের জন্যই এই ঢালাও ব্যবস্থা করতে হয়েছে কাশ্মীর সরকারকে।

শুনলাম মণ্টু আর অসিত ঠাকুরপো বেরিয়েছে বোট ঠিক করতে। খুব ভালো খবর। কাশ্মীরে আসার সময়ই মনে হয়েছিল বোটে থাকতে হবে। শুনেছিলাম বোটে না থাকলে নাকি কাশ্মীরে আসাই বৃথা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এলো ওরা। সঙ্গে বোটওয়ালা। চেনা-চেনা মনে হ'ল। শ্রীনগর এসে প্রথম দিন রাতেই যেন দেখেছিলাম। ময়লা রং। মুখে একটু বসন্তের দাগ। রঙীন শার্টের ওপর একটা কালো জহরকোট ধরনের। মাথায় ফারের কালো কাশ্মীরী টুপি। পরনে পায়জামা।

সেদিন রাতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ডাল লেকের পথে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল মনে পড়ল।

যাই হোক আমরা তো বেঁধে-ছেঁদে তৈরীই ছিলাম। ওরা আসামাত্র টাঙ্গা করে রওনা হলাম। ডাল লেকের পাশে এসে টাঙ্গা দাঁড়ালো। বোটওয়ালা একটা শিকারায় করে তার বোটে নিয়ে এলো আমাদের। বোটের নাম 'হীরো অব্ দি ডে'। এমনি সব জমকালো নামের আরো কতকগুলো বড় বড় বোট পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে। শিকারা বোটের পাশে লাগতেই ওপর থেকে একটা ছোট কাঠের সিঁড়ি লাগানো আছে তাই বেয়ে বোটের ওপর উঠতে হ'ল আমাদের। এতগুলো লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়ানোর জন্য টলমল করছিল শিকারা। সিঁড়িটাও নড়তে লাগল। একটু ভয়-ভয় করছিল—জলে পড়ে যাব নাকি? দেখি অনিলদা ওপাশ থেকে হেঁকে উঠলেন,—ঠিক্‌সে পাকড়ো।

সিঁড়িটা ধরেছিল শিকারার মাঝি। সাহস দিল—কিছু ভয় নেই।

জলে পড়ে গেলে আর কি হ'ত! সাঁতার জানি। ভয় সেজন্য নয়। তবে জলটা দেখে কেমন যেন লাগল। আমাদের দেশে বিলের জলে যেমন এক রকমের জংলা লতা দেখা যায় ঠিক তেমনি ঘন জঙ্গল মনে হ'ল জলের তলায়। ওর ভেতর সাপখোপ নেই তো! সাপের কথা মনে হয়েই গা শিরশির করে উঠেছিল।

শিকারা থেকে বোটে উঠে প্রথমেই ড্রইংরুম। সুন্দর সোফা-সেটিতে সাজানো। প্রত্যেকটি কৌচের পাশে সাইড্ টেবিল। মাঝে সেণ্টার টেবিল। কাঠের নানা রকম সুন্দর সুন্দর দামী আসবাবপত্র, দেয়ালে পেণ্টিংস। টেবিলে সুন্দর সুন্দর এ্যাসট্রে। ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল। যেখানে যা দরকার সবই আছে। বোটের মালিক ঘরে ঢুকেই সুইচ্ বোর্ডে গিয়ে প্রথমেই গ্রীন লাইটটা জ্বালিয়ে দিল। হালকা সবুজ লেসের পরদা ঝুলছে দরজা-জানালায়। আলো জ্বলতেই যেন অদ্ভুত সুন্দর লাগল ঘরখানা। মালিক অবশ্য শুধু সবুজ বাতি জ্বালিয়েই থামেনি, ততক্ষণে মাথার ওপর ফ্যান ঘুরতে শুরু করেছে এবং আর সব আলোও পর পর জ্বালিয়ে দিয়েছে। এমক কি কোণের বড় শেড্ দেওয়া স্ট্যাণ্ড লাইটটাও। পেতলের ফুলদানি আর ঘরসাজানো জিনিসগুলো ঝক্‌মক্ করছে আলোয়। মেঝে পুরু কাশ্মীরী কার্পেটে মোড়া। ঘরে ঢুকেই মনে হ'ল, বাঃ! এমন না হলে আর লোকে বোটে থাকার কথা বলবে কেন? এ যেন মোগল যুগের বিলাস আর আধুনিক কালের আরাম একসঙ্গে কম্‌বিনেশান।

কাল সারাদিন বাসে ঘুরেছি তারপর আর স্নানটান হয়নি, সকলেরই ঝোড়ো কাকের মত অবস্থা। আর পায়ের চটিটার যা অবস্থা হয়েছে জলকাদায়! ভেতরে ঢুকে পুরু কার্পেটটাতে পা দিতে তাই অস্বস্তি হচ্ছিল। বোটের মালিক মহম্মদ

না মোবারক কি যেন নাম, আমাকে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো,—আইয়ে মেমসাব। আরাম করিয়ে। বৈঠিয়ে খুশ্‌ছে।

অগত্যা একটা সোফায় বসে পড়লাম। কিন্তু পা-দুটো ঢেকে। কী জানি মুখে যতই আপ্যায়ন করুক, ওর কার্পেটটার জন্য মায়া আছে নিশ্চয়ই। সেটা নোংরা করলে মনে মনে খুশী হবে না আমার ওপর। তখুনি ঠিক করলাম আজই একটা বেড্‌রুম স্লিপার কিনতে হবে।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে হ'ল না আমাকে। আবার ডেকে নিয়ে চলল ওর বোট দেখাতে। ড্রইংরুমের পরই ডাইনিংরুম। সেখানাও সুন্দর করে সাজানো। বড় ডাইনিং টেবিল। পাশেই কাঁচের আলমারিতে দামী দামী ডিনার সেট। ফুল-দানিতে ফুল।

খাবার ঘরের পর ছাদে ওঠার সিঁড়ি। তারপরই পর পর তিনখানা বেডরুম। সামনে ট্রেনের মত সরু লম্বা প্যাসেজ। প্রত্যেকটি বেড্‌রুমের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম। শোবার ঘরগুলো ছোট নয়। সব ঘরেই দুখানা করে খাট, ড্রেসিংটেবিল, বেড্‌সাইড টেবিল ইত্যাদি। প্রত্যেক ঘরেই ফুল সাজিয়ে রেখেছে ফুলদানিতে। বড় বড় জানালায় সুন্দর লেসের পর্দা ঝুলছে। কোন ঘরে হালকা বেগুনী, কোন ঘরে আকাশী, কোন ঘরে গোলাপী। মনে মনে ভাবলাম এবার বেশ নবাবী করা যাবে।

আমি আর দেরি না করে স্নানে চললাম। অনেক দিন পর আবার বেশ আরাম করে স্নান করতে পাবো। মাথার ওপর সাওয়ার, বালতিতে গরম জল। আয়না, বেসিন—কোন ত্রুটি নেই কোনদিকেই।

স্নান করে বেরোতেই অনিলদা ডেকে পাঠালেন। খাবার ঘরে ঢুকতেই কানে গেল—ই তো আপ্‌কা কোঠি সাব্‌। স্রেফ্‌ মেহেরবানি করকে ফরমাইয়ে। বিনয়ে যেন গলে যাচ্ছে একেবারে।

থমকে দাঁড়ালাম। এ তো দেখছি নাটকীয় ভঙ্গি একেবারে। এর পরেই বুঝি বলবে, জনাব! বান্দা হাজির হ্যায় আপ্‌কো খিদমত কি লিয়ে!

আরো একটু এগোতেই চোখে পড়ল অনিলদা সোফায় গা ঢেলে দিয়ে বসে। পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর হাঁটু মুড়ে আমাদের বোটওয়ালা বসেছে। কথাবার্তা যা হচ্ছে তা তো আগেই শুনেছি। এখন মনে হ'ল অনিলদার হাতে একটা আল-বোলার নল থাকলে যেন দৃশ্যটি নিখুঁত হ'ত একেবারে।

আমাকে দেখতে পেয়েই বোটওয়ালা শশব্যস্তে অভ্যর্থনা জানালো—আইয়ে

মেমসাব! বৈঠিয়ে। আপলোগোকো খানা কিসতরি বানানা চাহিয়ে বাতলাইয়ে।

আমাকে কিছুই বলতে হ'ল না। অনিলদাই বললেন, সকালে যেমন ব্রেকফাস্ট হয় তাই দেবে। আর লাঞ্চের সময় যেমন বলেছি তেমনি। তবে রান্নাটা তোমাদের মত। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—তুপুরে মাছ মাংস তুটোই বলেছি বুঝলে? তুমি তো আবার মাংস খাও না তাই।

বুঝলাম এ কদিন পহলগামে নিরামিষ খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়েছে অনিলদার তাই এ ব্যবস্থা। মাছ মাংস তুটোই চাই। আর রান্নাটাও ইংলিশ স্যুপটুপ চলবে না। একেবারে মোগলাই রান্না-ই পছন্দ। আর সবাই স্নানে গিয়েছে। অনিলদা হেড্ অব দি ফ্যামিলি। তাই ওদিকে যাননি এখনও। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তো তাঁকেই দেখতে হবে! সকলের স্থখ স্থবিধা আরামের যেন কোন ক্রটি না হয় এখন সেদিকে নজর দিয়েছেন! এখানে খেলুভাই নয়, অনিলদাই ব্যবস্থা করছেন। আমাকে বললেন, তুমি গিয়ে ওদের একটু তাড়া দাও তো। বেলা অনেক হয়ে গেল, আর কখন ব্রেকফাস্ট খাবে?

আমি উঠে পড়লাম ওখান থেকে।

অনেকদিন পর খানা-টেবিলে বসে হেভি ব্রেকফাস্ট। রুটি, মাখন, জেলি, তুটো করে ডিমের পোচ, প্রচুর তুধ সহযোগে কর্ণফ্লেক্স্। আর ফল রেখেছে টেবিলের মাঝখানে। আপেল, আঙুর, কলা যার যত খুশী। পাশে তুজন বয় থাকা সত্ত্বেও বোটের মালিক নিজে দাঁড়িয়ে তদ্বির করছে। সকলেরই মেজাজ খুশ।

আমি বললাম,—মণ্টু আর অসিত ঠাকুরপোকে ধন্যবাদ দিতে হয় এর জন্য। ওরাই এ আরামের ব্যবস্থাটা করেছে।

অজিত ঠাকুরপো অমনি বলে উঠল, শ্রীনগরে এসে প্রথম দিন রাতেই আমি এই বোটবালার সঙ্গে কথাবার্তা বলে রেখেছিলাম।' ঝিলমের ওদিকেও বোট আছে, কিন্তু আমার মনে হ'ল ডাল লেকে থাকাই ভালো। অর্থাৎ ক্রেডিট্টা ওরই প্রাপ্য।

মণ্টু আর অসিত ঠাকুরপো তুজনেই ঘোর আপত্তি জানালো। অর্থাৎ বাহাতুরি দেখিয়ে এর ভেতর কোন ভাগ বসানো চলবে না।

অনিলদা একটু ফিস ফিস করে আমাকে জানালেন,—একেবারে পাকা কাজ করে নিয়েছি বুঝলে? সাতদিনের জন্য দরদস্তুর করে লেখাপড়া করে নিয়েছি। আবার কোন বেশী দাঁও পেয়ে আমাদের না সরাতে পারে। বলা তো যায় না।

আমি সায় দিলাম, ভালই করেছেন।

এর পরই একেবারে কোণের ঘরটায় একটু আরাম করে ডানলোপিলোর বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। খোলা জানালার লেসের পর্দার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডাল লেকে সুন্দর সুন্দর শিকারাগুলো যাত্রী নিয়ে পারাপার করছে। ওপারে পাইন-আর দেওদারের ফাঁকে পাহাড়ের মাথায় শংকরাচার্য মঠ। ভারী ভালো লাগছিল। এমন সময় নীলিমা এসে খবর দিল, অনিলদা ডাকছেন।

উঠতেই হ'ল। গিয়ে দেখি ড্রইংরুমে যে যার আসনে বসে। আর মেঝেতে কয়েকজন লোক তাদের নানা ধরনের জিনিসপত্র বিছিয়েছে। কাশ্মীরী শাল শাড়ী থেকে লাঠি পর্যন্ত। মনে হ'ল এরা এত তাড়াতাড়ি খবর পেলো কি করে?

আমাদের বোটওয়ালা ঠিক আগের মত পোজেই বসে অনিলদার সঙ্গে কথা বলছে। ওর কথার অর্থ যা বুঝলাম, এত সস্তা আর ভালো জিনিস বাজারে পাওয়া যাবে না। এরা খাঁটি লোক। নিঃসন্দেহে জিনিস কিনতে পারেন, ঠকতে হবে না।

আমাকে দেখেই অনিলদা বলে উঠলেন,—নাও কি কিনবে বলেছিলে! এখানে বসেই সব কিছু পাবে।

একেবারে ঢালা হুকুম। একটু আশ্চর্য হলাম। কারণ পহলগামে ফেরিওয়ালা দেখলেই তো চটে উঠতেন!

ওদিকে দেখি ফুলদিরা শালের শাড়ী বাছছেন। মণ্টু আর অসিত ঠাকুরপো একবোঝা লাঠির ভেতর কোন্‌টা ঠিক পছন্দসই তাই খুঁজে দেখছে। খেলু-ভাই এসবের ভেতর নেই। ও একবার ঘরে ঢুকে দেখছে আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অজিত ঠাকুরপো একপাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। আমাকে দেখে বলে উঠল,—এই লাঠিখানা দেখ তো কেমন হয়েছে!—বলেই ও মুখটিপে হাসল একটু।

দেখি কালো রংএর একটা ছড়ি। কোন বিশেষত্ব আমার চোখে পড়ল না। তবে ভালো-মন্দ আমাকে আর কিছু বলতে হ'ল না, ও নিজেই বলার জন্য ব্যস্ত। লাঠির মাথাটা ঘুরিয়ে খুলে দেখালো। ভেতর থেকে একটা সরু তরোয়াল মত বেরিয়ে পড়ল। চক্‌চক্ করছে একেবারে। তাকিয়ে দেখি অজিত ঠাকুরপোর চোখ দুটোও চক্‌চক্ করে উঠেছে। বলল—গুপ্তি! লাঠি হাতে করে বেড়াতে গেলে কেউ টেরও পাবে না এর ভেতর কি আছে!

গুপ্তি নামটা শোনা ছিল কিন্তু দেখিনি কখনও। আমি একটু হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম তাই। ধার আছে। ভাবলাম সক্‌লকে অবাক করে দেবার জন্য এর একটা নিয়ে যেতে হবে।

শাল-শাড়ীর দিকে না গিয়ে অজিত ঠাকুরপোকে বললাম,—খোঁজ নাও তো শালের কারখানাটা কতদূর ? যেটা দেখার ভারী ইচ্ছে আমার !

অজিত ঠাকুরপোর সব কিছুতেই উৎসাহ। আমাকে বলল,—চল, তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

শিকারা বাঁধাই ছিল বোটের সঙ্গে। প্রমীলাকে ডেকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শালওয়ালার একজন লোক আমাদের সঙ্গে চলল।

ডাল লেকের পেছনের একটা খালে ঢুকল আমাদের শিকারা। দুপাশে বেশ একই রকমের ফালি ফালি জমিতে প্রচুর তরিতরকারি। মটরশুঁটি, লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে, টম্যাটো ইত্যাদি সবই প্রচুর পরিমাণে ফলেছে। আর সেগুলো একসঙ্গে এমন জড়াজড়ি করে ফলেছে যে দেখলে মনে হবে বুঝি সব রকমের বীচি একসঙ্গে ছিটিয়ে দিয়েছে। আপন মনে গাছ হয়ে ফল ধরেছে। সঙ্গের লোকটি আমাকে অবাক হয়ে দেখতে দেখে বুঝিয়ে দিল এই সব জমি তৈরী করতে হয়েছে বহুদিন ধরে। ডাল লেকের জলে যে জঙ্গল আছে তাই তুলে নিয়ে জমা করতে করতে এক-একটা জমি তৈরী হয়। ঐ জঙ্গলের সঙ্গে কিছু কিছু কাদামাটিও ওঠে। সেগুলো সারের কাজ করে। আরো কিছু মাটি ফেলে জমি তৈরী হয়।

জমির পাশে জলের মধ্যে সারি সারি ইউক্যালিপটাস গাছ দেখিয়ে বলল, ওগুলো আছে বলে জঙ্গলগুলো ভেসে যেতে পারেনি। ভারী মজা লাগল। ক্ষেতের ফসল তোলার জন্য দু'একটি মেয়ে এসেছে, কী সুন্দর দেখতে !

আর একটু এগোতেই ঘর-বাড়ি চোখে পড়ল। গ্রামের মত। বাঁধানো ঘাটে ছেলেমেয়েরা স্নান করছে। তবে বেশীদূর যেতে পারছে না সাঁতার দিয়ে। জলটা এখানে কচুরীপানায় ভর্তি। তাই ঘাটের কাছে অল্প জলেই ঝাঁপাঝাঁপি করছে।

ঘাটের পাশের একটা পুরনো লাল রংএর দোতলা বাড়ীর জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। হঠাৎ দেখে মনে হ'ল কোন বন্দিনী রাজকন্যা বুঝিবা। ঘাটের ছেলেমেয়েগুলিও ঐ বাড়ীরই হয়তো। এরাও তেমনি সুন্দর।

সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। ভাবলাম একটা ছবি নিই বাচ্চাগুলোর। আমাকে ক্যামেরা ঠিক করতে দেখেই একটি বছর তিনেকের বাচ্চা মেয়ে, একেবারে উলঙ্গ, হেসে পোজ নিয়ে দাঁড়ালো ঘাটের সিঁড়ির মাথায়। দেখে হাসি পেলো আমার। বুঝলাম বিদেশীরা যে ওদের দেখে ছবি নেবে সেটা ভালো করেই জানে। কিন্তু আমার শিকারাটা এত দুলছিল যে ছবি উঠবে বলে মনে হ'ল না।

আরো কিছুদূর যাবার পর আমাদের শিকারা একটা বাড়ীর পেছনের ঘাটে

ভিড়ল। আমরা শিকারা থেকে দু'তিনটে ধাপ উঠেই পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীটায় ঢুকলাম। উঠোন পেরিয়ে আমাদের দোতলায় একটা ঘরে নিয়ে গেল। দোতলা কিন্তু অত্যন্ত পুরনো। আর মাটির মেঝে। তাও আবার গর্ত-গর্ত হয়ে আছে মেঝেটা। সেখানেই মেঝেতে বসে কারিগরটা শালে নক্সা তুলছে। ছোট ছোট দুখানা ঘরে বিশ-পঁচিশজন লোক গাদাগাদি হয়ে বসে কাজ করছে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা পরে কয়েকজন বৃদ্ধকেও কাজ করতে দেখলাম। গালের চামড়া শুকিয়ে যেন আমসী হয়ে গেছে। কিন্তু টকটকে রং এখনও। ঘরে আলো বিশেষ আসছে না। ছোট ছোট জানালার ধারে বসে তাদের ক্ষীণ দৃষ্টিতেও কত সূক্ষ্ম কারুকার্য করছে তাই দেখছিলাম অবাক হয়ে। তাদের কিন্তু অবসর নেই আমাদের দিকে নজর দেবার। দু'একজন চোখ তুলে তাকালেও তাদের চোখে কোন অভিব্যক্তি ফুটল না আমাদের দেখে। আনন্দ, বিস্ময় বা বিরক্ত কিছুই না। এ যেন মরা মানুষের দৃষ্টি।

পাশের ঘরে এসে দেখি এখানেও সেই একই দৃশ্য। শুধু এদের মধ্যে একটি অল্পবয়েসী ছেলেকে দেখে মোহনের মুখখানা মনে পড়ল। এরও বছর চোদ্দ-পনেরো বয়েস। যেমন অপূর্ব সুন্দর ঢলঢলে মুখখানি তেমনি রং। মুখের গড়ন দেখে মনে হ'ল পাশের এক বৃদ্ধেরই ছেলে বুঝি। মনে হ'ল ঐ বৃদ্ধেরও একদিন এমনি কাঁচা চেহারাই ছিল।

ছেলেটি আমাদের উৎসুক হয়ে দেখছিল। ওকেই দু'একটা প্রশ্ন করে জানতে পারলাম অত্যন্ত কম মজুরীতে দিনে আট ঘণ্টা করে কাজ করতে হয় এদের। অভাবী লোক। আগে থেকেই তাই টাকা ধার নিয়েছে। এখন খেটে শোধ দিচ্ছে।

দুঃখ হ'ল ছেলেটির জন্য। সারাজীবন পরিশ্রম করে যখন ওর বাবার মত অবস্থা হবে তখনও হয়তো ধার শোধ হবে না। এক ধার শোধ করতে করতে আবার নূতন ধার করতে হবে হয়তো। মনে হ'ল এই শাল যখন আমরা কিনব তখন তো চড়াদামেই কিনতে হবে। এদের এই সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখিয়েই তো দাম নেয় আমাদের কাছে—তবে? তবে কেন এদের ভাগ্যে কিছুই জোটে না? শিল্পী যারা —যারা এই শিল্প সৃষ্টি করছে তাদের এই দুর্দশা দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি পাশের উঠোনে এক বুড়ী কুলোর ওপর তুলো প্যাজার মত করে ভেড়ার লোম পেঁজে পেঁজে রাখছে। শুনলাম ওগুলো দিয়ে এর পর সুতো কাটা হবে। তাই দিয়ে গরম কাপড় বোনা হবে।

খুবই উৎসাহ নিয়ে শাল তৈরী দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু এদের এই নৈরাশ্য-ভরা মুখগুলো দেখে মনে হ'ল এরা এখানে বন্দী হয়ে আছে যেন। ভাবলাম বন্দী বৈকি! মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে বন্দী হয়েই তো আছে এরা। ভারাক্রান্ত মনে নীচে নেমে এলাম। মনে হ'ল পৃথিবীর সব দেশেই বুঝি শিল্পীর ভাগ্য এমনিই চিরকাল। শিল্পের কদর আছে, কিন্তু তাতে শিল্পীর দুঃখ ঘোচে না কোনদিন। কে দেয় তাদের উপযুক্ত মর্যাদা আর পারিশ্রমিক?

পাশের এক সরু গলি দিয়ে নিয়ে চলল আমাদের। কাঁচা রাস্তা। দুধারে পাকা দালান-বাড়ী। কিন্তু জীর্ণদশা বাড়ীগুলোর। মনে হ'ল এইটেই পুরাতন শ্রীনগর। পথে কৌতুহলী ছেলেমেয়েরা আমাদের একটু লক্ষ্য করে দেখল যেন। তবে বেশীক্ষণ নয়। কারণ তারা আমাদের মত পর্যটক দেখতে অভ্যস্ত। গলিপথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা আর একটা বাড়ীতে পৌঁছালাম। আমাদের সঙ্গের সেই লোকটি এ বাড়ীর মালিককে বলে একটা বন্ধ ঘরের তালা খোলালো। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারলাম আমরা কোন ব্যবসায়ীর বাড়ীতে এসেছি। এটা কাশ্মীরী শালের আড়ত। ভাবলাম ও-বাড়ীতে যে শাল তৈরী করতে দেখে এলাম, সেই তৈরী শাল এখানে মজুত হচ্ছে হয়তো। এখান থেকে দোকানে বা বাইরে চালান হবে।

মস্ত বড় ঘর। ঘরের মেঝেতে সারি সারি কাঠের বেঞ্চ। তাতেই গাঁঠরি করে শালগুলো রাখা আছে। এখানে অবশ্য শুধু শাল নয়, নানান ধরনের কাশ্মীরী কাজ করা জিনিস দেখতে পেলাম। জরীর কাজ করা ক্লোকও দেখালো। মনে হ'ল কলকাতার চেয়ে অনেক সস্তা।

এত সুন্দর সুন্দর কাজ অবাক হয়ে দেখছিলাম। কিন্তু এত দামী জিনিস এভাবে রেখেছে দেখে একটু বিস্ময় বোধ করছিলাম মনে মনে। আলমারি বা অন্য কিছুতে বন্ধ করা নেই কেন? আমরা কত যত্ন করে রেখেও তো পোকার হাত থেকে গরম কাপড় বাঁচাতে পারি না! এগুলো কিভাবে ধোয়া হয় সেও জানার ইচ্ছে হ'ল।

এতক্ষণ একজন কর্মচারী বোধ হয় আমাদের দেখছিল। হয়তো আমাদের কৌতুহলী প্রশ্ন এবং কথাবার্তা শুনে বাড়ীর মালিকও এসে দাঁড়ালেন। সুন্দর সৌম্যদর্শন মধ্যবয়সী মানুষটি। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। উনি এসে সব কিছু বললেন, গরম কাপড় মাঝে-মাঝেই নাড়াচাড়া করা দরকার। আলোবাতাস লাগলে পোকা হতে পারে না। তাই শুধু বন্ধ করে রাখলেই চলে না। আর

ধোয়ার কথায় বললেন,—ধোপারা এই লেকের জলেই ধোয় গরম জিনিস।

আমার কেমন বিশ্বাস হ'ল না। মনে হ'ল নিশ্চয়ই গরম কাপড় কাচার আলাদা কোন পদ্ধতি আছে। তবে দেখলাম এঘরে প্রচুর আলো-হাওয়া আসার ব্যবস্থা আছে। আর বাড়তি কোন জিনিস রেখে ঘিঞ্জি করা হয়নি।

শ্রীনগরে দিনের বেলায় তেমন ঠাণ্ডা নেই। দুপুরবেলায় বরং গরমই লাগে। তবু সকালে বেরুনোর সময় শালখানা সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমার গায়ের সেই সাতুসখানা দেখে বললেন, এটা কোথায় পেলেন? কতদিন আগে কিনেছেন?

প্রশ্ন শুনে আমি একটু অবাক হলাম। বললাম, কেন, এ তো কাশ্মীরেরই জিনিস!

উনি একটু হেসে জানালেন, কাশ্মীরে এখন আর এ জিনিস পাবেন না। আর পেলেও অনেক দাম হবে। কারণ এরকম পাখীর শুধু বুকের লোমটুকু দিয়ে এ শাল বোনা হ'ত। সে পাখী আরো উত্তর দিক থেকে এসে যেখানে বসে সে জায়গাটা এখন পাকিস্থান হয়ে গেছে।

আমি স্বীকার করলাম বহুদিনের পুরনো আমার এ শাল। কাশ্মীরে আসার সময় নিয়ে এলাম দু'এক জায়গায় পোকায় কেটেছে সেটা রিপু করিয়ে ধুইয়ে নেব বলে।

উনি বললেন, ঠিক ধরেছি তাহলে। কিন্তু রিপু করতে হলেও আপনার শাল থেকে সুতো নিয়েই করতে হবে তা। এছাড়া উপায় নেই।

এখানে খুচরো বেচাকেনা বিশেষ হয় না মনে হ'ল। আমরা দেখতে এসেছি বলেই যেন দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। জিনিস বিক্রী করার কোন আগ্রহ দেখলাম না, বরং অন্য নানা বিষয়ে গল্প করতে লাগলেন। কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য স্থান-গুলোর খবর দিলেন। এখানে এসে কোথায় উঠেছি, কাশ্মীর আমাদের কেমন লাগছে—এই সব কথাই বিশেষ করে জিজ্ঞেস করছিলেন। অজিত ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করতে করতে ভদ্রলোক বললেন, আপনারা একটু চা খেয়ে যান।

আমরা আপত্তি করায় বললেন, এ চা আপনারা কখনও খাননি। খেয়ে দেখুন আগে তারপরে বলবেন কেমন লাগল।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে আমাদের সকলের জন্য ভালো কাপে করে চা নিয়ে এলেন। দেখতে কিন্তু মোটেই ভালো নয়। দুধ নেই। কেমন ঘোলা-ঘোলা চায়ের লিকার। একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অনুরোধ করলেন, খেয়ে দেখুন মা। এতে ক্লান্তি দূর করবে। এর নাম 'পরিশানি টী'। এর প্রস্তুত-প্রণালীও আলাদা।

ওঁর অনুরোধে খেয়ে দেখতে হ'ল। চিনি-মেশানো ঠাণ্ডা চা। খেতে কিন্তু মন্দ লাগল না। আর খাওয়ার পর সত্যি বেশ তাজা লাগল। এতক্ষণের ঘোরাঘুরির আর কোন ক্লান্তি নেই যেন। ভালই লাগল খেয়ে,—বললাম সেকথা।

শুনে উনি খুশী হলেন। বললেন, গরম জলে চায়ের পাতা সেদ্ধ করে এ চা তৈরী হয় না। এ চা তৈরীর নিয়ম একেবারেই আলাদা। বাঁশের চোঙ্গার ভেতরে চা-পাতা দিনসাতেক রেখে দিতে হয়। আরো কি কি যেন বলছিলেন মন দিয়ে শুনিনি। বেলা হয়ে গেছে, আবার একদিন সবাই মিলে আসব জানিয়ে বিদায় নিলাম।

উনি দোর পর্যন্ত আমাদের আগিয়ে দিলেন।

এখানে আমরা কিছু কিনব বলে আসিনি। দেখার জন্যই এসেছিলাম। ভালোভাবেই দেখা হ'ল। ওঁর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে কিছুক্ষণ আগে শালশিল্পীদের দেখে মনে যে বিষাদের ছায়াপাত হয়েছিল তাও যেন অনেকটা মুছে গেল। মনে পড়ল ভদ্রলোকের কথার ফাঁকে প্রাণখোলা হাসি। শুনেছিলাম কাশ্মীরীরা অতিথি-পরায়ণ। মনে হ'ল কথাটা মিথ্যে নয়।

আবার শিকারা। এবার কোন্ পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চলল জানি না। বিরাট একটা বিলের মত। তার পাশে গাছপালা-ঘেরা গ্রাম। নাম বলল, নাগিন লেক। জলে প্রচুর পদ্ম ফুটে আছে। শিকারার মাঝি আমাদের অনেক ফুল তুলে দিল। এত বড় পদ্ম আমাদের বাংলাদেশে দেখিনি। প্রমীলা আর আমি ফুল পেয়ে খুব খুশী। কিন্তু অজিত ঠাকুরপো বলে উঠল, শুধু ফুল দেখে কি হবে! এমন সুন্দর চায়ের পর যদি একটা পান খাওয়া যেত কত ভালো লাগত তাহলে। প্রমীলার দিকে তাকিয়ে বলল, পানের বাটাটা যদি সঙ্গে নিয়ে আসতে কেমন মজা হ'ত বল তো। এখন শিকারায় বসে পান সেজে দিতে পারতে।

চটে উঠল প্রমীলা। আমাকে বলল, দেখেছেন দিদি, ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হবে। কাশ্মীরে এসেছি বেড়াতে। এখানেও নাকি পান সাজতে হবে!

দিল্লী পর্যন্ত পানের বাটা সঙ্গেই ছিল। আমিই প্রমীলাকে ওটা ওখানে রেখে আসতে বলেছিলাম। বলেছিলাম, কাশ্মীর যাচ্ছিস বেড়াতে, সেখানেও পান সাজবি নাকি! আমার কথায় সেটা ওখানে রেখে এসেছে ও।

এখন অজিত ঠাকুরপোকে বললাম, পান খাওয়াটা ছেড়ে দিলেই তো পারো বাপু। শ্লোক আওড়ালাম—পান, তাস, পাশা—তিন সর্বনাশা।

অজিত ঠাকুরপো আমার ভুল সংশোধন করল—পান নয়, ওটা দাবা।

আমি বললাম, ঐ এক কথাই হ'ল। নেশা মাত্রেই খারাপ। একটা শ্লোকে আর কতগুলো নেশার কথা বলবে বল!

তারপর গল্প শোনালাম—কাশ্মীরের এক রাজা পানের নেশায় কেমন করে রাজসিংহাসন হারাতে বসেছিলেন। রাজা অনন্তদেব (হর্ষের পিতামহ, কলসের পিতা) অত্যন্ত তাম্বূলরসিক ছিলেন। আর পদ্মরাজ নামে তাঁর এক প্রিয় তাম্বুলী ছিল। তার হাতের পান ছাড়া রাজার মুখে রুচত না। সেই তাম্বুলীকে অবশ্য প্রচুর দক্ষিণা দিতে হ'ত এর জন্য। একবার কি এক ব্যাপারে রাজার কাছ থেকে বহু অর্থ পেলো সে। কিন্তু তাতেও তার পাওনা শোধ হ'ল না। এদিকে রাজার হাত একেবারে শূন্য। রাজা তখন তাম্বুলীর কাছেই হাত পাততে শুরু করলেন। ধারের টাকা শোধ করতে না পারায় তাম্বুলীর কাছে রাজার উষ্ণীশ আর সিংহাসন বাঁধা পড়ল।

এতদিন রাণী সূর্যমতী এসব খবর জানতেন না। কিন্তু সিংহাসন আর উষ্ণীশ ছাড়া রাজসভায় যাবেন কি করে? তাই কিছুদিন ধরে রাজা অন্দরমহল ছেড়ে আর বাইরে বেরোন না। রাণী খুশী হলেও এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানতে পেলেন ব্যাপারটা। শেষে নিজের অলঙ্কার দিয়ে উদ্ধার করলেন সিংহাসন আর উষ্ণীশ। এবার অবশ্য রাণী সূর্যমতী নিজেই রাজকার্য দেখতে লাগলেন।

আমার গল্প শুনে প্রমীলা খুব হাসছিল দেখে বললাম, কিন্তু তোর মত ছিলেন না সূর্যমতী। নিজে গয়না বেচে রাজার পান খাওয়ার ধার শুধেছিলেন তিনি।

প্রমীলা অমনি বলে উঠল, আমি বাবা গয়না বিক্রি করে পান খাওয়াতে পারব না তোমাকে। সেকথা বলে দিচ্ছি। অত পতিভক্তি নেই আমার।

ওর কথা শুনে অজিত ঠাকুরপো আর আমি দুজনেই হেসে উঠলাম। ও-ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল হাসিতে।

গল্পে গল্পে খেয়াল করিনি ডাল লেকে পৌঁছে গেছি আমরা। শিকারার মাঝির কথায় তাকিয়ে দেখি দূরে একটা ছোট্ট নৌকোতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা বাঁশের লগি। সেখানা জলের ভেতর পুঁতে, তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেনে তুলছে। একবোঝা করে জংলা লতা উঠছে বাঁশের সঙ্গে। নৌকোটা বোঝাই জংলা লতায়।

মাঝি বলল,—এমনি করেই জঙ্গল তুলে জলের ওপর ভেসে থাকা জমি তৈরী হয়। লেকের জলটাও পরিষ্কার থাকে।

মনে পড়ল যাবার পথে দেখেছি সে সবজিক্ষেত। কিছুক্ষণ দেখলাম ওর কাজ। মনে হ'ল কাশ্মীরী মেয়েরা শুধু যে রূপসী তাই নয়, তাদের দেহে যথেষ্ট শক্তিও আছে। জলের তলা থেকে এভাবে জঙ্গল ওপড়াতে কম শক্তির প্রয়োজন হয় না।

আমরা বজরায় ফিরে দেখি সামনের ড্রইংরুমেই সবাই বসে আছে আমাদের জন্য, ফেরিওয়ালারা চলে গেছে। অনিলদা গম্ভীর মুখে একটু বিরক্তির স্বরে বললেন, এমন অসময়ে কোথায় গিয়েছিলে সব বল তো? তোমরা না ফিরলে কেউ খেতে পারছি না! কত বেলা হ'ল সে খেয়াল আছে?

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি, তাই তো! দুটো বাজে? আমরা তিন-জন লজ্জিত হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। খাবার টেবিল কেতাদুরস্ত সুন্দর করে সাজানো। প্লেটগুলো উপুড় করা। পাশেই কাঁটা-চামচ ইত্যাদি। ধোয়া ধপ-ধপে ন্যাপকিনগুলো ফুলের মত করে গেলাসের ভেতর সাজিয়ে রেখেছে। সত্যি ফুল তো আছেই ফুলদানিতে। খানাটেবিল দেখেই জোর খিদে পেয়েছে মনে হ'ল। এতক্ষণ সবই রেডি ছিল। শুধু আমাদের জন্যই অপেক্ষা। খাবার পরিবেশন শুরু হ'ল। প্রচুর আয়োজন। সুন্দর ডিনার সেটে খাবারগুলো যেন আরো লোভনীয় মনে হতে লাগল। বোটের মালিক গৃহস্বামীর মত নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করতে লাগল। কার কি চাই, রান্না কেমন হয়েছে ইত্যাদি প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছিল যেন আমরা নিমন্ত্রিত অতিথি।

এত আদর-আপ্যায়নে আমরা সবাই অভিভূত। এটা যে বিদেশ, আমাদের বাড়ী নয় ভুলেই গেলাম যেন। মণ্টু তো বলেই ফেলল, এমন খাওয়ার পর একটু মিষ্টি হলে যেন আরো ভালো লাগত। ওর আবার খাবার পাতে একটু মিষ্টি খাওয়া অভ্যেস!

বোটের মালিক যেন একটু লজ্জিত হ'ল প্রথমটায়। তারপর হাসিমুখে পাশের তাক থেকে একটা জেলির কৌটো নিয়ে এসে বলল, এতে চলবে?

অর্থাৎ মধুর অভাবে গুড় চলবে কিনা!

মণ্টু খুব খুশী। নিঃসংকোচে বেশ খানিকটা জেলি ঢেলে নিল পাতে।

ওর কাণ্ড দেখে আমরা হাসতে লাগলাম।

বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে আমরা টুরিস্ট রিসেপ্শান অফিসে গিয়ে বাসের টিকিট নিলাম। কতগুলো দেখার জায়গা আছে একবারেই সব টিকিট কাটা হ'ল। বার বার হাঙ্গামা করতে হবে না বলে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দুপুরের মতই। কাল সকালে আমরা 'উলার-

লেক' দেখতে যাব শুনে বোটওয়ালা বলল, আপনাদের কোন চিন্তা নেই। সকালে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে বেরোবেন। আমার একজন লোক যাবে আপনাদের সঙ্গে। সেই খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে যাবে। কোন কষ্ট হবে না আপনাদের। অবশ্য তার জন্য ওকে আলাদা কিছু দিতে হবে। তা হোক। শুতে যাবার আগে ড্রইংরুমে বসে আমরা সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে কাশ্মীরী বোটের মালিকের প্রশংসা করলাম। আমাদের জানাশোনা কেউ কাশ্মীরে এলে এই বোটে ওঠার কথা বলব এমন কথাও কেউ কেউ বলল। মোট কথা কাশ্মীরে এসে বোটে না থাকলে যে মস্ত ভুল হ'ত সে বিষয়ে সবাই একমত হলাম।

শোবার ঘর তিনটে। তাই বসার ঘরটাকেও আমরা শোবার ঘর হিসেবে ঠিক করে নিলাম। ফার্নিচারগুলো মাঝখান থেকে সরিয়ে কার্পেটের ওপর নীলিমা আর খেলুভাই বিছানা পেতে নিল। মণ্টু, অসিত ঠাকুরপো আর আমি একটা ঘরে, আর বাকী দুটোতে অনিলদা আর অজিত ঠাকুরপো। বাড়ীর মতই ব্যবস্থা।

॥ ৩৬ ॥

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তাড়াহুড়ো পড়ে গেল স্নানের। নটায় বাস ছাড়বে। এক ঘণ্টা আগে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে অফিসে। এখান থেকে শিকারায় লেকের ওপারের ঘাটে যেতে হবে। তারপর টাঙ্গা পেলে ভালো। না হলে হেঁটেই যেতে হবে ওখানে। রাস্তা খুব কম নয়। মাইল দেড়েক হবে হয়তো। সবাই তৈরী হতে হতেও খানিকটা সময় লাগল। তারপর হাতে হাতেই প্রায় খেয়ে নিয়ে শিকারা নিয়ে ওপারের ঘাটে গেলাম আমরা। সঙ্গে আমাদের খাবার নিয়ে মকবুল চলল—ও-ই আমাদের দুটো টাঙ্গা ধরে দিল। নাহলে হয়তো দেরি হয়ে যেত পৌঁছাতে।

রিসেপশান অফিসের অত বড় উঠোনটায় অনেকগুলো বাস দাঁড়িয়েছিল। ওয়েটিংরুমে বহু যাত্রী আমাদের আগে এসে অপেক্ষা করছে দেখলাম। কোন্ বাস কোন্ দিকে যাবে জেনে নিয়ে যে যার বাসে উঠছে। টিকিটে সীট নম্বর দেওয়া আছে। যার যার সীটে সে সে বসবে। কোন লোক দাঁড়িয়ে যাবার উপায় নেই। যতগুলো সীট তার বেশী একটা টিকিটও পাওয়া যাবে না। পথেও কোন যাত্রী তুলবে না এ বাস।

আমাদের বাস ঠিক নটাতেই ছাড়ল। আজ আমরা উলার লেক দেখতে যাব।

বাসে যাচ্ছি চোখ মেলে চারিদিক দেখতে দেখতে। দেখছি শ্রীনগর থেকে যেদিকেই যাই না কেন বেশ কয়েক মাইল পথ সমতল। দুদিকে ক্ষেতখামার। ধানক্ষেত বা কোন্ গ্রামের পাশ দিয়ে চলেছে বাস।

প্রথমে একটা জায়গায় বাস দাঁড়াতেই সবাই নামতে শুরু করল। দেখাদেখি আমরাও নেমে পড়লাম। পাশেই ভাঙা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল। নাম বলল 'পত্তন'। এগিয়ে গেলাম। অপূর্ব কারুকার্য-করা পাথরের মন্দিরের স্তম্ভ-গুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মন্দিরশীর্ষ ভেঙে গেছে। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। মনে পড়ল রাজতরঙ্গিনীতে পড়েছিলাম অবন্তী বর্মার পুত্র শংকর বর্মা বহু রাজ্য জয় করে ফিরে এসে শংকরপুর নামে নিজের নামে এক নগরপত্তন করে-ছিলেন। সেখানে দুটি শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন। নিজের নামে 'শংকর গৌরীশ' আর রাণী স্থগন্ধাব নামে 'স্থগন্ধেশ'। রাজা শংকর বর্মার অনেক রাণী ছিল। কিন্তু রূপে বোধ হয় রাণী স্থগন্ধাই শ্রেষ্ঠা ছিলেন। কারণ প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন তিনি।

কহ্লন বলেছেন, হাতি যেমন স্নানের পর আবার ধুলো মাথে গায়ে, কাশ্মীরের রাজারাও যশস্বী হয়েও আবার কুকর্মে রত হন।

শংকর বর্মাও ঠিক তাই করলেন। শেষের দিকে তিনি নাচ গান বিলাসব্যসনে এমন আসক্ত হলেন যে ধনক্ষয় হতে হতে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। তখন অর্থের জন্য তিনি দেবালয়ের অর্থও আত্মসাৎ করতে লাগলেন। এমন কি ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত পরিহাসকেশবের ধনরত্নও অপহরণ করলেন। শেষে দেবালয়ের নির্মাল্য, চন্দন, ধূপ ইত্যাদি বিক্রয় করে অর্থ নিতে লাগলেন। প্রজাদের উপর নানা ছলে কর বসাতে লাগলেন। গরীব প্রজাদের ব্যাগার ধরার প্রথা প্রবর্তন করলেন। ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। কবি বলেছেন, রাজা খুবই সুন্দর এবং সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সামন্তরাজারা তাঁকে যমের মত দেখতেন।

পুত্র গোপাল বর্মার অল্প বয়েস হলেও অত্যন্ত ধার্মিক স্বভাবের ছিলেন বলে পিতাকে অনুরোধ করেছিলেন প্রজাদের উপর অত্যাচার না করার জন্য। কিন্তু ছেলের কথা শুনে শংকর বর্মা হেসে বলেছিলেন যে, তোমার কথা শুনে আমার বহু পূর্বের কথা মনে পড়ছে। গোপাল বর্মার বয়েসে তিনিও নাকি অমনি কোমল স্বভাবের ছিলেন। প্রজাদের দুঃখে কাতর হতেন। তাঁর বাবা তাঁকে সৎশিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রীষ্মের সময় ভারী বর্ম পরিয়ে খালিপায়ে প্রচণ্ড রৌদ্রে রেখে, আর

শীতকালে সামান্য বস্ত্রে ভ্রমণ করাতেন। একবার মৃগয়ায় গিয়ে খালিপায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁর পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ায় সঙ্গের লোকেরা তাঁর বাবাকে তাঁর কষ্ট লাঘব করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, আমি সামান্য অবস্থা থেকে এই বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেছি। কাজেই লোকের কষ্ট আমি বুঝতে পারি। আমার ছেলে যখন রাজা হবে সেও যেন প্রজাদের কষ্ট বুঝতে পারে তাই তাকে এই শিক্ষা দিচ্ছি।

শংকর বর্মা বললেন, কিন্তু রাজা হয়ে আমিই প্রজাদের এত কষ্ট দিচ্ছি। তাই আমার অনুরোধ তুমি যেন রাজা হয়ে প্রজাদের আমার চেয়ে বেশী কষ্ট দিও না।

রাজকুমার লজ্জিত হয়েছিলেন এ কথায়।

শংকর বর্মার মৃত্যুর পর তাঁর নাম যেন মুছে ফেলতে চাইল প্রজারা। শংকরপুর আর কেউ মুখে আনত না। তাই শুধু 'পত্তন' বা 'পাটন' নামটাই থেকে গেল।

শংকর বর্মাব মৃত্যু হ'ল আকস্মিকভাবে। উনি যখন সিন্ধুতীরবর্তী রাজ্যগুলি জয় করে ফিরছিলেন তখন বিপরীত দিকের এক পর্বতশৃঙ্গ থেকে এক চণ্ডাল তীর ছুঁড়ে তাঁকে হত্যা করে। তীরটি তাঁর গলায় বিঁধেছিল। অত্যাচারী রাজাকে বধ করার জন্য ইচ্ছে করেই হয়তো একাজ করেছিল সে।

রাণী সুগন্ধা সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু রাজা তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না। গলার স্বরে রাণীকে চিনতে পেরে তাঁর হাতে নাবালক পুত্র গোপাল বর্মা আর রাজ্যের ভার দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গলা থেকে তীরটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

তখন সমস্যা হ'ল কি করে তাঁকে নিজরাজ্যে ফিরিয়ে আনা যায়। জীবিত অবস্থায় যাঁরা তাঁকে ভয় করত, মৃত জেনে যদি তারা তাঁকে অসম্মান করে এই ভয়ে তাঁকে রথের ওপর বসিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে মাথাটা এমনভাবে দোলাতে লাগাল যাতে দূর থেকে সামন্তরাজারা মনে করে যে তিনি তাদেব অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে চলেছেন। ছয়দিন পর নিজের রাজ্যে ফেরার পর ওঁর শব দাহ করা হ'ল। ভাবলাম, হায় রে জীবিত অবস্থায় যাকে দেখে ভয় পেত সবাই তাকেই মৃত্যুর পর কেউ অসম্মান না করে তার জন্য কত কারসাজি করতে হয়েছিল!

আবার মনে হ'ল তাঁর অত্যাচারে শত্রুসংখ্যা বেড়েছিল ঠিকই কিন্তু তাঁকে ভালবাসার লোকও তো ছিল! নাহলে আর কারো চিতায় স্ত্রী ছাড়া আর কেউ সহমরণে গিয়েছে, এমন কথাও তো শোনা যায় নি কখনও। রাণী সুরেন্দ্রবতীরা তিনজন যে চিতায় উঠলেন তার না হয় অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়, বালাবিভু, জয়সিংহ

এবং আরো একজন কৃতজ্ঞ অনুচর যে তাঁর চিতায় প্রাণ দিল—রাজাকে ভালো-বেসেছিল বলেই তো !

ভাঙা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম মৃত শংকর বর্মাকে ঘিরে শোকার্ত আত্মীয়পরিজন বিলাপ করছে। আর অপূর্ব সুন্দরী রাণী সুগন্ধা ছেলের হাত ধরে পাথরের প্রতিমার মত একপাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন স্বামীর দিকে। অতর্কিত প্রচণ্ড আঘাতে যেন শোকদুঃখের অনুভূতি নেই তাঁর। স্তব্ধ হয়ে গেছে মন।

কিন্তু রাজার প্রিয়তমা মহিষী রাণী সুগন্ধা যিনি রাজার মৃত্যুযন্ত্রণা চোখে দেখলেন, তিনি কি পুত্র গোপাল বর্মার জন্যই শোক ভুলেছিলেন ? অন্য রাণীরা যখন রাজার সঙ্গে সহমরণে গেলেন, তখন তিনি কি শুধু নাবালক পুত্রের কথা মনে করেই বিরত হয়েছিলেন ?

কিন্তু না, ইতিহাস সেকথা বলে না।

পিতার মৃত্যুর পর গোপাল বর্মা রাণী সুগন্ধার তত্ত্বাবধানে থেকে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিন্তু রাণী সুগন্ধা প্রভাকর নামে এক মন্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হলেন। প্রভাকর সেই সুযোগে রাজ্যের ধনসম্পতি আত্মসাৎ করতে লাগল। মনে হ'ল এই মন্ত্রীই হয়তো সেই সুন্দরী রাণীকে নিরস্ত করেছিলেন সহ-মরণে যেতে।

ক্রমে গোপাল বর্মা একথা জানতে পেরে প্রভাকরের কাছে হিসেব চাইলেন ধন-সম্পত্তির। মন্ত্রী ভীত হয়ে 'রামদেব' নামে তার এক বন্ধুকে দিয়ে অভিচার করালে গোপাল বর্মার মৃত্যু হ'ল। শংকর বর্মার মৃত্যুর পর মাত্র দু বছর বেঁচেছিলেন তিনি। এদিকে এ খবর প্রকাশ হয়ে পড়ায় রামদেব ভয়ে আত্মহত্যা করল।

শংকর বর্মার বংশ লোপ পাওয়ার পর প্রজাদের ইচ্ছায় রাণী সুগন্ধাই সিংহাসনে বসলেন। হয়তো মন্ত্রী প্রভাকরেরও কিছু হাত ছিল এতে।

সুগন্ধা সিংহাসনে বসায় প্রভাকরের ক্ষমতা আরো বেড়ে গেল। অন্যান্য মন্ত্রীদের অপমান করতে লাগল প্রভাকর। এতে মন্ত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হ'ল। এবং প্রভাকরের সঙ্গে বিরোধ বাধল। আর এই সুযোগে সৈন্যসামন্তরা ক্ষমতা-শালী হয়ে উঠল। তাদের মধ্যেও অবশ্য দুই দল হ'ল। রাণী এক দলের সঙ্গে মিত্রতা করে মাত্র এক বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য মন্ত্রীরা অন্য দলটির সাহায্যে রাণীকে তাড়িয়ে দিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিল। রাণী হুষ্কপুরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। রাণীর পক্ষের সৈন্যসামন্তরা তাঁকে আবার শংকর-

পুরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। অন্য পক্ষ তাঁকে পথেই নিষ্পালক নামে এক বিহারে বন্দী করে রাখল। রাণী সুগন্ধার বন্দী অবস্থায় সেখানেই মৃত্যু হ'ল।

অত সাধের শংকরপুরের ইতিহাস এইভাবেই শেষ হ'ল।

ওদিকে গাড়ির হর্ন বাজছে। শুনে সবাই ফিরছে তাড়াতাড়ি করে। আমিও চললাম ওদের পেছনে পেছনে। যেতে যেতেও আশেপাশে তাকিয়ে দেখছিলাম। এর কাছেপিঠেই হয়তো সেই চিতা জ্বলেছিল—যে চিতায় সেই অত্যাচারী রাজার জন্যও অতগুলো মানুষ একসঙ্গে প্রাণ দিয়েছিল।

এও এক আশ্চর্য ঘটনা!

॥ ৩৭ ॥

আমাদের বাস এবার সোপুর বলে একটা পুরনো গ্রামের পাশে এসে দাঁড়ালো। এখানে কিছু দেখার ছিল কিনা জানি না। তবে এখানে কেউ নামল না। রাণী সুগন্ধার মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী-বংশীয় শূরবর্মা রাজা হয়েছিলেন। তাঁর নামেই এর নাম হয়েছে হয়তো। শূরপুর থেকে সোপুর হওয়া বিচিত্র নয়। আমি গ্রামখানার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম যদি কোন পুরাতন মন্দির বা আর কিছু চোখে পড়ে।

আমরা না নামলেও গ্রামবাসীরাই এসে ভিড় করল বাসের ধারে। যারা এসেছে তারা গরীব চাষী। কাছেই আপেলের বাগান আছে মনে হ'ল। কারণ প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাঁচা আপেল এনেছে বিক্রীর জন্য। খুবই সস্তা। আট আনা থেকে বারো আনার মধ্যেই এক সের আপেল পাওয়া যাচ্ছে দেখে আমরা কিছু আপেল কিনলাম।

এখানে আমাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। ধীরে ধীরে আমাদের বাস পাহাড়ের পথ ধরল। বুঝতে পারলাম এইবার আমরা 'উলার' হ্রদ দেখতে পাব। খানিক বাদেই পাহাড়ের মাথায় উঠল বাস। আর চোখে পড়ল সামনেই সেই বিশাল হ্রদ।

উলারের নাম ছোটবেলা থেকেই জানি। ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখতে শিখেছি যখন থেকে। কাশ্মীরের দিকে তাকালে নীল রং-এ চিহ্নিত উলার হ্রদ দেখে মনে

হয়েছে এত উঁচুতে পাহাড়ের মধ্যে হ্রদ? কি করে হ'ল? কৌতুহল জেগেছে মনে। আজ এতদিন পরে দেখলাম সে হ্রদ। কৌতুহল মিটল। অপূর্ব সুন্দর মনে হ'ল আমার।

পাহাড়ের মাথার ওপর যেখানে আমাদের বাস দাঁড়িয়েছে তার পাশেই রেস্ট হাউস। ইচ্ছে করলে এখানে বিশ্রাম বা খাওয়া-দাওয়া করা যায়। আমরা কিন্তু রেস্ট হাউসে না গিয়ে পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেক নীচে আকাশের ছায়া বুকে নিয়ে নীল শান্ত জলের বিরাট এক হ্রদ। উত্তর-দক্ষিণে বারো মাইল লম্বা আর প্রস্থে ছ মাইল আয়তন। হ্রদের এই দিক পাহাড়ে-ঘেরা। ওপারে পাহাড় নেই। গাছপালা-ঘেরা গ্রাম। হ্রদের চারিপাশের জমিতে ধান চাষ করেছে। সবুজ হয়ে আছে কচি ধানের চারায়। শুনলাম এই হ্রদের জল কখনও শুকোয় না। শীতকালে আশেপাশের পাহাড়ে যখন বরফ জমে তখন আরো সুন্দর হয় নাকি দেখতে। গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলে স্রোতের মত জল গিয়ে মেশে হ্রদে। এসময় অবশ্য আমরা বরফ কোথাও দেখতে পেলাম না। যে পাহাড় থেকে আমরা হ্রদ দেখছি সেটাও খুব উঁচু নয়। এই পাহাড়েই বরফ জমে কিনা বুঝতে পারলাম না। হয়তো জমে। শ্রীনগরেই যদি বরফ পড়তে পারে, তবে এখানেও বরফ জমবে সে আর বেশী কথা কি!

মণ্টু ওর ক্যামেরায় ছবি নিল হ্রদের। বাস এবার আমাদের নিয়ে নেমে চলল হ্রদের ওপাশে সেই গ্রামের দিকে। 'ওয়াটলাবে' এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো।

এপাশটা পাহাড় নয়। হ্রদের একেবারে কাছ থেকে আরো ভালো করে দেখলাম। বাংলাদেশের মতই চাষ করছে চাষীরা। হ্রদের জল ছেঁচে ধানের জমিতে দিচ্ছে। জেলেরা মাছ ধরছে। আমাদের দেশের মতই ছোট ছোট বহু নৌকো নিয়ে হ্রদের মাঝে ঘুরছে। বাংলার চাষী আর জেলেদের সঙ্গে তো কোন তফাত আছে মনে হ'ল না। ভারী ভালো লাগছিল ওদের কাজকর্ম দেখতে।

বাস আবার চলল হ্রদের পাশের পথ দিয়ে। হ্রদটাকে রাউণ্ড দিয়ে আমরা যেখানে এসে থামলাম তার নাম 'বন্দীপুর'। একটু শহর-শহর ভাব। তবে একেবারে শহরও নয়। একটা চেনার বাগের পাশে আমাদের বাস এসে দাঁড়ালো। এখানে খানিকক্ষণ থামবে। এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে হবে। মকবুল আমাদের জন্য সামনের পঞ্চায়েত অফিসের একটা ঘর খুলিয়ে নিয়েছে। সেখানে গিয়েই আমরা খেয়ে নিলাম। খাবার অবশ্য বিশেষ কিছুই নয়। শুকনো রুটি আর আলু-ডিমের তরকারি। খাওয়াটা বোধ হয় মণ্টুর পছন্দ হ'ল না। কিন্তু পথে

এর বেশী আর কি ব্যবস্থা হ'ত বললাম ওকে!

আমাদের খেতে দিয়ে মকবুল বাইরে বারান্দায় বসে খাচ্ছিল। ওধারে গিয়ে দেখি ও ভাত এনেছে সঙ্গে করে। কিন্তু আর কিছুই নেই। বাঁহাতে একটা পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা। তাতেই একটু করে কামড় দিচ্ছে আর মুঠি মুঠি মোটা চালের লাল লাল ভাত মুখে পুরে গোগ্রাসে গিলছে। শুকনো ভাতগুলো দেখে কষ্ট হ'ল। ভাবলাম আমাদের খাওয়ার আগে দেখতে পেলে ওর জন্য কিছু তরকারি রেখে দিতাম। ও নিজের জন্য কিছু না রেখে আমাদের দিয়ে দিয়েছে বুঝতে পারিনি আমি। মনে মনে ভাবলাম আমরা ঐ খাবার খেয়েই ব্যাজার হয়েছি আর ও কত তৃপ্তি করে শুকনো ভাতগুলো খেয়ে নিল।

বাস ছাড়তে তখনও দেরি ছিল। আর সব যাত্রীরা কোন্ দিকে গিয়েছে বুঝতে পারলাম না। আমরা ঐ চেনার বাগের দিকে গেলাম। বিরাট বিরাট চেনার গাছ। বটের ছায়ার মতই ছায়া। পাতাগুলো দেখে মনে হ'ল শিল্পীরা তাদের সব নক্সাতেই চেনার পাতা আঁকতে ভালোবাসে। শাল শাড়ী থেকে কাঠ আর রূপোর জিনিসেও দেখেছি এই পাতার ডিজাইন। চেনার কাশ্মীরের জাতীয় বৃক্ষ।

আমরা বাগানের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, মকবুল এদিকে এলে ওকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এখানে নাকি একটা পুরনো ধ্বংসস্তূপ আছে, তাই দেখতে অনেকে যায়। এর বেশী ও আর কিছু বলতে পারল না।

আমার হঠাৎ খেয়াল হ'ল, তাই তো! বন্দীপুর নাম এখানকার। এখানেই রাণী স্থগন্ধাকে বন্দী করে রেখেছিল নাকি? মনে হ'ল সেই 'নিস্পালক' বিহারের ধ্বংসাবশেষ হয়তো দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু সে ধ্বংসস্তূপ কতদূর এখান থেকে তাও ঠিক করে বলতে পারল না। বাস ছাড়তেও আর দেরি নেই হয়তো, তাই আর কোন দিকে না গিয়ে চেনারের ছায়ায় গিয়ে বসলাম।

মনে পড়ল উলারের আগেই বাঁদিকে একটা পথ গিয়েছে 'বরমূলার' দিকে। ঐ দিকেই তো হুষ্কপুর। তাহলে হুষ্কপুর থেকে আবার যখন রাণী স্থগন্ধা তাঁর নিজের সৈন্যদের সাহায্যে শংকরপুর ফিরে যেতে চেয়েছিলেন তখন তাঁর বিপক্ষীয় মন্ত্রী ও সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করে এখানেই এনে রেখেছিল! বন্দী অবস্থায় এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

রাণী স্থগন্ধার কথা মনে হতেই কাশ্মীরের আর এক রাণীর কথা মনে পড়ল।

রাণী দিদ্দা। তিনিও কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে বসেছিলের স্বামীর মৃত্যুর পর। তাঁরও একটি শিশুপুত্র ছিল। আর দুজনেই ছিলেন স্বামীর প্রিয়তমা মহিষী।

রাজা ক্ষেমগুপ্তের স্ত্রী দিদ্দা। লোহর প্রদেশের রাজা সিংহরাজের কন্যা। রাজা ক্ষেমগুপ্ত অত্যন্ত চরিত্রহীন ছিলেন। রাজা দিনরাত পার্শ্বচরদের নিয়ে থাকতেন। যুদ্ধযাত্রার বদলে শিকার আর আমোদপ্রমোদেই বেশী আনন্দ পেতেন। কিন্তু বিয়ের পর রাণী দিদ্দার প্রতি এমন অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে তখন আর বাইরের আমোদপ্রমোদ ভালো লাগত না। সকলে ঠাট্টা করে তাঁকে দিদ্দাক্ষেম বলে ডাকতে শুরু করল।

রাজা বহু দুষ্কার্য করেছিলেন জীবনে তাই বোধ হয় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। মৃত্যু আসন্ন মনে করে তিনি বরাহক্ষেত্রে (বরমূলায়) গমন করলেন। বহু পাপ করেছিলেন তাই বোধ হয় ভীত হয়ে মৃত্যুসময়ে তীর্থস্থানে গেলেন।

ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অভিমন্যু শিশু ছিল বলে রাণী দিদ্দা সিংহাসনে বসলেন। স্বামীর মত দিদ্দাও কুচরিত্রা ছিলেন। তিনি মন্ত্রী নরবাহনের প্রতি আগেই অনুরক্তা ছিলেন। এখন প্রকাশ্যেই তাঁর সঙ্গে প্রেমলীলা চলল। নরবাহন খেলে খেতেন, ঘুমোলে ঘুমোতেন। কিন্তু এও বেশী দিন ভালো লাগল না। এলো ভূয্য। তার সঙ্গেও একই খেলা খেললেন। তবে এখানেই শেষ নয়। রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিনের সঙ্গে এদিক দিয়ে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর মত দিদ্দারও বহু প্রেমিক ছিল। অবশেষে দিদ্দার প্রায় মধ্যবয়সে, রাণী ক্যাথারিনের জীবনে ডন জুয়ানের মত তুঙ্গ এলো তাঁর জীবনে।

তুঙ্গের তুঙ্গে বৃহস্পতি ছিল বলতে হবে। কারণ সে ছিল মহিষপালক। পরে রাজসভায় পত্রবাহক—অবশেষে হ'ল রাজ্ঞীর প্রেমাস্পদ। অর্থাৎ কাশ্মীরের সর্বময়কর্তা। তুঙ্গের বলিষ্ঠ পৌরুষব্যঞ্জক সুন্দর সুঠাম আকৃতি দেখে দিদ্দা মুগ্ধ হলেন। পূর্বের প্রণয়ী ভূয্য দিদ্দাকে বাধা দিলে তুঙ্গের প্রতি আসক্তি বশতঃ ভূয্যকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। এর আগে ভূয্যের কথায় প্রথম প্রণয়ী নরবাহনকে এমন নিগ্রহ করেছিলেন যে তিনি আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পান দিদ্দার হাত থেকে। দিদ্দার দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজত্বকালে এমনি বহু ঘটনাই ঘটেছে। কাজেই এত দীর্ঘদিন রাজত্ব করলেও নিষ্কণ্টক ছিলেন না মোটেই। কিন্তু সিংহাসনের মোহ তাঁর এতই ছিল যে নিজের পৌত্রদের এবং যাঁকেই সিংহাসনের দাবিদার মনে হয়েছে, নির্বিচারে হত্যা করিয়েছেন। ছেলে অভিমন্যু অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল।

তাঁর সময়ে এই সব কারণেই হয়তো যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিদ্রোহ লেগেই ছিল। তখন তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত মন্ত্রীরাই যুদ্ধ জয় করে তাঁর রাজ্ঞীর মর্যাদা রক্ষা করেছেন। কিন্তু অন্যের কথায় বিশ্বাস করে আবার কখনও তাঁদের বিষনজরে দেখেছেন। প্রেমের ব্যাপারেও অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ছিলেন মনে হ'ল। নাহলে মন্ত্রী নরবাহন, ভূয্য প্রভৃতি তাঁর প্রণয়ী এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীদের অমন করুণ পরিণতি হ'ত না। এমন নিষ্ঠুর স্ত্রীচরিত্র ইতিহাসেও বোধ হয় কমই আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে চপলতা প্রকাশ করলেও রাজ্যশাসনে তাঁর দৃঢ়তার অভাব ছিল না। এদিক থেকে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা চলে। রুশসাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন এবং এলিজাবেথের মত দিদ্দাও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং শক্তহাতে রাজ্য পরিচালনা করেছেন বলতে হবে। কারণ তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও তাঁকে কেউ সিংহাসনচ্যুত করতে পারেনি। শেষের দিকে তুঙ্গের প্রতি আসক্ত হলেও রাজ্যরক্ষার জন্য তাকে দিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিদ্রোহ দমন করিয়েছেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রামরাজকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করে গেলেন। তুঙ্গ সিংহাসনের অধিকারী হবার সুযোগ পেলো না। এতেই মনে হয় দিদ্দা কৌশলে মন্ত্রীদের হাতে রেখে কার্যোদ্ধার করেছেন। তিনি দুর্বল প্রকৃতির হলে কখনই এমন সম্ভব হ'ত না।

আর যেভাবে তিনি সংগ্রামরাজকে যুবরাজ-পদে নির্বাচন করলেন তাতেও তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছোট ছোট কয়েকটি ভাইপোকে আনালেন। কে সিংহাসনে বসার উপযুক্ত পরীক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে অনেকগুলো আপেল গড়িয়ে দিয়ে শয্যায় শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলেন। সবাই বেশী ফল পাবার আশায় যখন মারামারি করছিল তখন দেখা গেল সংগ্রাম একধারে চুপ করে বসে আছে। তার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। দিদ্দা এর কারণ জানতে চাইলে সংগ্রাম উত্তর দিল, আমি ওদের ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দূরে ছিলাম বলে আমার কোন আঘাত লাগেনি, বরং সেই সুযোগে বেশী ফল পেয়েছি।

ছেলেটির বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকেই যুবরাজ হিসেবে পছন্দ করলেন তিনি।

দিদ্দার মৃত্যুর পর তৃতীয় পরিবর্তন হ'ল কাশ্মীরের রাজবংশের। গোনন্দ বংশের পর 'নাগবংশ', রাণী সুগন্ধার মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী-বংশীয়েরা রাজত্ব পেয়েছিল। এবার দিদ্দার মৃত্যুর পর এলো সংগ্রামরাজ।

মনে হ'ল ভারতেও যুগে যুগে নারীরাও সিংহাসনের অধিকারিণী হয়েছেন।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাণী দুর্গাবতীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। শুধু কাশ্মীরে বা অন্য রাজ্যে নয়, স্বল্পকালের জন্য হলেও দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন সুলতানা রাজিয়া। তাঁর অপূর্ব বীরত্ব সাহস ও রাজ্যশাসনের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তিনিও আমীর-ওমরাহদের চক্রান্তে সিংহাসন এমন কি জীবন পর্যন্ত হারিয়েছিলেন। সেদিক থেকে দিদ্দার রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি এবং দক্ষতা আরো বেশী ছিল মনে হ'ল। কারণ তিনি মন্ত্রীদের স্ববশে রেখেছিলেন। তাঁদের দক্ষতায় রাজ্যশাসন এবং তাঁদের বাহুবলে রাজ্যজয় হলেও কিন্তু মূল ক্ষমতা দিদ্দা নিজের হাতেই রেখেছিলেন। সাধ থাকলেও সেখানে কারো মাথা তোলার সাধ্য ছিল না। এমন কি মৃত্যুর পূর্বে সিংহাসনের অধিকারী নির্বাচনেও তিনি যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিলেন ইতিহাসে তারও তুলনা মেলে না।

কাশ্মীরের সিংহাসনে যে তিনজন রাণী বসেছিলেন তাঁদের মধ্যেও দিদ্দাই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। রাণী যশোমতী সিংহাসনে বসলেও তাঁকে রাজ্য-পরিচালনা করতে হয়নি। প্রভুভক্ত মন্ত্রীরাই করেছেন সেকাজ। আর রাণী সুগন্ধা কোমলস্বভাবা আর পরনির্ভর ছিলেন বলে তিনি যাদের ওপর নির্ভর করলেন তারা তাঁর প্রাণটাও রক্ষা করতে পারেনি। রাজপুরুষদের চক্রান্তে তাঁর রাজত্বের মাত্র দু'বছরের মধ্যেই প্রাণ হারালেন তিনি।

আবার মনে হ'ল, এখান থেকে কত দূর সেই ধ্বংসস্তূপ? রাণী সুগন্ধা এখানে কোথায় বন্দী হয়ে ছিলেন দেখে গেলে হ'ত। কিন্তু গাড়ীর হর্ন বেজে উঠেছে। কাজেই সেখানে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। চেনারের শীতল ছায়ার মায়া ছেড়ে আবার গিয়ে গাড়ীতে বসতে হ'ল।

ফেরার পথে বাসে করেই যতটুকু বন্দীপুর দেখলাম তাতে মনে হ'ল বহুদিনের পুরাতন এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম এটা। পথের দুধারে বড় বড় গাছ, কিছু জঙ্গল আর তারই ফাঁকে ফাঁকে পুরনো পাকা বাড়ি। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপ আমার নজরে পড়ল না যা দেখার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে ছিলাম।

॥ ৩৮ ॥

'মানসবলে' যখন পৌঁছালাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। উলারের মত অত বড় নয় এ লেক। এখানেও পাহাড়ের দিকটায় একটা রেস্ট হাউস আছে। চায়ের নেশায় সবাই গিয়ে ঢুকল ওখানে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম একটা গাছের তলায়। লেকের জলে অজস্র পদ্ম ফুটে আছে। দু'একখানা শিকারাও আছে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বোধ হয় একজন শিকারাওয়ালা এসে বলল, মা লেকে বেড়াবেন একটু? আমি নিয়ে যাব আপনাকে। তাকিয়ে দেখি অজিত ঠাকুরপো রেস্ট হাউসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, যা ভিড়! ওখানে চা খেতে হলে বসতে হবে অনেকক্ষণ, তাই তামি চলে এলাম।

বললাম, ভালই হ'ল। চল একটু বেড়িয়ে আসি লেকে। অজিত ঠাকুরপোর কোনটাতেই আপত্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গেই রাজী।

পাহাড়ের যেখানটায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তার অনেকটা নীচে জল। সরু একটা খাড়া পথের চিহ্ন নেমেছে ওখান থেকে। একটু আগেই বোধ হয় এখানে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। খুব সাবধানে নামতে হ'ল তাই। একটু পা পিছলোলেই হুড়মুড় করে জলে পড়ার ভয়।

শিকারায় উঠে কিন্তু ভারী ভালো লাগল। লোকটা আমাদের বেশ অনেক-দূর ঘোরালো লেকের মাঝে। লেকের জল কত গভীর বোঝা গেল না। কারণ এখানেও জলের নীচে জমাট-বাঁধা জংলা লতার জঙ্গল। কিন্তু ওপরের দিকে হাত-খানেক কাঁচের মত পরিষ্কার টলটলে জল। ঝাঁকে ঝাঁকে রূপুলী মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে নৌকোর পাশ দিয়েই। ভালো লাগছিল দেখতে। হাত বাড়ালেই যেন ধরা যায় মাছগুলো। জলে হাত দিলেই কিন্তু লুকিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের ভিতর। আবার খানিক বাদেই ওপরে ভেসে উঠছে। মনে হ'ল মায়ামাছ এগুলো। কিন্তু সাইজ বেশ বড়। এখানে কিন্তু মাছ ধরার নৌকো দেখলাম না।

ফেরার পথে প্রচুর পদ্মফুল নিয়ে ফিরলাম আমরা। এত বড় পদ্ম আমাদের বাংলাদেশে হয় না।

এবারও সাবধানে ওপরে উঠতে হ'ল। পাহাড়টা মাটির। তাই পিছল হয়েছে পথ। আমরা ফিরে এসে দেখি ওরাও চা খেয়ে বেরোচ্ছে। ফুল দেখে প্রমীলা খুশী। কিন্তু ওর শিকারায় বেড়ানো হ'ল না বলে মন খারাপ।

ইতিমধ্যে আমাদের বেড়িয়ে ফিরতে দেখে বোধ হয় একটি অবাঙালী পরিবারেরও শিকারায় করে লেকে বেড়াবার শখ হয়েছে। ওদের দলের সালোয়ার পাঞ্জাবি পরা একটি অল্পবয়সী মেয়ে, পায়ে উঁচু হীলের জুতো, তরতরিয়ে নীচে নামতে গিয়ে পা হড়কে গড়াতে গড়াতে একেবারে জলের ধারে গিয়ে থামল।

অল্প বয়েস বলেই অসাবধানী। তাই ব্যাপারটা এমন ঘটল। প্রথমে ভয় হয়েছিল জলে পড়ে যাবে বুঝি। কিন্তু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটি যখন নিজের পোশাক ঠিক করে নিয়ে লজ্জিতভাবে ওপর দিকে চেয়ে আমাদের দেখছিল—তখন প্রমীলা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। আমিও অবশ্য না হেসে পারিনি। কাউকে পড়তে দেখলে বোধ হয় কেউই না হেসে পারে না।

প্রমীলাকে বললাম,—দেখলি তো! তুই যদি ওভাবে গড়িয়ে পড়তিস? তার চেয়ে না গিয়েছিস ভালই হয়েছে।

॥ ৩৯ ॥

এইবার আমাদের শ্রীনগর ফেরার কথা। কিন্তু এখনও বেশ খানিকটা বেলা আছে বলেই হয়তো ড্রাইভার সাহেব পথে আমাদের আর একটা দর্শনীয় জায়গায় নিয়ে গেল। এটি একটি তীর্থস্থান। বাস থেকে নেমে আমরা এগিয়ে গেলাম। এক জায়গায় লেখা আছে পায়ের জুতো খুলতে হবে। কিন্তু তখনও মন্দির অনেক দূর। চারিদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে চেনার, আখরোট, আমলকীর বড় বড় গাছগুলো ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে জায়গাটা। কিছুদূর গেলে চোখে পড়ে একটা জলের কুণ্ডের মাঝে ভারী সুন্দর একটি ছোট্ট শ্বেতপাথরের মন্দির। ভেতরে ঢুকে দেখি লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্তি। তীর্থের নামে আর বিগ্রহে মিল নেই দেখে খটকা লাগল মনে। পরে অবশ্য ওখানকার একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম নামের অর্থ। এই মন্দিরটি পুরাতন নয়, কাজেই বিগ্রহও বেশীদিনের নয় হয়তো। কিন্তু এই তীর্থ এবং কুণ্ড নাকি রামায়ণের যুগের। সীতা হরণ করার পর রাবণের উপাস্যা দেবী ভবানী বিরক্ত হয়ে লঙ্কা ত্যাগ করে তাঁর নাগ অনুচরদের নিয়ে এই কুণ্ডের ধারে অধিষ্ঠান করেছিলেন নাকি। এখানে বছরে একবার খুব বড় মেলা হয়। তখন বহু দূর দূর থেকে যাত্রীরা এসে এই কুণ্ডের জলে দুধ ঢালে। তাই বোধ হয় এর নাম 'ক্ষীরভবানী'। এর তিন দিকে খাল আছে, তারও নাম

ক্ষীরসাগর। মেলার সময় লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় এ জায়গা। এখন কিন্তু তপোবনের শান্তি বিরাজ করছে এখানে। ভারী ভালো লাগল। তাই বিগ্রহকে প্রণাম করে দোরগোড়ায় বসেছিলাম আমি। ওরা সব গল্প করছিল। কে যেন বলল, স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন এখানে।

চোখের সামনে জেগে উঠল বীর সন্ন্যাসী স্বামীজীর দীপ্ত প্রসন্ন মূর্তি। শ্রদ্ধায় নুয়ে এলো মাথা। চোখ বুজে মন্দিরের মেঝেতে মাথা লুটিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে আর একবার প্রণাম জানালাম আমি।

উস্‌মার্গ

॥ ৪০ ॥

আজও সকালবেলা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি। আজ আমরা যাব 'উসমার্গ'। বাসে যেতে যেতে মনে হ'ল আজ আমরা অন্য পথে যাচ্ছি, ঝিলমের সেতু পার হয়ে এদিকটায় আগে এসেছি মনে হ'ল না। শ্রীনগর থেকে উস্‌মার্গ **উনত্রিশ** মাইল পথ। কিছুদূর সমতল দিয়ে যাবার পর বাস পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। পীর-পঞ্জাল রেঞ্জ হলেও এ পাহাড় মাটির। বড় বড় গাছ আছে পথের ধারে তাই খাদটা চোখে পড়ছে না। কিন্তু বুঝতে পারছি অনেক উঁচুতে উঠছি। কারণ বাসের বন্ধ সার্সির বাইরেটা ঝাপসা হতে লাগল। ঠিক কুয়াশা নয়, হালকা মেঘ যেন। সামান্য ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হ'ল খানিকটা সময়। তারপর আমরা যেখানটায় পৌঁছালাম তার নাম শুনলাম 'চেরারি শরিফ'। শেখ নূরউদ্দীন ওয়ালির সমাধি মন্দির। গত্‌কাল মিলাত শরিফ ছিল। আজও এখানে বেশ ভিড়। বাস-রাস্তার কাছেই মসজিদ। অনেক মুসলমান তীর্থযাত্রী রাস্তার পাশেই বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বসে আছে বাসের প্রতীক্ষায়। মেয়েরা সবাই বোরখা পরে আছে।

বাস থেকে নেমে যেতেযেতে লক্ষ্য করলাম কাঁচা সড়কের একহাঁটু ধুলোর ওপর বসে আছে যাত্রীরা। মাথার ওপর মেঘ জমেছে দেখে শঙ্কিত হচ্ছে মনে হ'ল ওদের কথাবার্তায়। ভাবলাম তীর্থ মানেই ক্লেশ। ঘণ্টাখানেক তো লাগলআমাদের শ্রীনগর থেকে এখানে আসতে, সময়মত বাস পেলে এদের আর দুর্ভোগ হ'ত না।

সামান্য দূরেই মসজিদ। বাস থেকে নামলেই চোখে পড়ে। কাঁচা সড়ক

দিয়ে যেতে যেতে পাহাড়ের গা-টা হাত বুলিয়ে দেখেছিলাম। একটু হলদে রংএর মাটি কিন্তু কোথাও এক কুচি পাথর নেই। পাড়ের তলাতেও ঐ রংএরই পাউডারের মত মিহিপালিশ ধুলো। মনে হ'ল সাঁওতাল মেয়েরা এ মাটি পেলে ঘরদোরের শ্রী ফেরাত; মৃৎশিল্পীরা মূর্তি গড়াত ; বলতে লজ্জা হলেও আমার কিন্তু মনে পড়ল উনুন তৈরীর কথা।

সামনেই সুন্দর কাজ-করা বেশ বড় মসজিদ। জুতো খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। কেউ বারণ করল না। ঘরের মাঝখানে ফকির সাহেবের সমাধি আছে। সুন্দর জরীর কাজ করা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা চেরাগ বাতি জ্বলছে। সুগন্ধি ধূপ আর গোলাপের সৌরভে ভরে আছে ঘর। হাত জোড় করে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানালাম ফকির সাহেবের উদ্দেশে।

ফিরে এসে বাসে উঠতে গিয়ে চোখে পড়লপাশেই একটুখানি উঁচুতে মিশনারি-দের একটা বাড়ী। তার টিনের ছাদের চারধারে বাইবেলের নানারকম উপদেশ লেখা। পাশাপাশি দুই ধর্ম-মন্দির। মনে হ'ল আরব আর প্যালেস্টাইন পাশা-পাশি দুই রাজ্য। 'মেরিমাতা' আর 'মরিয়ম' একজনকেই তো দুই নাম দিয়েছে মানুষ। যে নামেই ডাকুক তাই কোন দ্বন্দ্ব নেই কারো মনে। আসার সময় শ্রিনগরেও দেখেছি মন্দির আর মসজিদ পাশাপাশি। ধর্মভীরু কাশ্মীরবাসীরা যে যার ধর্ম নিয়ে আছে। কেউ অন্যের ধর্মমতকে অশ্রদ্ধা করে না। তাই কোন অসুবিধাও দেখা দেয়নি এতে।

'চেরারি শেরিফ' যতটুকু সময় থাকলাম আর সেই সময়ে যতটুকু দেখলাম তাতেই মনে হ'ল বেশ বড় 'জনপদ' এটা। কারণ মসজিদের পাশেই ঘন বসতি চোখে পড়ল। বাড়ীগুলোর টিনের ছাদ যেন একটার গায়ে আর একটা লেগে আছে। হিন্দুর তীর্থস্থানে যেমন পাণ্ডাদের ঘিঞ্জি বাড়ীঘর থাকে এখানেও তেমনি। এদেরও পাণ্ডা বা ঐ ধরনের কিছু আছে কিনা জানি না।

পথে এটুকু বিরতির পর আমাদের বাস চলল উস্‌মার্গের দিকে। ঘাসে-ছাওয়া সবুজ ঢেউখেলানো পাহাড়ের মাথায় পথ। পাহাড়ী রাস্তার মত পাশে খাদ নেই। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত। হঠাৎ নজরে পড়ল বেশ বড় একখানা টিনের বাড়ি। সামনে বাঁশের জাফরি-ঘেরা বেশ বড় উঠোন। উঠোনে ধানের মরাই। খড়ের পাঁজার একপাশে একটি গাই বাছুর নিয়ে দাঁড়িয়ে। গৃহস্বামী সম্পন্ন চাষী মনে হ'ল। উঠোনে কয়েকটি ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, বাস দেখে খেলা ছেড়ে কলরব করে উঠল। গাইটিও শান্ত চোখ তুলে চেয়ে দেখল এদিকে।

আমার মনে হ'ল বাংলার কোন পল্লীর একটুকরো ছবি দেখছি বুঝি।

বাংলাদেশের কথা মনে পড়েই হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম তাই বুঝতে পারিনি কখন পৌঁছে গেছি গন্তব্যস্থলে। বাস থেকে সব যাত্রীরা নেমে পড়ছে দেখে তাকিয়ে দেখি সামনেই উঁচু টিলার মাথায় উস্‌মার্গের রেস্ট হাউস। সামনের দিকে ঢালু পাহাড়ের গা সবুজ ঘাসে ছাওয়া। আর ঘাসের বুকে নানান রংএর অজস্র ছোট ছোট ফুল ফুটে আছে। যেন অপূর্ব সুন্দর নকশার একখানা কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে কেউ পাহাড়ের গায়ে। ওপাশ দিয়ে পথ উঠেছে রেস্ট হাউসে যাবার। আমি কিন্তু এদিকপানেই এগোলাম। আমার মত আরো কয়েকজন। উঠতে একটু কষ্ট হলেও ভারী ভালো লাগছিল।

ওপরে আধুনিক রেস্ট হাউস। ঘোরানো বারান্দায় বসার জন্য চেয়ার-টেবিল। যার খুশী ঘরেও বিশ্রাম নিতে পারে। কিন্তু বাইরেই সবাই বসল গিয়ে। রেস্ট হাউসের ওপাশটাতেও যতদূর চোখ যায় ঢেউ তুলেছে সবুজ-ঘাসে-ছাওয়া জমি। তার দুধারে পাইন বন। চারিদিকেই চোখজুড়ানো সবুজশ্রী।

আমরা ওখানে যেতেই দেখি দু-চারজন গ্রাম্য লোক তাদের ঘোড়া নিয়ে হাজির। যদি কেউ ওখান থেকে কাছাকাছি বেড়িয়ে আসতে চায়। দক্ষিণা হাঁকল চড়া। ছেলেরা দরদস্তুর করছিল। রেস্ট হাউসের চৌকিদারও একটা মাঝা-মাঝি নিষ্পত্তি করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

রিজার্ভ ফরেস্ট বলেই বোধ হয় একজন আর্মড পুলিস আছে এখানে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের বচসা শুনছিল। এগিয়ে এসে বলল, ঘোড়ার মোটে দরকার নেই। এখান থেকে দুধগঙ্গা এক মাইলের মধ্যেই। নীলগঙ্গা অবশ্য একটু দূরে। আমরা দুধগঙ্গা যাওয়াই ঠিক করলাম।

আর কোনখানে এমন বন্দুকধারী পুলিস চোখে পড়েনি, তাই একটু এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি। অল্পবয়েসী ছেলে। আমার সঙ্গে কথা বলতে পেয়ে যেন বেঁচে গেল। শুনলাম ওখান থেকে পাকিস্তান বর্ডার খুব কাছে। তিরিশ মাইলের মধ্যে গিল্‌গিট্‌। তাই এ সাবধানতা।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কেউ ভুল করে যদি ওদের এলাকায় চলে যাও কি হয় তাহলে ?

গম্ভীর মুখে বলল,—দেখতে পেলে আর ফিরে আসতে দেবে না। বিশহাত মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে একেবারে।

অর্থাৎ ভুলের মাশুল দিতে হবে নিজের প্রাণ দিয়ে। জানতে চাইলাম—

আর ওরা যদি এপারে আসে তবে ?—

উত্তর না দিয়ে শুধু হেসে তাকালো আমার দিকে।

বুঝলাম স্থযোগ পেলে এরাও ছেড়ে দেবে না। একটু আগে চেরারি শরিফে মনে হয়েছিল কাশ্মীরবাসীরা নিজের নিজের ধর্মমত নিয়ে নির্বিবাদে শান্তিতেই আছে। কিন্তু ধর্ম নিয়ে বিবাদ না থাকলেও, রাজনৈতিক কারণে দেশ ভাগ হবার ফলে ওদের মনে স্থখ নেই।

মনে মনে দুঃখের হাসি হাসলাম। অমিল থাকলেও কাশ্মীর আর বাংলার মিল অনেক। কাশ্মীরীদের মত আমরা বাঙালীরাও ভুক্তভোগী। নিজের দেশে পরদেশী। আমার বাপের বাড়ী পাকিস্তানে। শৈশবের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা সে মাটিতে আর পা দেবার যো নেই। একটা কাল্পনিক বেড়ার এপারে ওপারে আত্মীয়-বন্ধু যারা আছে কারো কাছে যেতে পারবো না আর

আমরা যতক্ষণ গল্প করছিলাম ততক্ষণ অন্য যাত্রীরা ঘোড়া নিয়ে চলে গেছে বেড়াতে। সেদিকে লক্ষ্য করতেই ছেলেটি বলল,—দুধগঙ্গায় যেতে আপনাদের কোন কষ্ট হবে না। হেঁটেই যেতে পারবেন। একটি বছর দশ-বারোর ছেলেকে আমাদের সঙ্গে দিল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

সামনের সেই সবুজ প্রান্তরটুকু পার হলেই পাহাড়ী পথে শুধু নেমে চলা। এক-ধারে পাহাড়ের গায়ে ঝাউবন। অন্যপাশে অনেক নীচ দিয়ে নদী। এরই নাম বোধ হয় দুধগঙ্গা। নামতে নামতে আমরা একেবারে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছালাম। সেখানে আবার সমতল। বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কাদা প্যাচপেচে পথ। কোথাও জলকাদা এড়ানোর জন্যে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। অল্প দূরেই হয়তো পাহাড় থেকে নীচে নেমেছে নদী। তাই ফেনিল জলধারা আবর্ত সৃষ্টি করে মহাগর্জনে ছুটে চলেছে। জল এখানে দুধের মত সাদা। সঙ্গের ছেলেটি বলল,—আচ্ছা পানি, এতে পেটের রোগ সেরে যায়। সারে কিনা জানি না তবে জলটা খেতে ভালো। সাদা রং দেখে মনে হ'ল কাছেই চুনা পাহাড় বা খড়িমাটির পাহাড় আছে। তাই গুলেই জলের রং এমন সাদা হয়েছে। তবে লক্ষ্য করে দেখলাম কিছুদূর গিয়ে আর এমন সাদা রং নেই। যেমন নীলচে সবুজ জলের রং তাই।

এখানকার জলের রং সাদা বলেই এর মাহাত্ম্য। আঁজলা ভরে জল খেয়ে আমাদের জলের বোতলে জল ভরে নিলাম। খুব তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিলাম। এখন উঠতে বেশ কষ্ট হতে লাগল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। পথ পিছল হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে সাবধানে উঠছি। পায়ে আবার হাওয়াই চটি। পাহাড়ের

ধার দিয়ে হাত-দুই চওড়া রাস্তা। পচা ঝাউপাতাগুলো পথের ওপর। পা পিছলে পড়লে একেবারে নীচের নদীতে না পড়লেও কাছাকাছি গিয়ে পৌছাব। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর আছড়ে পড়লেও রক্ষা নেই। একবার ভাবলাম পাশের ঝাউবনের ভেতর দিয়ে যাই। কিন্তু ঠিক সাহস হ'ল না। ওদিকে উঠতে গিয়ে যদি পিছলে পড়ে যাই!

আর সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে। আমাকে দাঁড়াতে দেখে সঙ্গের ছেলেটি বোধ হয় বুঝল ব্যাপারটা। বলল,—মাইজী ডরো মৎ। চপ্পলঠো দিজিয়ে। বলেই হাত বাড়ালো।

ওর হাতে চটি খুলে দিয়ে দেখি এখন ওপরে উঠতে আর অত কষ্ট হচ্ছে না। জলকাদায় রবারের চটির জন্যই স্লিপ করছিল। এবার পা টিপে টিপে ওর পিছু পিছু চললাম। ও একহাতে জলের বোতল আর এক হাতে চটি নিয়ে খালিপায়ে অনায়াসে আমার আগে আগে চলছিল। মঝে মাঝে অবশ্য ফিরে দাঁড়িয়ে দেখছিল আমি যাচ্ছি কিনা। তবে এমন পথ খুব বেশী দূর নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা রেস্ট হাউসে পৌছে গেলাম। যেতে আসতে আমাদের ঘণ্টাখানেকের মত সময় লেগেছে মাত্র। বাচ্চা ছেলেটিকে যা দেবার কথা ছিল তার থেকে কিছু বেশী দিয়ে ওকে খুশী করে বিদায় দিলাম। ও আবার ফিরে চলল ঐ পথেই। দুধগঙ্গার পারেই বোধ হয় ওর গ্রাম।

মকবুল খাবারদাবার নিয়ে আমাদের সঙ্গেই এসেছে। রেস্ট হাউসেই ছিল ও। দেখি চৌকিদারের কাছ থেকে প্লেট-টেলেট নিয়ে আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে। রোজকার মতই খাবার মেনু। সেই শুকনো রুটি আর ডিমের তরকারি। যারা খাবার সঙ্গে আনেনি তাদের জন্য চৌকিদার রান্নাও করে দিচ্ছে শুনলাম। মণ্টুর খুব আফসোস। আগে জানলে ও নাকি এগুলো না খেয়ে মুখ বদলানোর জন্য সেই ব্যবস্থাই করত। মুর্গীর মাংস আর ভাত। খুব ভুল হয়ে গেছে।

ছেলেরা সবাই এ বিষয়ে একমত হ'ল। আমরা কিছু না বলে খেয়ে নিলাম।

আমরা ছাড়াও আর একদল বাঙালী যাত্রী এসেছেন। তাঁরাও কলকাতার। তাঁরাও কয়েক জন। সঙ্গে ভাইরাও এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে গল্প হ'ল। ওঁরা অমরনাথ গিয়েছিলেন। তাঁদেরই একজন বললেন, কষ্ট হয়েছে খুবই সত্যি কথা। কিন্তু কী যে আনন্দ পেয়েছি বলতে পারি না। এমন অপূর্ব দৃশ্য যে আর বলে বোঝানো যাবে না।

আমি গল্প শোনার লোভেই ওখানে বসেছিলাম। ওঁরা রেস্ট হাউসেই বিশ্রাম করছিলেন। অন্য কোথাও যাননি। যাবার দরকারই বা কি? এখানে বারান্দায় বসে থাকলেও ভালো লাগে। সেকথা বলাতে ওঁর মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল। বললেন—যা দেখে এসেছি তারপর আর কিছু দেখার নেই। তবে পুরুষেরা কাশ্মীর ঘুরে না দেখে বাড়ি ফিরবে না তাই সঙ্গে আসা।

আমাদের অমরনাথ যাওয়া হয়নি শুনে দুঃখপ্রকাশ করলেন। মনে হ'ল একটু করুণা মেশানো ছিল ওঁর কথার স্বরে।

বললাম—ভাগ্য! আপনাদের ভাগ্যে ছিল তাই যেতে পেরেছেন, আমাদের ছিল না বলেই ফিরতে হ'ল।

শুনে উনি মুখ টিপে একটু হাসলেন। বললেন, ঠিক কথাই বলেছেন। তবে যা দুর্গম রাস্তা! আপনাদের মত আরো অনেকেই ফিরে এসেছে।

মুখে যাই বলুন, ওঁরা মনের ভাবটুকু বুঝতেআমার কষ্ট হ'ল না। অর্থাৎ আমরা হেরে গেছি। পথের দুর্গমতার জন্য ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি। ওঁরা সাহস করে ঘুরে এসেছেন।

পহলগামের মাসীমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। তাঁর ব্যর্থতার দুঃখ বুঝি। এঁর গর্ব-মেশানো আনন্দের অর্থও হৃদয়ঙ্গম হ'ল। কিন্তু ওঁরা চোখে দেখেছেন যে দৃশ্য তার যেমন তুলনা নেই তেমনি আমার কল্পনায় যা ধরা দিয়েছে তারই কি তুলনা চলে? তবু উস্‌মার্গের পাইনবন, তৃণাচ্ছাদিত বনভূমি, এই মাটির শোভাও আমার ভালো লাগছে।

বিকেলের দিকে ফেরার সময় আবার কনস্টেবল ছেলেটির কাছে গেলাম। এসে থেকে দেখছি বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। দুধগঙ্গা যাবার ব্যবস্থা ও-ই করে দিয়েছিল তাই কাছে গিয়ে বললাম,—যাচ্ছি।

ওর চোখ দুটো যেন একটু ছলছলিয়ে উঠল এ কথায়। বলল,—মাইজী! কত দিন দেশের লোক দেখি না। একা একা এই জঙ্গলে পড়ে আছি। এমন ভাবে কথা বলছিল আমি যেন ওর দেশের লোক। বুঝতে পারব ওর দুঃখ। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওর বাড়ী ছাপরা জেলায়। ভাই-বোন, মা-বাপ, জরু সব দেশে। নাম মহীন্দর সিং।

ওর বাড়ী বিহারে আর আমার বাংলায়, তবু বুঝি ওর মনে হ'ল আমি যেন ওর আপনজন। ভাবছিলাম ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা চোখের সামনে মেলে

ধরলে অবশ্য বিহার আর বাংলার দূরত্ব বেশী নয়। পড়োশীর মত পাশাপাশি দুই প্রদেশ। ছাপরা আর মালদাও কি খুব দূর? বিহারের বহু মানুষই তো রুজি-রোজগারের জন্য বাংলায় আসে। ঘরও বাঁধে সেখানেই। আমাদের গ্রামেই দেখেছি এমনি। আচারে-বিচারে প্রায় আমাদেরই মত। তাই বুঝি আমাকে দেখে কাছের মানুষ মনে হয়েছে ওর। আট হাজার ফিট ওপরে জনমানবহীন রিজার্ভ ফরেস্টে কাজ করে। জঙ্গলেই ওর ডিউটি। নিঃসঙ্গ জীবন। তাই বুঝি মানুষের সঙ্গ পাবার লোভেই এখানে আসে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? আমাদের বাস চলে গেলেই চৌকিদারও হয়তো ঘর-দোর বন্ধ করে বাড়ি চলে যাবে। আর ও? বেচারা মহীন্দর! যাবার বেলায় আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর জন্য। ঘন সবুজ পাইনবনের যে শোভা দেখে এতক্ষণ মুগ্ধ হয়েছি, মনে হ'ল একটু পরে আঁধার নামলে তাই ওর কাছে বিভীষিকা সৃষ্টি করবে।

অজান্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল একটা।

মোগল গার্ডেনস্

॥ ৪১ ॥

আজ সকাল থেকে বিশেষ তাড়া ছিল না। কারণ বেশীদূর যেতে হবে না। আজকের প্রোগ্রাম—মোগল গার্ডেন্স। বেলা দুটোয় বাস। খেয়েদেয়ে ধীরে-সুস্থে আমরা টুরিজিমের অফিসে গেলাম। ডাল লেকের পাশ দিয়ে যে রাস্তা, যে পথে রোজই আমরা যাওয়া-আসা করি, সেই পথেই আজ চললাম বাসে করে। প্রথমেই আমাদের বাস মাইল এগারো দূরে যেখানে গিয়ে থামল তার নাম শুনলাম 'হরোয়ান'। গাছপালায় ঘেরা সুন্দর জায়গা। আর সব চেয়ে সুন্দর পাহাড়ে-ঘেরা একটি ছোট্ট হ্রদ। শুনলাম এখান থেকেই শ্রীনগরের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। দুপুর রোদে বাসে আসতে গরম লেগেছিল। বাগানের ভেতর সরু নালা দিয়ে কুল কুল করে ঠাণ্ডা জল বয়ে চলেছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছায়ায়-ঘেরা স্থানটি খুবই ভালো লাগল।

যাত্রী নিয়ে আরো বাস এসেছে। বহু দর্শনার্থী এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বেশীক্ষণ এখানে থাকা হ'ল না। আবার অন্যখানে যেতে হবে। গাড়ীর

হর্ন বেজে উঠল। হুড়োহুড়ি করে আবার সবাই বাসে উঠে বসল। আমাদের বাসের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এত তাড়াতাড়ি বাস ছাড়ার জন্য একটু বিরক্ত হয়েছেন, মনে হ'ল। বললেন,—শুধু একটা হ্রদ দেখার জন্য দুপুর রোদে ছুটে এসেছিলাম নাকি! কোথায় কি আছে ভালো করে দেখাই হ'ল না।

ওঁর কাছেই শুনলাম, এখানে পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে মাটি খুঁড়ে বৌদ্ধযুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। কোথায় সেটা খোঁজ করে দেখা হ'ল না। এবার আমাদেরও আফসোস হ'ল একথা শুনে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। আগে জানলে না-হয় খোঁজ করা যেত। ভাবলাম বাসে করে এনে শুধু ছেড়ে না দিয়ে যদি সঙ্গে একজন গাইড বা গাইড-বুক দেবার ব্যবস্থা থাকত তাহলে ভালো হ'ত। পর্যটন বিভাগ থেকে এটুকুন করা এমন কিছু ব্যাপার নয়। সকলেই আর সব কিছু জেনে নিয়ে বেড়াতে আসে না। আমরা তো না জেনেই এসেছিলাম। আর এই ভদ্রলোক জেনেও দেখতে পেলেন না। হয়তো বাস ছেড়ে দেবার ভয়ে বিশেষ খোঁজখবরও করতে পারেননি।

এবার আমাদের বাস এসে দাঁড়ালো 'শালিমার বাগে'। মোগল গার্ডেনের কথা বহুবার শুনেছি। আজ চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হ'ল। বাদশাহী গেটে ঢুকেই মোগল উদ্যানের যে বিরাট সৌন্দর্য চোখে পড়ল তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। পাহাড়ের গায়ে থাকে-থাকে উদ্যান। মাঝখান দিয়ে বাঁধানো পথে ঝরণার জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে। অজস্র ফোয়ারা। ঝরণার দুপাশ দিশে পায়ে-চলার বাঁধানো পথ। বড় বড় চেনার গাছের ছায়ায় তৃণাচ্ছাদিত বিরাট লন দুপাশেই। আর অজস্র ফুল। যাত্রীও কম আসেনি। ওপরে নীচে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন মিলনোৎসব আজ এখানে। রঙীন প্রজাপতির মত শিশুরা আনন্দে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে। অতীত আর বর্তমানের ছবি একসঙ্গে ফুটে উঠল চোখের সামনে। কয়েকশত বৎসরের পুরাতন বাগিচা আজও সজীব প্রাণবন্ত মনে হ'ল।

ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলাম। এত বিরাট বাগান যার যেদিকে খুশী আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিন ধাপে বাগান শেষ হয়েছে। কোন্ ধাপে কে আছে জানি না। যেতে যেতে চোখে পড়ল নিরিবিলি চেনারের ছায়ায় আর কুঞ্জের আড়ালে অনেকগুলি যুগল মূর্তি। এমন রমণীয় স্থান! নিভৃতে মন দেওয়া-নেওয়ার এমন মধুলগ্ন কি আর বার বার আসবে জীবনে? শালিমার কথার

অর্থ নাকি—'প্রেমের লীলানিকেতন'। মনে মনে হেসে ভাবলাম, সার্থক নামকরণ হয়েছে এ উদ্যানের।

'শালিমার' এখনও তার নামের গৌরব হারায়নি।

একেবারে শেষ অবধি উঠে সমস্ত বাগানটি দেখে নিলাম আমি। বাগানের শেষ সীমা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গাছপালার আড়ালে থাকে বলে পাঁচিল চোখে পড়ে না। যেখান থেকে ঝরণার জল আসছে সেটাও দেখলাম। ফেরার পথে দেখি নীলিমা ওর এক বান্ধবীর সঙ্গে বসে গল্প করছে। বহুদিন বাদে ওদের দেখা হ'ল এখানে এসে। ওদের পাশে বসে আমিও একটু জিরিয়ে নিলাম। বাসের হর্ন শোনা যায় না এত দূর থেকে। কিন্তু অনেককে নীচে নামতে দেখে আমরাও নেমে এলাম।

বাগানের মাঝখানে কালো মার্বেল পাথরের একটা ছোট বাড়ি। বাদশাহ-বেগমের প্রমোদভবন। প্যাগোডার মত ওপরের চারচালা ছাদ। ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে সুন্দর করে ছাওয়া। মনে হ'ল এটা কাশ্মীরের নিজস্ব ঢং। আর ঘরের ভেতরে ছাদে কাশ্মীরী শালের মত অপূর্ব রঙীন নকশা। সামনেই প্রপাতের মত ঝরণার জল নেমে আসছে। মাঝে মাঝে ফোয়ারা। চারিপাশে ফুলের সমারোহ। বেগম নূরজাহানের মনোরঞ্জনের জন্য জাহাঙ্গীর এই উদ্যান তৈরী করিয়েছিলেন। আমার মনে হ'ল এ উদ্যানের পরিকল্পনা এবং এমন কাব্যিক নাম-করণ হয়তো বেগমেরই। কারণ নূরজাহান শুধু অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তাই নয়, একাধারে তিনি অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর প্রতিভার বহু স্বাক্ষর আছে ইতিহাসে। লাহোরে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে তাঁর স্বরচিত কবিতা উৎকীর্ণ আছে। মক্‌ফী এই ছদ্মনামে পারস্য ভাষায় তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। মুখে মুখে কবিতা রচনা করে তিনি সম্রাটকে উপহার দিতেন। এই বিদুষী সম্রাজ্ঞী যেমন সুন্দরী ছিলেন, তাঁর সৌন্দর্যবোধ উদ্ভাবনী-শক্তি ললিতকলা-জ্ঞানও তেমনি অনন্যসাধারণ ছিল। আতর গোলাপজল তাঁরই আবিষ্কার। আবার রন্ধন-বিদ্যাতেও তিনি সমান পটু ছিলেন। আর সেই খাবার যখন ফুলের মত করে সম্রাটের সামনে সাজিয়ে দিতেন তাও দেখার মতই হ'ত। জগজ্জ্যোতি নূরজাহান শুধু রূপের জ্যোতিতেই সম্রাটের হৃদয় জয় করেননি, তাঁর নানাগুণে সম্রাট বাঁধা পড়েছিলেন তাঁর কাছে।

প্রমোদ ভবন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আর কল্পনা করছিলাম পূর্ণিমা রাতে যখন এই বাগিচার ফুল পাতা জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করে ঝিকমিক করে উঠত, চন্দ্র-

কিরণে ঝরণার জলে লক্ষ মাণিক জ্বলে উঠত আর মলয় পবনে ফুলের সুবাস ছড়াত, তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমাকে নিয়ে এইখানে বসেই উপভোগ করেছেন এই উদ্যানের শোভা। এই সৌন্দর্যপিপাসাই তাঁকে বার বার টেনে এনেছে কাশ্মীরে।

কিন্তু শুধু এই উদ্যানের শোভা কি তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারত যদি পাশে প্রেয়সী নূরজাহান না থাকত? আর সে সুন্দরীর রূপচর্চার ফলে উদ্ভাবিত হয়েছিল পেশোয়াজের দুদামী মসলিন, ওড়নার পাঁচ তোলিয়া, আঙ্গিয়া (bodie), বাদ্‌লা, কিমারি (lace)—মোহিনীবেশে তিনি যখন পাশে এসে দাঁড়াতেন রক্তগোলাপ হাতে নিয়ে, তখন কার সৌন্দর্য তাঁকে বেশী মুগ্ধ করত এই কূট প্রশ্নের যখন মীমাংসা করছি মনে মনে—তখন বেরসিকের মত অসিত ঠাকুরপো এসে ডাক দিল—বাস ছেড়ে যাবে। আরো মোগল গার্ডেন আছে দেখার, চল।

মনে মনে বিরক্ত হলেও ওর পেছন পেছন নেমে এসে বাসে উঠলাম। ভাবছিলাম এখানে একজন গাইড নেই কেন? এমন সুন্দর বাগানে বসে অতীতের দু'একটা কাহিনী শুনতে পেলে আরো কত ভাল লাগত!

শালিমার দেখার পর নিশাতবাগে পৌঁছে আর অতটা বিস্ময় জাগে না মনে। তবে এ বাগান আরো বড়। দশ ধাপে শেষ হয়েছে। এখানেও সবাই বাস থেকে নেমেই ওপরের দিকে চলে গেছে। আমার আর ওপরে যাবার ইচ্ছে হ'ল না। এখানেও সেই একই ভাবে ঝরণার জল নেমে আসছে ওপর থেকে। অজস্র ফোয়ারা ফুল আর ফলের বাগিচা দুপাশে। বড় বড় চেনার গাছ। ঘাসে-ছাওয়া সবুজ লন। এখানকার প্রমোদ ভবনটি শালিমারের চেয়ে বড় হলেও অত সুন্দর নয়। তবে সামনে একটা বড় চৌবাচ্চার মত। ঝরণার জল তোড়ে নেমে এসে পড়ছে ওতেই। কিন্তু চৌবাচ্চাটি ভরে যাচ্ছে না। এত জল কিভাবে কোথায় যাচ্ছে তাই লক্ষ্য করে দেখছিলাম জলের ধারে বসে।

একজন বুড়ো মালী বাগানে কাজ করছিল, আমাকে একলা বসে থাকতে দেখেই বোধ হয় এগিয়ে এসে গল্প শুরু করল। ও ঠিক গাইড নয়। তবু কিছু কিছু ঐতিহাসিক গল্প ও জানে, তাই শোনাচ্ছিল আমাকে।

ইতিহাস আমি ভালবাসি সত্যি গল্প বলে। এ বয়সেও আমার মন বোধ হয় ইতিহাসের সেই সত্যি গল্পগুলো আরও সত্যি করে জানার জন্য নিদর্শন খুঁজে মরে। এই যে মোগল-উদ্যান, ভগ্নপ্রাসাদ সবই তো সেই গল্পের

সত্যতা প্রমাণ করছে !

শৈশবে সব শিশুই গল্প শুনতে বসে প্রশ্ন করে, সত্যি বলছ ? তার মনে প্রশ্ন জাগে গল্পটা সত্যি কিনা। আমার মনে হয় ঐতিহাসিকেরাও শিশুর মত সত্যি জানার কৌতূহলেই এত পরিশ্রম করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও মাটি খুঁড়ে মরেন একই কৌতূহলের প্রেরণায়। কোন একটা মৃৎপাত্রের সামান্য ভগ্নাংশ চোখে পড়লেও অসীম ধৈর্য আর পরিশ্রমে প্রমাণ করে খুশী হন কত শতাব্দী পূর্বের মানুষ সেটি কিভাবে ব্যবহার করেছিল। শিশুর মতই আনন্দে আত্মহারা হন এর সত্যতা প্রমাণ করে।

আমি অবশ্য সবই সত্যি বলে মনে করি। ইতিহাসের গল্পও যেমন সত্যি, গাইডের গল্পও কম সত্যি নয় আমার কাছে। বুড়োটি যখন বাদশাহ-বেগমদের কাহিনী বর্ণনা করে স্থাননির্দেশ করে দেখাচ্ছিল আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম ওর কথা। গল্পশেষে মালীটির হাতে একটি টাকা গুঁজে দিলাম।

ওপর থেকে ওরা ফিরে এলে যখন যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, দেখি বুড়ো মালী আমার জন্য একটা ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে। মোগল-উদ্যানের ফুল। তাই আমার কাছে এর মূল্য অনেক। আমি সযত্নে তোড়াটি নিয়ে মালীকে ধন্যবাদ দিয়ে পথে নামলাম।

এর পর 'চশমাশাহী'। এখানেও পাহাড়ের গায়ে ছোট একটি উদ্যান। এখানে উঠতে কষ্ট নেই। বাগানের মধ্যে একটি ছোট ঘরে ঝরণা। বাঘ-মুখের ভেতর দিয়ে জল পড়ছে, যাত্রীরা সবাই এ জল খাচ্ছে, আবার সঙ্গের জলের পাত্রে জল ভরে নিচ্ছে দেখে আমিও গিয়ে জল খেলাম আর জল ভরে নিলাম। দেখি বরফের মত ঠাণ্ডা জল। মনে পড়ল এই ঝরণার কথাই মোহন আমাকে বলেছিল পহলগামে। চশমাশাহী কথার অর্থ—বাদশাহী ঝরণা। বাদশাহ সাজাহান এ জলের উপকারিতার জন্যই এখানে এই উদ্যান রচনা করেছিলেন। এখানে এখন যেসব ভ্রমণকারী স্বাস্থ্যের জন্য আসবেন ভারত সরকার তাঁদের থাকার ব্যবস্থাও করেছেন। ছোট ছোট কটেজ তৈরী হয়েছে এখানে। আধুনিক যুগের যত প্রকার আরাম এবং বিলাস সম্ভব তার সব ব্যবস্থাই আছে এখানে। দক্ষিণাও প্রচুর। মনে হ'ল বিদেশীদের কথা মনে করেই এসব করা।

ফেরার পথে পাহাড়ের গায়ে খুব সুন্দর একটা রাজপ্রাসাদের মত সাদা বাড়ী চোখে পড়ল। জঙ্গলে ঢেকে ফেলেছে প্রায়। শুনলাম ওর নাম 'পরীমহল'। নানা গল্প-কাহিনী নাকি প্রচলিত আছে কাশ্মীরীদের মধ্যে এই বাড়ী নিয়ে।

ওখানে যাবার উপায় নেই। কিন্তু সরকার থেকে ইচ্ছে করলে কি এটা রক্ষা করার বা ভ্রমণ-বিলাসীদের দেখাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়? আর একটা কথা মনে হ'ল। শুনেছিলাম স্বর্গীয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন কাশ্মীরের কোন এক বাদশাহী বাগানে। কিন্তু এতগুলো মোগল-উদ্যান দেখলাম, কোনখানে তাঁর কথার উল্লেখ বা কোন স্মৃতিচিহ্ন চোখে পড়ল না। হয়তো আর কোন উদ্যান আছে। কিন্তু সেটা কোথায় তাও জানা গেল না। প্রত্যেক বাঙালীর কাছেই সে যে তীর্থস্থান। আমাদের ভ্রমণ-তালিকায় বিশেষ করে সেই বাগানটি দেখাবার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হ'ত।

॥ ৪২ ॥

কাল উস্‌মার্গ থেকে ফেরার পর হঠাৎ বোটের মালিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাঝখানে কদিন আর দেখা হয়নি। হয়তো অন্য কোন পার্টির পেছনে ঘুরেছে। আমরাও তো বাইরে বাইরে কাটাই সারাদিন। কাজেই দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবও নয়। আমাদের এমনি কোন দরকার ছিল না বোটওয়ালার সঙ্গে—তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছিল। শুকনো রুটি-তরকারি খেয়ে সারাদিন ঘোরাঘুরি। রাতে বোটে ফিরেও প্রায় সেই একই মেনু। কাজেই ছেলেরা সবাই বিরক্ত হচ্ছিল। বিশেষ করে মণ্টু। আর উস্‌মার্গে ভালো খাবার ব্যবস্থা হতে পারত জেনে আরো মেজাজ বিগড়েছে ওর। তাই বোটওয়ালার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র ও সোজাসুজি জানিয়ে দিল যে, এরকম হলে আর বোটে থাকবে না।

এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা দেখাশোনার দায়িত্ব অনিলদার। তাই অনিলদাও বলতে ছাড়লেন না যে সকাল দুপুর রাতে সেই একই ডিমের ভাজা আর তরকারি খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেল। অসিত ঠাকুরপোও চুপ করে ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম বোটওয়ালাকে দেখে। এতজনের কথা শোনার পরও হাসিমুখে সব দোষ স্বীকার করে নিল। কোন প্রতিবাদ জানালো না। বরং মনে হ'ল যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছে আমাদের ঠিকমত যত্ন করা হয়নি বলে। বলল,—গরীব আদমী। কাজের ধান্দায় সারাদিন ঘুরে বেড়াই। অনেক রাতে ফিরি। খুবই কসুর হয়ে গেছে আপনাদের কাছে আসতে পারিনি। তবে এখন কি করতে

হবে আমাকে বাতিয়ে দিন। আমি তো দুজন লোক মোতায়েন করেছি আপনাদের জন্য। তারাও কিছু করেনি দেখছি। প্রথম দিনের মতই অনিলদার পায়ের কাছে বসে পড়ে হাত কচলাতে লাগল।

এবার মণ্টু একটু নরম সুরে বলল,—আর যাই হোক, খাবার পরে একটু মিষ্টি বা চাটনীও তো দিতে পারতে। ও একদিন সে চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। আবিষ্কার করেছে যতগুলো জেলির কৌটো সাজানো আছে খাবার ঘরে—সব-গুলোই খালি। শুধু ঘরের শোভার জন্যই সাজিয়ে রেখেছে ওগুলো।

মণ্টুর কথায় বোটওয়ালা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগল, এ আর বেশী কি বাত আছে? কত চাটনী খাবেন? আমি ঘরে আচ্ছা চাটনী বানাতে বলে দিচ্ছি।

এ কদিন সকালের ব্রেকফাস্টের সময় জেলি বলে পাঁউরুটিতে কালচে রং-এর যে জিনিস মাখিয়ে দিয়েছে, ঘরে প্রস্তুত সেই পদার্থের কথা মনে হতেই বোধ হয় মণ্টু বলে উঠল,—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ও কিনে আনলেই চলবে।

কিন্তু বোটওয়ালার মুখের চেহারা দেখে মনে হ'ল ও যেন খুব খুশী হ'ল না এ কথায়। বলল,—ঘরে করলে যতখুশী খেতে পারবেন, কেনা জিনিস কি তাই হবে? আপনাদের পছন্দমতই করে দেবে। আমার দিকে তাকিয়ে বললে—মাইজী না হয় একটু দেখিয়ে দেবেন।

পাশের একটা ছোট বোটে ওদের রান্না হয়। সেটাই ওদের বাড়ী-ঘর। আমার নিজেরই কৌতূহল ছিল ওদের সম্বন্ধে জানার। কাজেই এ প্রস্তাবে এক কথায় আমি রাজী হয়ে গেলাম।

বোটওয়ালা যেন হাতে স্বর্গ পেলো, এমনিভাবে বলতে লাগল,—কী কী চীজ কতটা করে মাঙ্গাব আমাকে বলে দিন মাইজী।

এ কদিনেই জেনেছি এখানে তরিতরকারি, মাছ, মাংস, ডিম, ফল, দুধ সবই খুব সস্তা। তবে ওরা বলে মিলিটারী আসার আগে নাকি আরো সস্তা ছিল এসব। সে যাই হোক আমি বেশী করেই কিসমিস আর আলুবখরা আনতে বলে দিলাম। একেবারে বেশী করে চাটনী করে রাখলে শীতের দেশে নষ্ট হবার ভয় নেই। বোটওয়ালাও বলল, কালই সব চীজ এনে রাখবে।

আজ তাই মোগল-গার্ডেন থেকে বেড়িয়ে এসে স্নান সারা হতেই খোঁজ নিলাম কখন যাব চাটনী করতে। মকবুল একটু ইতস্ততঃ করে আমাকে

জানালো—আগে সব কিছু রেডি আছে কিনা দেখে এসে আমাকে খবর দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো ও। ওর সঙ্গে দুই বোটের ওপর একটা চওড়া তক্তা পেতে যে সাঁকো তৈরী হয়েছে তাই দিয়ে ওদের বোটে গিয়ে হাজির হলাম। এটা আমাদের মত বড় বোট নয়। আমাদের দেশে যেমন নৌকো থাকে—আর বড় নৌকোতে যেমন ভেতরে খোপ-খোপ করা থাকে তাই, কাঠের পাটাতন। ছাদও খুব উঁচু নয়। সামনের ঘরখানাই রান্নাঘর। কাঠের মেঝের ওপরই মাটির উনুন পাতা আছে। আমরা যেমন কাঠের তোলাউনুন পাতি ঠিক তেমনি। মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা-পোঁছা। কোথাও একটুও কালির দাগ নেই। সাদা ধবধব করছে। দেখে ভালো লাগল। বেশ টক্‌টকে-রং একজন বুড়ো মত লোক দাঁড়িয়ে ছিল। মকবুল আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গিয়েছে—কাজেই ওই বুড়োই আমাকে রান্নার বাসন আগিয়ে দিল। উনুনে আগুন ছিলই, উনুনও ধরিয়ে দিল। কিন্তু চাটনী করতে বসে দেখি ছোট্ট একটা কাগজের প্যাকেটে একটুখানি আলুবখরা শুধু। কিসমিস নেই। তাই চাপিয়ে দিলাম। তারপর যখন চাটনীতে চিনি দেবার সময় হ'ল বুড়োর দিকে তাকাতেই ও-ই বরং আমাকে প্রশ্ন করল—চিনি কি গুড় ?

আমি একটু অবাক হলাম এ প্রশ্নে। কারণ আলুবখরার চাটনী আবার গুড় দিয়ে হয় নাকি ? আমি শুধু বললাম—চিনি নেই ? বুড়ো একটু আমতা আমতা করে বলল,—হ্যায়। ছটাংভর। বুড়ো পানের খিলির মত ছোট্ট একটা কাগজের মোড়কে ছটাক খানেক চিনি এগিয়ে দিল।

প্রথম থেকেই আমি একটু বিরক্ত হয়েছিলাম। চিনির পরিমাণ দেখে আমার পিত্তি জ্বলে উঠল। কারণ এটুকুন চিনিতে কিছুই হবে না। ভাবলাম শুধু শুধু হাঙ্গামা করলাম, এখানে না এলেই হ'ত। এ চাটনী কেউ মুখেও দেবে না।

বুড়ো বোধ হয় আমার মুখ দেখেই বুঝেছিল। নিঃশব্দে সরে গেল ওখান থেকে।

কড়াটা নামিয়ে রেখে চলে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় একটা খস খস আওয়াজ শুনে আমি ভেতরের দরজার দিকে তাকালাম। প্রথমটায় কিছুই ঠাহর হ'ল না ব্যাপারটা। তারপর বুঝলাম বোরখা-পরা একজন মেয়ে নীচু হয়ে এঘরে ঢুকছে। দু-ঘরের মাঝে একটা ছোট দরজা। মাথা না নীচু করলে এঘরে আসা যায় না, মাথায় চোট লাগবে। আর বোরখা-পরা জবরজঙ্গ অবস্থার জন্যই

বোধ হয় আরো নীচু হয়ে ঢুকছিল। এ ঘরে ঢুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আমার বিরক্তি বোধ হয় তখনও চোখে-মুখে প্রকট। মনে মনে ভাবছিলাম—বুড়ো পালিয়েছে এবার হয়তো বুড়ী এসে আমাকে জ্বালাবে। এতক্ষণ কিছু না বললেও এবার কিছু কড়া কথা শোনাব ঠিক করলাম। কিন্তু যা আমার কল্পনায় আসেনি তাই ঘটল। হঠাৎ মুখের ঢাকনা তুলে দিয়ে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের অল্প-বয়েসী মেয়ে হেসে আমাকে আদাব জানালো। কিছু বুঝি বলল, কিন্তু কী যে বলল সে-কথা আমি শুনিনি। বা শুনলেও আমার বোধগম্য হয়নি। কারণ আমার সমস্ত মন তখন অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে আছে মেয়েটির মুখের দিকে।

বোরখার রং হয়ত এককালে সাদাই ছিল। কিন্তু এতই ময়লা যে এখন আর তা বোঝার উপায় নেই। পাঁশুটে ছাই রং ধরেছে। কিন্তু তারই আড়ালে যে ফুলের মত সুন্দর মুখখানা ঢাকা ছিল তার বুঝি কোন তুলনা মেলে না। এমন রং, এমন কাজল-কালো চোখ, তুলি দিয়ে আঁকা ভুরু, ডালিম ফুলের মত টুকটুকে লাল দুটি ঠোঁট আর এমন মুখশ্রী—এইখানে এইভাবে দেখব আমি কল্পনাই করিনি। কবি বুঝি এমনি মেয়ের রূপবর্ণনা করে বলেছেন—পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি! মোগল-উদ্যানে বেগমদের যে রূপ আমি কল্পনা করার বৃথা চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কল্পনায় যা ধরা দিচ্ছিল না তাই বুঝি মূর্তি ধরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি আমার মুগ্ধ দৃষ্টিতে আড়ষ্ট না হয়ে মুখের ঢাকনাটা একেবারে খুলে ফেলে আরো একটু এগিয়ে এলো। ওর মনেও বোধ হয় বিদেশী মেয়ে সম্বন্ধে প্রচণ্ড কৌতুহল। তাই নিজের সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে বরং আমার সঙ্গে প্রথমে ও-ই কথা শুরু করল। একেবারে কাছে এসে আমার শাড়ি-গয়না সব কিছু সম্বন্ধেই কৌতুহল প্রকাশ করতে লাগল। এটা আমার কাছে নূতন ঠেকল না, কারণ পল্লীগ্রামে গেলে আমাদের দেশের মেয়েদেরও ঠিক এইভাবেই গায়ের কাছে এসে শাড়ি-গয়না সম্বন্ধে কৌতুহলী হতে দেখেছি।

কী করে যে আমাদের গল্প জমল জানি না। তবে দেখলাম যে ভাষাটা একটা সমস্যাই নয়। আমি ওর কাছ থেকে আমার এই সামান্য কটি হিন্দী শব্দের পুঁজি নিয়েই অনেক খবর সংগ্রহ করলাম। শাশুড়ী নেই। শ্বশুরই সব। স্বামী দিনমান বাইরে বাইরে থাকে। বোটের ভাড়াটে এনে দিয়েই খালাস। তারপর তাদের দেখাশোনা, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা সব এই বুড়োই করে। বুঝলাম চিরন্তন পিতৃস্নেহ। ছেলে হয়তো ঠিকই বলে গিয়েছিল আমার জন্য সব জিনিস যোগাড় করে রাখতে কিন্তু ছেলের বেশী খরচ হয়ে যাবার ভয়ে কৃপণতা করেছে

বুড়ো। তবে এখন আর ওর ওপর আমার রাগ নেই। কারণ এমন ব্যাপার হ'ল বলেই তো বেকায়দায় পড়ে ছেলের বৌকে পাঠিয়েছে আমার কাছে। এ নৌকোর ভেতরে কোন আসবাবপত্র নেই। মেঝের পাটাতনের ওপরে জানালার ধারে ধারে ময়লা কাঁথার বিছানা জড়িয়ে রেখেছে। আমাদের বোটে যেমন বিলাসের বাহুল্য, এখানে তেমনি কৃচ্ছ্রতা। দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। আমি প্রশ্ন করলাম,—তোমাদের অত ভালো বোট—তাতে তো প্রচুর আয় হয়, তবে এমন কষ্ট করে থাকো কেন?

ও বলল, বোটে তো বারো মাস ভাড়া থাকে না। তারপর বোটের খরচও অনেক। শীতের ক'মাস তো বোট বন্ধই থাকে। এখনকার এই ক'মাসের আয় থেকেই সারা বছর চালাতে হয়।

কাশ্মীরের শীতের কথা জানতে চাইলাম। বলল,—নৌকোতেই থাকে। শীতের সময় নৌকোতে সব সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। তবে কোন-কোন বার বেশী শীত পড়লে লেকের জল জমে বরফ হয়ে যায়। এমন কি নৌকোর ছাদেও পুরু হয়ে বরফ জমতে থাকে। এরা তখন ছেলেপিলে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে চলে যায়।

ওর ছেলেমেয়েদের আমি দেখেছি। বড়টি ছেলে, আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে। বললাম,—তোমার ছেলেমেয়ে তো তোমার মত এত সুন্দর হয়নি? ও ফিক করে হেসে ফেলল। বলল—ওদের বাবার মত হয়েছে। আমি বললাম,—না, তাও না। তবে তোমার মত নয়। ও আবারও একটু হাসল।

পথে ময়লা হবার ভয়ে রঙীন শাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। আমার পরনের রঙীন সিল্কের শাড়িখানা বৌটির খুবই পছন্দ হয়েছে দেখলাম। বোধ হয় তামাশা করেই বলল—যাবার সময় আমাকে এটা দিয়ে যেও।

শাড়ির কথায় আমিও হেসে বললাম—তুমি তো শাড়ি পর না, এ দিয়ে কি করবে?

ও হাসিমুখে উত্তর দিল, এটাকে ফালি করে মাথায় দেব।

মনে পড়ল, তাই তো ওরা যে মাথায় ওড়না দেয়! জিজ্ঞেস করলাম—বাইরে যাও না? তখন কি পোশাক পর?

নৌকোর ভেতর দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বলল—শাশুড়ী নেই, তবে শ্বশুর খুব কড়া! কখনও বাইরে গেলে এটি ছাড়ার উপায় নেই। অর্থাৎ বোরখা ঢেকেই বেরোতে হয়। সেও কালে-ভদ্রে।

আমি ঠাট্টা করলাম—তবে আর তুমি শাড়ি দিয়ে কি করবে? সেজেগুজে লাভ কি? আমার ঠাট্টার উত্তরে কোন কথা না বলে শুধু একটু হাসল।

বুঝলাম শ্বশুরের কড়া শাসন। নাহলে এ নৌকোতে এসেও কোন মেয়ে আছে ভেতরে বুঝতেই পারিনি! এমনিতে তো এখানে বসেই ভেতরের সবগুলো খোপ চোখে পড়ে। হয়তো কোন কোণে লুকিয়ে বসেছিল তখন। আমাদের বোট থেকেও কখনও জানালায় উঁকিঝুঁকি দিতেও দেখিনি ওকে।

আমার সঙ্গে গল্প করতে পেয়ে বোধ হয় ও খুশী হয়েছিল। তাই আমাকে আবার আসার অনুরোধ করল। আমিও কথা দিয়ে বোটে ফিরে গেলাম।

রাতে খেতে বসে মণ্টু চাটনী মুখে দিয়েই মুখ বিকৃত করে জিজ্ঞেস করল—কাকীমা, আপনি যে চাটনী করবেন বলেছিলেন?

আমি হেসে জবাব দিলাম—কাকীমার হাতের গুণে তো চাটনী মিষ্টি হবার কথা নয় বাবা! তারপর ছটাংভর চিনির গল্প করলাম।

এবার হাসির ধুম পড়ল।

গুলমার্গ

॥ ৪৩ ॥

কাশ্মীর থেকে যাঁরাই বেড়িয়ে ফিরে যান তাঁদের মুখে বিশেষ করে মোগল-উদ্যান আর গুলমার্গের গল্প শোনা যায়। কাজেই গুলমার্গ দেখার খুবই কৌতুহল ছিল আমার মনে। 'উলার' দেখতে গিয়েছিলাম যে পথে সেই পথেই কিছুদূর গিয়ে আমাদের পথ গুলমার্গের দিকে ঘুরল। শ্রীনগর থেকে আটাশ মাইল দূরে গুলমার্গ। শেষের দিকে চার মাইল পাহাড়ী পথে গিয়ে টাঙ্গমার্গ বলে একটা জায়গায় আমাদের বাস দাঁড়ালো। খুব উঁচু নয় এ জায়গাটা। শুনলাম আগে এ পর্যন্ত টাঙ্গা আসত, তাই এর নাম টাঙ্গমার্গ। এখান থেকে আরো চার মাইল ওপরে গুলমার্গ।

গুলমার্গের উচ্চতা সাড়ে আট হাজার ফিট। এই চার মাইল খুবই চড়াই। তাই বেশীর ভাগ লোকই ঘোড়ায় যায় এখান থেকে। বাস থেকে নামামাত্র ঘোড়াওয়ালা আর হেল্‌পার এসে ছেঁকে ধরল। ঘোড়া অবশ্য প্রত্যেকেরই দরকার

কিন্তু হেল্‌পারের প্রয়োজন নেই। তাই ওদের না করে দেওয়া হ'ল। কিন্তু যখন আমরা ঘোড়ায় চেপে রওনা হলাম তখন দেখি ঘোড়ার সহিস ছাড়াও এই সব হেল্‌পার আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। বারণ করলেও শুনছে না। সামনের ওরা জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ওপরের দিকে চলে গেল বলে আর সবাই ফিরে গেল কিন্তু একটি লোক এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে এমন কাকুতিমিনতি করতে লাগল যে আর না করতে পারলাম না। আজ আমার হেল্‌পারের প্রয়োজন ছিল না। চন্দন-বাড়ি যাবার দিনই তো ঘোড়ায় গিয়েছি অতটা পথ। কিন্তু লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন মায়া হ'ল। যদিও জানি ওকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য আমার সঙ্গের সবাই আমাকে ভীতু বলে ঠাট্টা করবে।

আমার ঘোড়া এমনিই পেছনে পড়েছিল। আর এই হেল্‌পারটির জন্য আরো ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিলাম। এই কারণ এই চড়াই উঠতে ও এমন হাঁপাতে শুরু করেছে যে দেখলে কষ্ট হয়। আমি ওকে বার বার বলতে লাগলাম ফিরে যাবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই ও আমার সঙ্গ ছাড়বে না। পেটের দায়ে লোকটি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। নাহলে ওর শরীরের যা অবস্থা আমার ভয় করতে লাগল কখন ও মুখ থুবড়ে পড়ে যায় বুঝি! শীতের দেশের লোক। সমস্ত শরীর ঢাকা বলে হাড়পাঁজরা চোখে পড়ছে না, কিন্তু রংটা ফর্সা হলেও মুখের চামড়া শুকিয়ে গালে যে কত ভাঁজ পড়েছে তার ঠিক নেই। কোন কাঁচা ফল অসময়ে শুকিয়ে ঝরে পড়লে যেমন হয় এও যেন তেমনি। মুখের চেহারা এমনি হয়েছে যে বয়েস অনুমান করা কঠিন। রওনা হবার সময় ও যখন আমার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—হেল্‌পার মাইজী, হেল্‌পার! আমি যেন শুনছিলাম—হেল্‌প মাইজী, হেল্‌প। তাইতেই ওকে না করতে পারিনি। এখন দেখছি ভুল করেছি। ভাবলাম তখন ওকে দুটো টাকা দিয়ে ফিরিয়ে দিলেই পারতাম। কিন্তু এখন টাকা দিতে গিয়েও দেখি ও টাকা নেবে না। অগত্যা সঙ্গেই চলল।

গুলমার্গের রাস্তা খুব চড়াই হলেও চওড়া। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে মাঝে মাঝে ঘোড়ার পা পিছলাচ্ছে। দুধারে পাইনবন। যত ওপরে উঠছি নীচের কাশ্মীর উপত্যকার দৃশ্য অপূর্ব মনে হচ্ছে। মা-লক্ষ্মী যেন ঝাঁপি হাতে আঁচল বিছিয়ে বসেছেন। এমন ধান কাশ্মীরে না এলে আর কোন পার্বত্য এলাকায় চোখে পড়বে না। চোখ জুড়িয়ে যায়। হলুদ সবুজ নীলে নীচে যেন কার্পেট বোনা হচ্ছে। ওপরে আকাশও নীলে-সাদায় মেশামেশি। কখনও মেঘ এসে সব ঢেকে দিচ্ছে, আবার কিছুক্ষণেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

মাঝপথে এক জায়গায় সবাই ঘোড়া থামিয়ে বিশ্রাম করছিল। সেখানে পৌঁছে আমিও ঘোড়া থেকে নামলাম। এখানেও আমার হেল্পারটিকে থেকে যেতে বললাম। ফেরার সময় আবার আমাদের সঙ্গে ফিরবে। কিন্তু ও তাতেও রাজী নয়। আমার ঘোড়াওয়ালা বলল, মাইজী! ওকে আমরা গুলমার্গে রেখে খেলনমার্গ থেকে ঘুরে আসব।

দেখলাম হেল্পারটির তাতে খুব আপত্তি নেই। শেষে তাই ঠিক হ'ল। আমার এখানে পৌঁছাতে দেরি দেখে সবাই প্রথমে আমাকে একটু ঠাট্টা করছিল হেল্পার নিয়েও আগে আসতে পারিনি বলে কিন্তু লোকটির অবস্থা দেখে আর কেউ কিছু বলল না।

যে কৌতূহল নিয়ে আমি গুলমার্গ দেখতে এসেছিলাম, গুলমার্গে পৌঁছে কিন্তু আমাকে একটু নিরাশ হতে হ'ল। আমার ধারণা ছিল গুলমার্গের উপত্যকা ফুলে ফুলে ছাওয়া দেখব। চারিপাশের পাহাড়ে ঝোপেঝাড়ে কাশ্মীরের নিজস্ব ফুল দেখব যা আর কোথাও দেখিনি কখনও, কিন্তু তেমন ফুল আমার চোখে পড়ল না। তবে চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে-ঘেরা এই ছোট্ট উপত্যকাটি। একধারে পাইন বন। সামনেই গল্‌ফ আর পোলো খেলার মাঠ সবুজ হয়ে আছে। খেলনমার্গের রাস্তা গিয়েছে একপাশ দিয়ে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, কটেজ সবই ঝক্‌ঝক তক্‌তক্ করছে ছবির মত। এককালে গুলমার্গ ইউরোপীয়দের ভ্রমণতালিকায় বড় প্রিয় নাম ছিল। এখান থেকে তিন মাইল দূরে খেলনমার্গে তারা 'স্কী' খেলতে যেত। তাই ওর নাম হয়েছে খেলনমার্গ। সে আকর্ষণ অবশ্য এখনও আছে। শীতের সময় খেলনমার্গে ছ'সাত ফিট পুরু হয়ে বরফ জমে। তখন এখানেও বরফ পড়ে। আমরা গুলমার্গে না থেমে সোজা খেলনমার্গের দিকে চললাম। যদিও আমরা গুলমার্গ থেকে আরো অনেক ওপরে উঠতে লাগলাম, তবু পাশেপাশেই গাছপালা থাকাতে একটুও ভয় করছিল না। তবে বৃষ্টির জন্য রাস্তা খুবই খারাপ। খানিকটা জায়গা এত কাদা হয়েছে যে ঘোড়া নিয়েও যাওয়া মুশকিল। বহু কষ্টে সেসব কাদা পার হতে হ'ল। একেবারে ওপরে ওঠার আগে খানিকটা পথ খুব সরু। পাথরের নুড়িতে ঘোড়ার পা হড়কালে নীচের খাদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। মণ্টুরা বলল অমরনাথের পথ নাকি এমনিই।

কাশ্মীরের যা বৈশিষ্ট্য খেলনমার্গেও তাই। সবুজ-ঘাসে-ছাওয়া পাহাড়ের মাথা। খেলনমার্গ প্রায় এগারো হাজার ফিট উঁচু একটি অধিত্যকা। এখানেও একটা স্প্রীং আছে। একটা সরু নালা দিয়ে কুলকুল করে জল বয়ে যাচ্ছে। তবে

এত উঁচুতে আর কোন বড় গাছ নেই। পাহাড়ের মাথাটা চারপাশেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এত উঁচু থেকে যেদিকেই দেখা যাক মাইলের পর মাইল বহুদূর পর্যন্ত কাশ্মীরের অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ছে। দূরে চিরতুষারাবৃত নাঙ্গা পর্বতের চূড়া। কিছুদূরেই পুঞ্চের সীমানা।

খেলনমার্গের 'স্কী ক্লাব' মানে একটা তাঁবুতে কিছু হালকা চেয়ার-টেবিল আছে। ওখানে চা খাবার ব্যবস্থা আছে। এত উঁচুতে আর কোন আড়াল নেই বলে বাতাসের দাপট বেশী। তাঁবুটা তাই খুবই নীচু করে খাটানো। মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। আমাদের সঙ্গেই খাবার ছিল বলে আমরা শুধু ওদের কাছ থেকে বাসন ভাড়া নিয়ে ওখানে বসে খেয়ে নিলাম। ঘোড়ার সহিসরাও ওখানেই খেয়ে নিল। শুনলাম রাতে এখানে কেউ থাকে না। সন্ধ্যার আগেই ক্লাবের যে দু-চারজন বয়-বেয়ারা আছে ওরা নীচে নেমে যায়। ভালুকের উপদ্রব আছে এসব জায়গায়। আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর বসে গল্প করছিলাম আর মেঘের খেলা দেখছিলাম। এক-একবার মেঘ এসে নীচের উপত্যকা একেবারে ঢেকে দিচ্ছিল, আবার কখনও মেঘ সরে গিয়ে নীচের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘোড়া-ওয়ালাদের শঙ্কিত কথাবার্তায় আমাদের খেয়াল হ'ল, তাই তো ঠিক দার্জিলিংএর মতই কখনো মেঘ এসে আমাদেরও প্রায় ঢেকে ফেলছে। তার সঙ্গে ঝোড়ো-হাওয়া। রাস্তা দেখতে না পেলে এপথে নামা কঠিন। বৃষ্টি নামার আগেই আমাদের এই পথটা পার হতে হবে। আর একটুও দেরি না করে আমরা রওনা হলাম। কিন্তু ছিটেফোঁটা বৃষ্টি শুরু হ'ল আমরা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই। আর মেঘে এমন ঢেকে ফেলল যে সামনে পেছনে কোন কিছুই দেখা যায় না। আমার ঘোড়ার সহিসকেও আর দেখতে পেলাম না। ঝোড়ো হাওয়া ঠেলে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। মনে হ'ল আমি যেন ওদের সঙ্গ হারিয়ে একা একা চলেছি। মনে কিন্তু তার জন্য কোন ভয়-ভাবনা নেই। ঘোড়ার মর্জির ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম। শুধু টের পাচ্ছিলাম আমি নীচে নামছি।

যত নীচে নামছি ততই নীচের দৃশ্য স্পষ্ট হতে লাগল। শেষে এমন এক জায়গায় আমার ঘোড়া এসে থামল যেখানে বৃষ্টিবাদল কিছুই নেই। কাছেই পাহাড়ী গ্রাম। বড় বড় গাছের জটলা। তারই মাঝে কটি ছোট ছোট শিশু ধুলোবালি নিয়ে আপন মনে খেলছে। ওপরে দেখে এলাম প্রকৃতির খেলা, এখানেও শিশুরা অমনি ভাঙা-গড়ার খেলা খেলছে। আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম চারিদিক। যাবার সময় যে কাদা পার করতে সহিসরাও হিমসিম খাচ্ছিল, নামার

সময় তো সে পথে নামিনি। পাহাড়ের গা বেয়ে কোন্ পথে যে আমাকে নামিয়ে নিয়ে এলো ঘোড়া আমি টেরও পাইনি। আবহাওয়া ভালো থাকলে চোখে দেখে ওপথে নামতে হয়তো ভয় পেতাম। এতক্ষণে আমার ঘোড়ার সহিস এসে আমার ঘোড়ার লাগাম ধরল। এগিয়ে গিয়ে দেখি আর সবাইও ভালো ভাবে নেমে এসেছে। মণ্টুকে বললাম,—তোরা আমাকে যতই ভীতু ভাবিস না কেন, অমরনাথ আমি ঠিক যেতে পারতাম।

গুলমার্গে ফিরেও আমরা আর বৃষ্টি পেলাম না। ঝক্‌ঝকে রোদ। ঘোড়া থেকে নেমে কিছুক্ষণ ওখানে বিশ্রাম করলাম। টাঙ্গমার্গের দিক থেকে গুলমার্গে ঢুকতেই একটা শিবমন্দির আছে। শুনলাম মহারাজা হরিসিং-এর স্ত্রী করিয়েছেন এটি। মন্দিরে ঢুকে আমরা বিগ্রহ দর্শন করলাম। আমার হেল্‌পারটি এতক্ষণ বিশ্রাম করে একটু চাঙ্গা হয়েছে। আর নামার সময় তো কষ্ট কম। ফেরার সময় তাই ওকে নিয়ে আর আমার কোন চিন্তা ছিল না। টাঙ্গমার্গ পৌঁছে ওর পাওনা ছাড়াও আরো দুটো টাকা দিলাম আমি। অমনি ওর আঁকিবুকি-কাটা শুকনো মুখখানাও খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর চোখের দৃষ্টিতে শুধু কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। কথা ও কমই বলে। আমাকে কোন কথা না বলেই দেখি বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। আনন্দে যেন ছুটে চলল বাড়ীতে, এমনি তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। ওর চলার এই গতির দিকে তাকিয়েই বুঝলাম আজ ওর এই খুশীর ঢেউ ওর বাড়ীতে গিয়েও লাগবে।

ভাড়া মিটিয়ে আমাদের ঘোড়াগুলো ছেড়ে দেবার আগে সবাই মিলে আমাদের ঘোড়ায় চড়া ছবি নিলাম। বাস ছাড়তে তখনও দেরি দেখে আমরা রেস্ট হাউসে গিয়ে বসলাম। বেশ বড় রেস্ট হাউস এখানে। মস্ত বড় বসার ঘর। তবু বেশ ভিড়। মনে হ'ল গুলমার্গের ভ্রমণার্থীই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী।

সোনামার্গ

॥ ৪৪ ॥

আজকে সব চেয়ে দূরের পথ যেতে হবে আমাদের। এ কদিন যতগুলো জায়গা দেখলাম সবই পঁচিশ থেকে তিরিশ মাইলের মধ্যেই। আজ যাব পঞ্চাশ মাইল দূরে। প্রথমে আমাদের বাস রোজকার মতই সমতল দিয়ে ছুটে চলল। দুধারে শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে অবশ্য বড় বড় গ্রাম চোখে পড়ছিল। 'সাদীপুর' এমনি একটা বড় গ্রাম। শ্রীনগর থেকে এগারো মাইল দূরে বিতস্তা আর সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থলে এই গ্রাম। দুটি নদীর মিলন হয়েছে বলেই বোধ হয় সাদীপুর নাম হয়েছে। শ্রীনগর থেকে তিব্বত যাবার সময় স্বামী অভেদানন্দ নৌকাপথে 'ক্ষীর-ভবানী' পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে সোনামার্গ হয়ে তিব্বতে যান। বহুদিন পূর্বের কথা। তখন এমনি বাস-রুট ছিল না। ক্ষীরভবানী থেকে উনি ঘোড়াতে মালপত্র নিয়ে পদব্রজে শেষের পথ অতিক্রম করেছিলেন। দীর্ঘ সময় লেগেছিল ওঁর এই ভ্রমণ শেষ করতে। সোনামার্গ যেতেও কয়েকদিন সময় লেগেছিল। তখনকার দিনে আমাদের মত একদিনে সোনামার্গ দেখে ফেরা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন সেই সময়, যে অপূর্ব দৃশ্য ওঁর নয়নগোচর হয়েছে, ওঁর ভ্রমণকাহিনী 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' তার কিছু আভাস দিয়েছেন:

"সাদীপুর অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ। চারিদিকের পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি বরফে চিক্‌চিক্ করিতেছে। নানাবিধ পার্বত্য পক্ষীসকল উড়িতেছে। চানার গাছগুলি লাল, সবুজ ও হলদে রং-এ দিক আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সিন্ধুনদের জল এত স্বচ্ছ ও নির্মল যে জলের তলার নুড়িগুলিও স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝি মামদু অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েকটি মৎস্য বল্লম দিয়া গাঁথিয়া ফেলিল। মাছগুলি মৃগেলজাতীয়। সাদা ট্রাউট।"

আমরা অবশ্য সাদীপুরের এই সৌন্দর্য দেখতে পেলাম না। হয়তো নৌকোপথে এলে এ সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হ'ত। আমাদের বাস সঙ্গম থেকে দূরে গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। পুরানো বাড়ীঘর দেখলাম বটে তবে স্বামীজী যে লিখেছেন, —অষ্টম শতাব্দীতে রাজা ললিতাদিত্যের রাজধানী ছিল এখানে, এই স্থানটির নাম তখন 'পরিত্রাণপুর' ছিল, পরে নবম শতাব্দীতে রাজা শংকরবর্মা এখান থেকে

রাজধানী 'পত্তন' নামক স্থানে নিয়ে যায়, সেই প্রাচীন রাজধানীর অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও নাকি দেখতে পাওয়া যায়, আমরা কিন্তু সে-সব কিছু দেখতে পেলাম না। তবে পথের ধারের কাঠের ফলকে Indus valley লেখা দেখে বুঝলাম আমরা শিগগিরই সিন্ধুনদের দেখা পাব। আর সঙ্গম না দেখলেও সিন্ধুর দেখা মিলল। সিন্ধু উপত্যকা দিয়ে অল্প দূর গিয়েই পার্বত্যপথ শুরু হ'ল। এক-ধারে পাহাড় আর অন্যধারে সিন্ধু। পাহাড়ী পথ কাজেই খুব প্রশস্ত নয়। তার ওপর কাশ্মীরের পাহাড়ে অজস্র ঝরণা। বর্ষাকাল বলেও বেশী ঝরণা দেখছি মনে হ'ল। কোথাও আবার পাড়াড়ের মাটির দেয়াল চুঁইয়ে জল এসে পথ পিছল করে দিচ্ছে। আর ওপাশে ভীমগর্জনে সিন্ধু ছুটে চলেছে। বড় বড় পাথর স্রোতের মুখে গড়িয়ে যাচ্ছে। এপথে এমনিতেই ভয় করে, তার উপর দু'তিনবার পথ ছেড়ে দিয়ে নদীর দিকেই সরে দাঁড়াতে হ'ল। মিলিটারি কনভয় যাচ্ছে ওপরে। তাদের পথ দিতেই হবে। যে করেই হোক। সে কি একটুক্ষণ! মিলিটারি বোঝাই সেই দৈত্যাকার গাড়ির সার কি শেষ হয়! সব সময়ে ভয়ে ভয়ে আছি। ওই বিরাট বপু নিয়ে কোন মিলিটারি ভ্যান যদি আমাদের বাসের সঙ্গে একটুও ঠেস লাগে তবে আর রক্ষে নেই! সঙ্গে সঙ্গেই নদীতে গড়িয়ে পড়বে বাস। এত ওপর থেকে পাথরের ওপর পড়লে গাড়ি তো গুঁড়ো হয়ে যাবেই। কাজেই আমাদের কি অবস্থা হবে সে আর না ভাবাই ভালো। ওপর থেকে নদী যেন ঝাঁপ দিয়েছে এখানে। জলে রাশি রাশি ফেনার সৃষ্টি হচ্ছে। আর উৎক্ষিপ্ত জলকণা এত উঁচুতেও আমাদের গায়ে এসে লাগছে। দুদিকে পাহাড। একধারে মিলিটারি গাড়ির গর্জন আর একধারে নদীর গর্জন। মাঝখানে আমাদের খাঁচায় বন্দী ইঁদুরের মতই অবস্থা। আতঙ্কে কাঁটা হয়ে আছি।

মিলিটারি কনভয় চলে যাবার পর আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আর আরো কিছুদূর ওপরে উঠে ড্রাইভারজী যখন বাস থামিয়ে আমাদের নামতে বলল গাড়ী থেকে, যাত্রীরা আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল। পাহাড়ের চূড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গ্লেসিয়ার। অনেকেই ক্যামেরা নিয়ে ছবি নিলেন। এত কাছে থেকে গ্লেসিয়ার দেখা যাচ্ছে—মনে হচ্ছে ওপাশের ওই পাহাড়টার পরেই বরফে ঢাকা আর একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে! মাঝে যেন কোন ব্যবধান নেই। আমরা সোনা-মার্গের কাছাকাছি পৌঁছেছি মনে হ'ল। কারণ সোনামার্গ থেকে এই গ্লেসিয়ার দেখতে যায় ভ্রমণকারীরা।

আর একট জিনিস আমার চোখে পড়ল। আমাদের বাসের পাশেই পাহাড়ের

ঢালু গায়ে এক রকমের ফল। হঠাৎ দেখলে ফুল বলেই ভুল হয়। ছোট ছোট ঝোপ। পাতা দেখা যায় না, শুধু থোকা থোকা মিহিদানার মত লাল টুকটুকে ফল। রসে যেন টুপটুপ করছে। এরকম ফল আমি কখনও দেখিনি। পাহাড়ের ঢালু অংশের একটা জায়গা জুড়ে এই ফল অথচ কোন পশু বা পাখীতে খায় বলে মনে হ'ল না। আমাদের ড্রাইভারটি শিখ। তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি ? এ ফল কেউ খায় কিনা ?

গম্ভীর স্বরে সে শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিল—মালুম নেই। এপথে ড্রাইভারজী নিশ্চয়ই বহুবার যাতায়াত করেছে। সেও যখন এ বিষয়ে কিছু বলতে পারল না তখন লোভ হলেও এ ফল মিষ্টি কিনা চেখে দেখার সাহস হ'ল না। দেখলাম পাহাড়ী ছাগলগুলোও খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে, কিন্তু ঐ সুন্দর ফলের দিকে মুখ বাড়াচ্ছে না। কিন্তু না খেলেও একগোছা ডাল ভেঙে সঙ্গে নিলাম। যদি আর কেউ বলতে পারে এর কথা ! কিন্তু দুঃখের বিষয় সোনামার্গে যখন পৌঁছালাম, যখন বাস থেকে নেমে সকলের সঙ্গে আমিও রেস্ট হাউসে গিয়ে উঠলাম, ফলসুদ্ধ ডাল পড়ে থাকল আমার সীটে। ফিরে এসেও আর দেখতে পাইনি। ড্রাইভার সাহেবের পাশেই আমার সীট ছিল। হয়তো তিনিই ফেলে দিয়েছেন ওগুলো।

সোনামার্গও সবুজ-ঘাসে-ঢাকা উপত্যকা। অর্ধচন্দ্রাকারে সিন্ধু এই উপত্যকাকে ঘিরে রেখেছে। রেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে দেখছিলাম সিন্ধুর এই শান্ত চেহারা। দেখলে মনেই হয় না এই নদীরই নীচে নামার সময় অমন ভীষণ রূপ হয়। নদীর ওপারে বেশ উঁচু পাহাড় একটা। এপারে রেস্ট হাউসও পাহাড়ের কোলেই। এদিকের পাহাড়ে পাইন বন। কিন্তু ওপাশের পাহাড়ে কোন বন নেই। শুধু দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ঘোড়া চরে বেড়াচ্চে ভেড়ার পালের মত। দূরে থেকে ঘোড়াগুলো এত ছোট দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন বাঁকুড়ার মাটির পুতুল ওগুলো। এত দূর থেকে ঠিক অমনি মনে হচ্ছে। লম্বা গলা দেখেই শুধু ঘোড়া বলে চেনা যায়।

খানিকটা দূরেই নদীর এপারে মিলিটারি ক্যাম্প। পথে এদের গাড়ীর জন্যই আমাদের এখানে পৌঁছাতে দেরি হ'ল। অনেকেই এখানে পৌঁছে আবার ঐ গ্লেসিয়ার দেখতে চলে গেলেন। আমরা কি করব ঠিক করতে পারছিলাম না। কারণ অনিলদার শরীর ভালো নেই, কত দূর পথ তাও জানা নেই। ঘোড়া ছাড়া যাওয়া যাবে কিনা আর এতগুলো ঘোড়াই বা কোথায় পাওয়া যায় ? যে দু'চারটে

ঘোড়া নিয়ে লোক এসেছিল, অন্যান্য যাত্রী তা নিয়ে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল অনিলদা রেস্ট হাউসেই থাকবেন, আমরা হেঁটে যতদূর পারি ঘুরে আসব। সেই অনুসারে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

কিছুদূর যেতেই দেখি মিলিটারি ছাউনির ওধার থেকে দুটি ছেলে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকে আসছে। কি ব্যাপার জানার জন্য আমরা দাঁড়ালাম ওখানে। ওদের ভেতর অল্পবয়েসী ছেলেটি কাছে এসেই মহাআনন্দে বলে উঠল, আপনারা বাঙালী বুঝতে পেরেই আমরা ছুটে এসেছি!

আমাদেরও আনন্দ হ'ল এদের দেখে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলাম ওদের সঙ্গে। ছোটটিই কথা বলছিল বেশী, নাম বলল উৎপল। বলল,—দিদি, ছ-সাত মাস হ'ল এই নির্জন জায়গায় আছি। আজ আপনাদের দেখে ভারী ভালো লাগছে। প্রাণ খুলে বাংলা কথা কয়ে বাঁচলাম।

ওর কাছেই জানতে পারলাম এখান থেকে অমরনাথ খুবই কাছে। মাইল আষ্টেক, জীপেই যাওয়া যায়। তারপর আরো আট-নয় মাইল হাঁটা-পথ। অবশ্য অত্যন্ত দুর্গম সে-পথ। অমরনাথ পর্বতের পেছন দিক দিয়ে গুহায় পৌঁছাতে হয়। ও এবারই ঘুরে এসেছে।

আমি বললাম,—দুর্গম হলেও এদিক দিয়ে পথের দূরত্ব অনেক কম। এদিক দিয়ে অমরনাথ গেলেই হয়।

ও শুনে বলল, দিদি এপথে যে যায়নি তারধারণা করা শক্ত যে কি কঠিন পথ! মিলিটারিতে চাকরি করি, কষ্ট করা অভ্যেস আছে, তবু আমি যে আর ফিরতে পারব ভাবিনি। ওই আট মাইল পথ গিয়ে গুহায় পৌঁছাতে পারব আশাই ছিল না। যদি বা পৌঁছলাম কোনরকমে, তার পর আর ফিরতে পারি না। পথে একজন পাহাড়ী আমাকে রাতের আশ্রয় না দিলে মরেই যেতাম হয়তো। ঐটুকুন পথ যেতে আসতে তিন দিন সময় লেগেছে আমার।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়ী কোথায়? বলল, মেদিনীপুর আমার আদি বাড়ী তবে এখন বেহালায় থাকি। সঙ্গের ছেলেটিকে দেখিয়ে বলল, ধীরেনের বাড়ীও বৌবাজারে।

অন্য ছেলেটির কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না। পরে বুঝতে পারলাম ও লজ্জায় কথা বলছে না। অনেক দিন মিলিটারিতে কাজ করছে, তাই বাঙালী হলেও কথায় বাংলার চেয়ে হিন্দী টানই বেশী। দুজনেরই মিলিটারি পোশাক। না বলে দিলে ধীরেনকে বাঙালী বলে চেনার উপায় নেই। কিন্তু উৎপল এখনও

পুরোপুরি সৈনিক হতে পারেনি। চেহারায় রুক্ষতার ছাপ পড়েনি। রং কালো হলেও বেশ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। বয়েস হয়তো উনিশ-কুড়ি কিন্তু ওর কচি চেহারা আর ছেলেমানুষী স্বভাবের জন্য আরো কম বলেই মনে হয়।

ধীরেনের হাতে একটা ক্যামেরা ছিল। উৎপল বায়না ধরল,—দিদি, আমরা একসঙ্গে ছবি তুলব।

'না' করতে পারলাম না। আমরা সার বেঁধে দাঁড়ালাম। আমাদের সঙ্গে উৎপলও হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছবি তুলল।

ফটো তোলার পর আর দাঁড়ালো না ওরা। ঘড়ির দিকে তাকিয়েই, যেমন ছুটতে ছুটতে এসেছিল অমনি ভাবেই ফিরে গেল। হয়তো এসময় ওদের ডিউটি ছিল। সময়মত না ফিরে গেলে চলবে না। যেতে যেতে শুধু বলে গেল—আপনারা ঘুরে আসুন। আবার আসব আমরা।

ওদের নির্দেশমতই আমরা ঐ পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। ওদের কাছেই শুনলাম এপথে গেলেই গ্রেসিয়ার দেখা যাবে।

ওপরে ওঠার সময় একপাশে ঘন পাইন বন। পাহাড়ের উঁচু চূড়া আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। আর আমরা যেদিক দিয়ে উঠছি সেটা ঘাসে-ছাওয়া মাটির পথ। যত ওপরে উঠছি, ওপর থেকে জোর বাতাসে যেন ঠেলে নামিয়ে দিতে চায়। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বুঝি মাটির পাহাড় কিন্তু মাথার ওপরে উঠেই দেখি একেবারে রুক্‌রুকে পাথর। মাটির চিহ্ন নেই। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে যেন ছোট ছোট পাহাড়ের নমুনা গড়ে রেখেছে কেউ। ছেলেরা যেমন সরস্বতী পূজোর সময় পাহাড় তৈরী করে এও যেন তেমনি কোন শিশু-শিল্পীর হাতে-গড়া পর্বত। আমরা এই মিনিয়েচার পর্বতের চূড়াগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার হলাম। তারপরই বাঁদিকে মোড় ঘুরলেই একেবারে অন্য ছবি—যেন বাংলাদেশের কোন আম-কাঁঠালের বাগানের মধ্যে ঢুকলাম। কী গাছ চিনি না, আম-কাঁঠালের মতই বড বড় গাছগুলো মাথার ওপর ঘন পাতার ছাতা ধরে আছে। নিচে নিবিড় শীতল ছায়া। মাঝে মাঝে পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু পথ পেয়েই গলানো সোনার মত সূর্য-কিরণ ঝরণার মতই যেন নিচের ঝোপেঝাড়ে ঝরে পড়ছে। কোথাও বা লতায়-পাতায় ছিটেফোঁটা সোনালী রোদ পড়ে আলোর ফুলঝুরি তৈরী করছে। আমরা যে পাহাড়ের কোলে ছিলাম তারই উল্টোদিকে এই বন। পাহাড়ের আড়ালে থাকার জন্য বাতাসের দাপট নেই, কিন্তু মৃদু বাতাসে যখন বৃষ্টিধোয়া সবুজ ঝোপঝাড় লতা-পাতাগুলো দুলছে তখন আলোছায়ার কী যে খেলা চলেছে তা চোখে না দেখলে

ঠিক বোঝানো যায় না। অদ্ভুত শান্ত নির্জন পরিবেশ। মাঝে মাঝে শুধু নাম-না-জানা পাখীর মিষ্টি ডাক কানে আসছে। এতক্ষণ তুপুর রোদে পাহাড়ে ওঠায় যে কষ্ট হয়েছে নিমেষে সে শ্রান্তি দূর হয়ে ভরে উঠল মন। বুনো লতাপাতা আর ভেজা মাটির গন্ধ। বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম। ভারি ভালো লাগল তাই বাগানের মাঝখান দিয়ে যে পথটা গিয়েছে, খানিকদূর এগিয়ে তারই পাশে মাটিতে বসে পড়লাম আমি আর নীলিমা।

আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ ফিট ওপরে সোনামার্গের উপত্যকা। আমরা আরো ওপরে উঠেছি। এত উঁচুতে এমন বনভূমি আর এমনি অপূর্ব দৃশ্য দেখব ভাবিনি। কাশ্মীরে ছাড়া এমন বৈচিত্র্য আর কোন পার্বত্য এলাকায় চোখে পড়বে না।

বিপরীত দিক থেকে এক ভদ্রলোক ফিরে এলেন। আমাদের ওখানে বসে থাকতে দেখে বললেন, আর এগিয়ে যাবেন না। ওপাশে নদী। ঘোড়া না থাকলে জল পার হয়ে ওপারে গ্রেসিয়ার দেখতে যাওয়া যাবে না। আমি তাই ফিরে এলাম।

আমাদের সঙ্গে ঘোড়া নেই। কাজেই ওঁর কথামত ওদিকে না যাওয়াই ঠিক করলাম। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত না দেখে ফেরার জন্য একটু মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। একজন পাহাড়ী লোককে দেখে তাকেও জিজ্ঞেস করলাম, গ্রেসিয়ার কত দূর ওখান থেকে? সে যে মাথা নেড়ে কি বলল বুঝলাম না। আমার কথাও ও বুঝেছে মনে হ'ল না। বাগান থেকে বেরিয়েই দেখি অনিলদা চলে এসেছেন আমাদের খোঁজে। বললেন, একা একা ভালো লাগছিল না তাই চলে এলাম।

তুজন মেমসাহেব আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ওপরে উঠছিলেন। এতক্ষণ পরে দেখি তাঁরাও অনিলদার পেছনে পেছনে আসছেন। হয়তো ভারী শরীরের জন্য পাহাড়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল বলে পথে কোথাও বসে পড়েছিলেন। বাঙালী মেয়েদের একটা তুর্নাম আছে যে তারা কষ্টসহিষ্ণু নয়। পাহাড়ে ওঠা পরিশ্রমের কাজ। সেটা নাকি আমাদের ধাতে সয় না। আজ আমরা ইউরোপীয় ঐ মহিলা তুটিকে পেছনে ফেলে অনেক আগেই পাহাড়ে উঠেছি এবং ফিরে আসতে পেরেছি। অকারণ হলেও তাই আমরা নিজেদের বাহাতুরিতে নিজেরাই খুশী হয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম।

কাশ্মীরের শেষ সুন্দর স্থান হ'ল 'সোনামার্গ'। শুধু সৌন্দর্যের জন্যই এর নাম

হয়তো সোনামার্গ হয়নি। স্বামীজী লিখেছেন ভারতবর্ষ-ভ্রমণকারী প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক 'প্লিনি' ও 'হিরোডোটাস'-এর বর্ণনায় জানা যায় অতি প্রাচীন কালে পিঁপড়ে গর্ত করে যে মাটি তোলে তা থেকে এই প্রদেশের লোক সোনার রেণু পেত। ক্রমে এমনি করে সোনার খনি খোঁড়ার সূত্রপাত হয়। সিন্ধুনদের গর্ভেও অনেক সোনার খনি ছিল। তাই সিন্ধুর বালিতে সোনার কণা দেখা যেত। আর এই কারণেই সোনামার্গ নাম হয়েছে হয়তো। রাজতরঙ্গিনীতেও অবশ্য কাশ্মীরের সোনার খনির কথা উল্লেখ আছে।

পাহাড়ের ওপর থেকে সমগ্র সোনামার্গ উপত্যকাটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। নীচে নামার আগে তাই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মাথার ওপর নীল আকাশটা যেন পেয়ালার মত উপুড় হয়ে আছে। ঝক্ঝকে নীল আকাশের নীচে সূর্যের সোনালী আলোয় উজ্জ্বল সবুজ উপত্যকার অপূর্ব সবুজ-শ্রী খুলেছে। উপত্যকাটি অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে সিন্ধু বয়ে চলেছে। সূর্যের আলোয় আলো ঠিকরোচ্ছে জলে। এ যেন কোমল ঘন সবুজ একখানি শাড়ীর রূপুলী জরির পাড়। ওপারের পাহাড়ের পেছনদিকে সমগ্র দিকবলয় ঘিরে যে সারি সারি মেঘের স্তূপ জমেছে সূর্যের কিরণে তার সাদা চূড়াগুলো তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের মতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। উৎপল বলছিল, ওপারের ঐ পাহাড় আর এই উপত্যকা ও বরফে ঢেকে যেতে দেখেছে। কল্পনা করছিলাম তখনকার সেই সৌন্দর্যের। স্বামী অভেদানন্দও এই পথেই গিয়েছিলেন তিব্বতে। এখান থেকে 'যোজিলা' গিরিসংকট খুবই কাছে। নয় মাইল দূরে 'বালতাল' গ্রাম। সেখান থেকেই একটি পথ গিয়েছে 'অমরনাথ' গুহায়। অমরগঙ্গার ধারে-ধারেই সেই পথ। গুহার নীচে থেকে অমরগঙ্গা এসে বালতালের কাছাকাছিই সিন্ধুনদে মিশেছে। আর একটি পথ গিয়েছে তিব্বতে। তিব্বতযাত্রীরা সিন্ধু-উপত্যকা ছেড়ে প্রায় বারো হাজার ফিট উচ্চ যোজিলা গিরিসংকটের ভেতর দিয়ে সেদিকে যায়। স্বামীজী অমরনাথ গিয়েছিলেন পহলগাম থেকে। আর এই পথে তিব্বতে গিয়েছিলেন। ওঁর ভ্রমণকাহিনীতে পথের বর্ণনা যা করেছেন, মনে হয় যোজিলার সৌন্দর্য দেখেই উনি বেশী অভিভূত হয়েছিলেন। স্বামীজীর কথায়, এত উঁচুতে এমন অপূর্ব দৃশ্য আর কোথাও ওঁর চোখে পড়েনি। এ যেন স্বর্গরাজ্য। রাশি রাশি নানা বর্ণের দুষ্প্রাপ্য সব ফুল ফুটে আছে। যার কোন তুলনাই করা চলে না।

'এডেলফিস্' এমনি একটি ফুল। ইউরোপের আল্প্স পর্বতের চিরতুষারাবৃত অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও নাকি এ ফুল দেখা যায় না। তাই এগুলিকে এ্যালপাইন

ফ্লাওয়ার্স বলে। অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের সাহসী সৈন্যেরা গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ ধাতুনির্মিত এই ফুল তাদের কোটের বুকে ধারণ করে।

গিরিবর্ত্মের নবীন মঞ্জরিত তৃণরাজির স্নিগ্ধ শ্যামশোভাও মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এই গিরিপথের অপর পারে পৌঁছলেই সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য। তখন শুধু বরফ আর বরফ। শুধুই তুহিন আর তুষার। সবুজের চিহ্নও নেই কোথাও। স্বামীজী বলেছেন যে কোন পথিক যোজিলা পার হলেই বুঝতে পারবে অন্য কোন এক দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চিরতুষারাবৃত পর্বতচূড়া দেখে মনে হবে উঁচু উঁচু ঢিবির মত। কারণ তখন পথ প্রায় সর্বত্রই এগারো থেকে বারো হাজার ফিট উঁচু তিব্বতের মালভূমির ওপর দিয়ে গিয়েছে। তিব্বত হলেও আসফার্দু (লিট্‌ল টিবেট), কার্গিল (বালটিস্থান), লাদাখ (ওয়েস্টার্ণ টিবেট) মানস সরোবরের নিকট পর্যন্ত এই তিনটি প্রদেশই কাশ্মীরের অন্তর্গত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কণিষ্ক, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিহিরকুল ও সপ্তম শতাব্দীতে ললিতাদিত্য এই প্রদেশগুলি শাসন করেছিলেন। মাঝখানের খবর জানা নেই। তখন বোধ হয় তিব্বত আর কাশ্মীরের সীমানা ছিল এই 'যোজিলা' পর্বত। আবার ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জম্মুর মহারাজা গোলাপ সিংহের সাহসী ডোগরা সেনাপতি জোরোয়ার সিং দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন এবং ঐ তিনটি প্রদেশ জয় করেন। তিনি পশ্চিম তিব্বতের লাসা জয় করার জন্যও অভিযান করেন। কিন্তু মানস সরোবরের কাছে 'রুদোখে' চীনা সৈন্যের নিকট পরাজিত হন। এই তিনটি প্রদেশ এখনও ভারতের। কিন্তু মানস সরোবর যেতে হলে তিব্বতে প্রবেশ করতে হবে। সোনামার্গের কাছেই গিলগিট প্রদেশ। একদিকে চীন আর একদিকে পাকিস্তান। তাই সোনামার্গে সৈন্যাবাস রাখতে হয়েছে ভারত সরকারকে। হয়তো মধ্য এশিয়া থেকে হুষ্ক, জুষ্ক, কণিষ্ক এই পথেই কাশ্মীরে এসেছিলেন। এই গিরিপথ দিয়েই বার বার বহিঃশত্রু ভারত আক্রমণ করেছে। এই সেদিন চীন লাদাখ আর কার্গিলের ওপর দিয়ে এই পথেই হিমালয় অতিক্রম করে ভারতে আসতে চেয়েছিল। যুগ যুগ ধরেই এই পথেই মানুষের যাতায়াত চলেছে। কেউ এসেছে শত্রু হিসেবে ভারতের ধনরত্নের লোভে, আবার কখনও কোন জ্ঞানপিপাসু এসেছেন ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু আহরণ করতে। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাং কাশ্মীরে এসেছিলেন হয়তো এই পথেই। হয়তো এই সেই উত্তরাপথ যে পথে রাজা ললিতাদিত্য উত্তর দিকে গিয়েছিলেন, আর ফিরে এলেন না। কাশ্মীর থেকে চীন, তিব্বত বা মধ্য এশিয়ার যে কোন দেশে

যেতে হলে যোজিলা গিরিপথেই যেতে হবে। খাইবার গিরিপথের মত ভারতে আসার এও একটি প্রাচীন পথ। বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করার জন্য কাশ্মীর এবং নেপাল থেকে শান্ত-রক্ষিত, পদ্মসম্ভব, শান্তিগর্ভ, বিমলমিত্র, শীলমঞ্জু, ধর্মপাল, প্রজ্ঞাপাল প্রভৃতি সতেরোজন বৌদ্ধভিক্ষু এই পথেই তিব্বতে গিয়েছেন হয়তো। বাঙালী অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান বৃদ্ধবয়সে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এমনি কোন পথে হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে গিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেননি। ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা নগরের সেথাম মঠে দেহরক্ষা করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বামী অভেদানন্দজীও তিব্বতে গিয়েছিলেন এই যোজিলার পথ দিয়েই। তিনি অবশ্য ধর্মপ্রচারের জন্য যাননি। গিয়েছিলেন নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে। শুনেছিলাম হিমিশ গুম্ফায় নাকি এমন একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে যাতে জানা যায় যীশুখ্রীষ্ট দুবার এসেছিলেন ভারতে। একবার এসেছিলেন তের বছর বয়েসে সিন্ধুদেশের বণিকদের সঙ্গে। সেটাই তাঁর অজ্ঞাত জীবন। আর একবার ক্রুশবিদ্ধ হবার পর। স্বামীজীর ভ্রমণকাহিনীতে হিমিশ গুম্ফার সেই বইটির অনুবাদও দিয়েছেন। সে যাই যোক আমি ভাবছিলাম যোজিলার সেই অপূর্ব শোভা দেখা হ'ল না। আর যোজিলা পার হয়ে ওপারে একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসা হ'ল না কল্পনার রাজ্য চিরতুষারের দেশ তিব্বত। অমরনাথ গুহাই বা কতদূর এখান থেকে! এত কাছে এসে তাও দেখতে পেলাম না। ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম।

নীচে নেমে আবার খানিকক্ষণ দাঁড়ালাম। মনে পড়ল উৎপল বলেছিল আবার আসবে আমাদের কাছে। কিন্তু মিলিটারি ছাউনির দিকে লক্ষ্য করতে আর উৎপলকে চোখে পড়ল না। ওরা হয়তো ডিউটি করছে। সুযোগ পেল না এখানে আসার। আবার মনে হ'ল হয়তো ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছিল আমাদের দেখে। তার জন্য আবার শাস্তি পেতে হয়নি তো? ছাউনির পাশ দিয়ে বাসে ফেরার সময়ও দেখছিলাম তাকিয়ে। কিন্তু আর চোখে পড়ল না ওদের। বেচারী উৎপল! কলকাতা অনেক দূর এখান থেকে। আর যে চাকরি! কবে যে যেতে পারবে ওখানে তার ঠিক নেই। কিন্তু কলকাতার মানুষ দেখে বুঝি ওর মনে হয়েছিল কোন আত্মীয়ের দেখা পেয়েছে। এমনি ভাবেই দিদি বলে ডাকছিল আমাকে। ছেলেমানুষ! মা, বাবা, ভাই-বোনদের জন্য হয়তো মন কাঁদে ওর, তাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—দিদি, বেহালায় যান কখনও? খুব দূর কি

আপনার ওখান থেকে ?

দূর হলেও আমি ওর চোখের মিনতি-ভরা চাউনি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম কি বলতে চায় ও। তাই বলেছিলাম,—ঠিকানা দিও, আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা করব। আমার কথায় খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ওর মুখ। বলেছিল —মুখে বললে মনে থাকবে না। লিখে এনে দেব ঠিকানা। হয়তো চিঠিও লিখত মাকে। কিন্তু কই আর এলো !

সোনামার্গ ছেড়ে যেতে তাই একটু ব্যথা পেলাম মনে। আমার ঠিকানাও রেখে গেলাম না ওর কাছে যে আর কখনও যোগাযোগ হবে ওর সঙ্গে।

॥ ৪৫ ॥

কাশ্মীরের দর্শনীয় জায়গাগুলো যা শ্রীনগর থেকে দেখা যায় মোটামুটি আমাদের দেখা হয়ে গেছে। তবু আরো দুদিন আমরা বোটে থেকে গেলাম। এতদিন তো রোজই ঘোরাঘুরি করেছি। দুদিন বোটে থেকে শুধু বিশ্রামসুখ উপভোগ করা যাবে। এই ছিল আমাদের ইচ্ছে। আরও একটা কারণ হ'ল বোটওয়ালাকে আগাম নয় দিনের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে সাত দিনের কনট্রাক্ট হয়েছিল। মনে হয় অনিলদা পরে আরো দু দিন বাড়িয়েছেন। কিন্তু এখন আর বোটে ভালো লাগছে না। আগে সারাদিন বাইরে কাটত। ফিরে এলে বোটে একটু আরাম আর আয়েস হ'ত। কিন্তু এখন সর্বক্ষণ বোটে থাকার দরুন অনেক কিছুই চোখে পড়ছে যা ভাবী নোংরা বলে মনে হচ্ছে। প্রথমেই খারাপ লাগে এই জলের ব্যবস্থা। খাবার জল শিকারা করে নিয়ে আসে বলছে, কিন্তু মুখ ধোয়া কাপড় কাচা স্নান করা সবই তো লেকের জলে। বাথরুমের নোংরা জলগুলো নিশ্চয়ই লেকের জলে মিশছে। আবার সেই জলেই রান্না করছে দেখছি। ডাল লেকের জলে এখানে স্রোত নেই। এই বদ্ধ জল সব কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে সকলেরই খারাপ লাগছে। অনিলদাই প্রথমে বললেন সেকথা। বললেন—এইজন্যই তাঁর পেটের অসুখ।

আমি বাথরুমে সেদিন যে মকবুলকে নোংরা জল দু-হাতে পরিষ্কার করতে দেখে-ছিলাম ফুলুদিকে বলেছিলাম সেকথা। মকবুল অবশ্য আমাকে বলেছিল আমাদের চেয়ে ওরা অনেক বেশী পরিষ্কার। সকালে স্নান না করে কিছু খায় না ওরা।

আর বাঙালী বাবুরা তো ঘুম ভেঙেই বিছানায় বসে চা খায়। আমি অবশ্য ওর কথা শুনে হেসেছিলাম, রাগ না করে। কারণ স্নান করে কিনা জানি না তবে বোটে এসে থেকেই ওকে এই এক পোশাকেই দেখছি। অনিলদা ফ্লুদির কাছে সেই গল্প শুনে আরো বেশী খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। বললেন, এর পর কেউ কাশ্মীরে এলে আর কাউকে বোটে থাকতে বলবেন না। দেখা গেল কম-বেশী সকলেই এখন খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে। অল্পবিস্তর সকলেরই নাকি শরীর খারাপ এই জন্যই।' আমি মনে মনে হাসছিলাম, প্রথম দিন বোটে আসার কথা মনে করে। সেদিন অনিলদাই সব চেয়ে বেশী মুখর হয়েছিলেন বোটের সুখ্যাতিতে।

বিকেলে বোটের ছাদে বসে আমরা গল্প করছিলাম। দূরে হরিপর্বতের মাথার ওপর দুর্গ দেখা যাচ্ছে। ওখানে যাওয়া হয়নি বলে প্রমীলা আফসোস করছিল। তবে পারমিশান না করালে ওখানে যাওয়া যায় না। সামনের শংকরাচার্য পাহাড়েও তো অমোদের যাওয়া হয়নি। দূরের জিনিস দেখা হ'ল, কিন্তু কাছেরগুলোই এখনও দেখা হয়নি। আজ সারাদিন কোথাও বেরোইনি আমরা। অসিত ঠাকুরপো বলল—বসে না থেকে চল ঘুরে আসা যাক। কাছেই নেহরু পার্ক, চলো সেখান থেকেই ঘুরে আসি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বলে আর কেউ যেতে চাইল না। অসিত ঠাকুরপো আর আমি একটা শিকারা নিয়ে গেলাম ওখানে। চারিদিকে জল, মাঝখানে ছোট দ্বীপের মত পার্ক। অজস্র ফুল ফুটেছে বাগানে। পার্কে লোক বেশী নেই তবে কিছু উৎসাহী ভ্রমণবিলাসী তখনও সার্ফ রাইডিং খেলছে। শিকারার চেয়ে অনেক ছোট আর সরু মোটরবোটে একা বা দুজনে দাঁড়িয়ে আছে আর অসম্ভব স্পীডে ছুটে চলেছে বোট। দু'তিনটে বোট যেন একসঙ্গে রেস খেলছে। একবার অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, আবার ঘুরে আসছে এদিকে। পার্কের ইলেকট্রিক আলো জলের উপর পড়ছে, তাইতেই মনে হতে লাগল ফোয়ারার মত উৎক্ষিপ্ত জল যেন ওদের মাথার ওপর আলোর ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে পড়ছে, ফোয়ারার জলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে ওদের। ভারী সুন্দর লাগছিল, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। অমনি একজন বোটের মাঝি এসে ধরল ওদের স্পীড-বোট ভাড়া নেবার জন্য। আমাদের মত আরো দু'চারজন যাঁরা আগে থেকেই এ খেলা দেখছিলেন তাঁদের মুখে শুনলাম টাল সামলাতে না পেরে দু'একজন জলে পড়েছে এর আগে। পার্কের ধারেও হাউস-বোট আছে। এঁরা ঐ বোটেই থাকেন। এঁরাও বাঙালী।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা বললেন,—যারা এ খেলা খেলছে তারা সবাই ইউরোপীয়। দূর থেকে দেখতে অবশ্য ভালই লাগে, তবে এ মারাত্মক খেলা ওদেরই পোষায়।

আমরা বোটে ফিরে আসার পর, **surf riding**-এর গল্প শুনে প্রমীলার আবার মন খারাপ। দেখতে পেলো না বলে!

॥ ৪৬ ॥

আমাদের ফেরার বাসের টিকিট পাওয়া গেছে। মাঝে কদিন বাস বন্ধ ছিল। বানিহালের ওদিকে কোথায় নাকি ধস্ নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সকাল সাতটায় বাস ছাড়বে। আমরা তাই ঠিক করলাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আগের দিনই আমরা বোট ছেড়ে দিয়ে ওদিকে গিয়ে থাকব। না হলে অত ভোরে এত মালপত্র নিয়ে সময়মত বাস ধরা কঠিন হবে। আমাদের সঙ্গে তো প্রচুর মালপত্র ছিলই। এতদিনে আরো কিছু বেড়েছে। এত বড় বোটে ঠিক বাড়ীর মতই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গেল এ কদিন। বোটওয়ালাকেও বলে রাখা হয়েছে। অনিলদা ভাড়া যদিও আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও যদি কিছু হিসাব-পত্র থাকে নিয়ে আসতে বলেছেন।

সকালবেলা দেখি বোটওয়ালা মস্ত এক বাঁধানো খাতা হাতে নিয়ে এসেছে। আমি ভাবলাম এটা বুঝি ওর হিসেবের খাতা। তারপর দেখি—ওমা! এতে যত্ন করে সকলের প্রশংসাপত্র রেখে দিয়েছে। আমাদের পড়তে দিল কত বড় বড লোক এই বোটে থেকে গেছেন আর প্রশংসা করে গেছেন কত! দিল্লীতে আমরা যে M. P-র ওখানে ছিলাম, তাঁরও প্রশংসাপত্র দেখালো। বাংলাদেশের অনেক রাজনীতিককেই জানে। অন্ততঃ নাম জানে। অনিলদাকে বললাম, আপনিও বেশ ভালো করে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন।

বোট ছেড়ে যাবার আগে বোটওয়ালা আমাদের ঠিক প্রথম দিনের মতই যত্ন করে খাওয়ালো। বার বার বলতে লাগল, কোন কিছু ত্রুটি হয়ে থাকলে আমরা যেন মনে কিছু না করি। আবার এলে যেন ওর কথা মনে রেখে এখানেই উঠি। সত্যিই ওর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার মনে রাখবার মতই। তবে আর কি কখনও আসা হবে! আমি ওদের বোটে গিয়ে যাবার আগে আর একবার গুল-বদনের সঙ্গে দেখা করে এলাম। তারও ঐ একই অনুরোধ। এরা যেন বিদেশী-

দের আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধতে চায়।

এবারও টুরিস্ট অফিসে খোঁজ করে জানা গেল ঘর খালি নেই। এখান থেকেই বাস ছাড়বে। তাই আমরা একদিনের জন্য আর অন্য কোথাও জায়গা না খুঁজে সামনের তাঁবুতে থাকাই ঠিক করলাম। খাওয়া-দাওয়ারও অসুবিধে নেই। টুরিস্ট অফিসের ক্যানটিন আছে।

মালপত্র তাঁবুতে ফেলে রেখে আমরা এবার কিছু কেনাকাটার জন্য বের হলাম। একজন দরোয়ান গোছের লোক আছে অবশ্য দেখাশোনার জন্য। কিন্তু এতগুলো তাঁবুর জিনিস পাহারা দেওয়া একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কাশ্মীরে একটা জিনিস দেখলাম—এখানকার লোক সৎ। প্রায় মাসখানেক আমরা কাশ্মীরে থাকলাম, সব সময়ই বোটে বা তাঁবুতে জিনিস ফেলে রেখে আমরা বাইরে গেছি। কোনদিন কিছু হারায়নি। বরং একদিন টাঙ্গাতে কিছু জিনিস ছেড়ে দিয়ে আমরা বোটে চলে গিয়েছিলাম। টাঙ্গাওয়ালা আবার সে জিনিস আমাদের বোটে পৌঁছে দিয়েছিল।

টুরিস্ট অফিসের ওপাশের বড় রাস্তার ধারেই শ্রীনগরের বড় বড় দোকানপাট। শ্রীনগরের নিউ মার্কেট বলা যায়। আমরা ওখানে কিছু কেনাকাটা করলাম। কিন্তু সব চেয়ে বড় সওদাই হয়নি এখনও। বুটলুর জন্য একটা ফারের কোট। এখানে দেখলাম কিন্তু পছন্দ হ'ল না। ধবধবে সাদা ফার খুঁজছিলাম আমি। মোটর-রিকশায় ঘুরতে ঘুরতে ঝিলমের ধারে একটা দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। দোকানে ঢুকেই কিন্তু আঁতকে উঠতে হ'ল বিরাট এক ভালুকের চেহারা দেখে। কুচকুচে কালো ভালুক। যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে থাবা তুলে বসে আছে। শুনলাম কোন এক মিলিটারি অফিসার প্রায় বছর দুই আগে এই ভালুকটি মেরে এখানে স্টাফ্ করতে দিয়ে গিয়েছিল। এখনও নিতে আসেনি তাই রেখে দিয়েছে এভাবে। পাশে খেলুভাই দাঁড়ালো গিয়ে। বসা ভালুকই ওর মাথার চেয়ে উঁচু। খেলুভাই এমনি জানতে চাইল বেশী দাম পেলে ওটা বিক্রী করবে কিনা? দোকানী হেসে জানালো যার জিনিস সে যতদিন না আসে ঐভাবেই রেখে দেবে ওটা। বিক্রী করার মালিক তো সে নয়। শুনে ভালো লাগল। এতদিন ধরে ফেলে রেখেছে, আর কোন খোঁজখবর করেনি ভদ্রলোক! ইচ্ছে করলে হয়তো বেচে দিতেও পারত। কিন্তু পয়সাটাই বড় জিনিস নয় ওর কাছে।

পহলগামেও দেখেছি এখানেও দেখছি, একরকমের জানোয়ারের ফার সুদ্ধ চামড়া দিয়ে এরা কোট তৈরী করে। ছোট ছোট খরগোস বা বেজীর মত এক-

রকমের জন্তুর ফারের ভ্যানিটি ব্যাগ বা জুতো তৈরী করে। কাশ্মীরে এলে প্রায় সকলেই এটা কেনে। কিন্তু এত বড় ভালুকও যে কাছেপিঠেই থাকে শুনলাম এখানে এসে।

এই দোকানেই আমার পছন্দমত সাদা ফারের কোট কিনলাম বুটলুর জন্য। এদিকটায় আগে আসিনি। ঝিলমের জলে এধারেও অনেক হাউসবোট আছে। তবে আমার মনে হ'ল ডাল লেকের যেখানটায় আমরা ছিলাম সেখানটাই বেশী ভালো। এদিককার দৃশ্য অত সুন্দর নয়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঝিলমের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। কবিগুরু ঝিলমের যে রূপ দেখেছিলেন আর আমাদের মনে এঁকে দিয়ে গেছেন—সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা—সে রূপ দেখতে পেলাম না। বর্ষায় দু'কূলপ্লাবী ঘোলাজলে মালার মত ছোট ছোট আবর্ত সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে। এখন যেন ঝিলমের গেরুয়া-বসনা ভৈরবী মূর্তি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

সামনেই ঝিলমের সেতু। এটি ইংরেজ আমলের কি মোগল আমলের জানি না। তবে তার আগেও ঝিলমের ওপর সেতু নির্মিত হয়েছে। রাজা অবন্তী বর্মার রাজত্বকালে কাশ্মীরে একবার মহাপদ্ম হ্রদের (ডাল লেকের ?) জলপ্লাবনের জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সময় বিতস্তার (ঝিলম) জলে নানাস্থানে বাঁধ নির্মাণ করে সেই জলপ্লাবন আর দুর্ভিক্ষ রোধ করা হয়। স্থয্যা নামে এক চাণ্ডালী একটি অনাথ শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিল। স্থয্য নামে সেই ছেলেই বড় হয়ে পালয়িত্রী মায়ের নামে 'স্থয্যা সেতু' নির্মাণ করেছিল। বিতস্তার দুই তীর পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিল নাকি। রাজতরঙ্গিনী পড়লে জানা যায় সেকথা। মনে হ'ল কারিগরী বিদ্যায় সেযুগের মানুষও কম দক্ষ ছিল না।

আজ আমাদের শ্রীনগর বেড়াবার দিন। Exibition Ground একটু দূরে হলেও সেখানেও একবার ঘুরে এলাম। ওখানে অবশ্য বিশেষ কিছু কেনার বা দেখার ছিল না।

বেড়ানোই উদ্দেশ্য। এখানে যেসব শৌখীন জিনিসপত্র দেখলাম তা তো সর্বত্রই পাওয়া যায়। শুধু কাঠের কয়েকটা খেলনা বোট কিনলাম আমি। এগুলো দেখে ছেলেমেয়েরা আনন্দ পাবে। আর আমাদের মুখে গল্প শুনে কল্পনা করবে এমনি বোটে ছিলাম আমরা। স্টেট এম্পোরিয়াম্-এও একবার ঘুরে এলাম। সেখানেও ফারের নানারকম জিনিস। কাশ্মীরের কুটীরশিল্পের সব কিছুই ওখানে দেখতে পেলাম। আমরা শুধু ভালো জাফরান কিনলাম ওখান থেকে। ঝিলমের

ধারে কাশ্মীরের খাদির দোকানেও একবার ঘুরে এসেছি আমরা।

ঘুরতে ঘুরতে চকবাজার এসেছি। কাশ্মীর থেকে যাবার আগে কিছু ফল নিয়ে যাব ভাবলাম। ফলের দোকানের সামনে আমাদের রেখে ছেলেরা কোথায় গেল জানি না। ফলের বাজার দেখে মনে হ'ল এ যেন কলকাতার বড়বাজার। দোকানের সামনেই কাঠের প্যাকিং-বাক্স রয়েছে। আমাদের মত যারা দেশে ফেরার আগে সস্তা আপেল আখরোট কিনতে চায় তাদের জন্যই মনে হ'ল। আমি আর নীলিমা প্যাকিং-বাক্সের ওপর বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম ওরা ফিরছে না দেখে। তারপর ভাবলাম আমরা নিজেরাই ফল কিনি না কেন? যেমনি ভাবা অমনি উঠে গিয়ে দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম—দোকানী যে দর বলল ভাবলাম তার চেয়ে কিছু কম বলা উচিত। হয়তো একে বিদেশী তাতে মেয়ে-মানুষ দেখে কিছু বেশী করেই বলছে। যদিও ঠিক কত দাম হওয়া উচিত তাও জানি না তবু বলতে গিয়ে দেখি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। আক্রার হিন্দী শব্দ কিছুতেই মনে পড়ছে না। দোকানী অত্যন্ত ব্যস্ত নানারকমের খরিদ্দার নিয়ে। অনেকটা উঁচুতে দোকানের কাঠের মেঝেয় নানারকম ফল সাজানো। তারই মাঝে বসে ওজন করা, জিনিস বেচা এবং কথা বলে খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করা—এতগুলো কাজ একা করছে। কিন্তু তার মাঝেই বোধ হয় আমার হিন্দী শুনে একটু কৌতুকের হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁঠের ফাঁকে। কোন কথা না বলে এক আঁজলা ছাড়ানো আখরোট আর কিসমিস আমার হাতে ধরিয়ে দিল। অর্থাৎ খেয়ে দেখুন তারপর দামের কথা তুলবেন। ওর জিনিস যে বাজারের সেরা, এক নম্বর মাল মুখে না বলেও বুঝিয়ে দিল সেটা। আমি তো অপ্রস্তুত। এর পর আর দরদস্তুর করার বৃথা চেষ্টা না করে কতটা কিসমিস, আখরোটা, আপেল ইত্যাদি নেব জানিয়ে দিলাম। দেখলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেওয়া ওজন করে আর ভালো ভালো আপেল বেছে নিয়ে নীচে নেমে আমাদের জন্য বড় একটা প্যাকিং-বাক্সে ভর্তি করল। দোকানের চাকরকে নির্দেশ দিয়ে প্যাক করিয়ে দিল ভালো করে। দাম মিটিয়ে দিয়ে আমাদের আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না। অসিত ঠাকুরপোরা হৈ হৈ করতে করতে এসে গেল।

ব্যাপার কি জানার জন্য আর প্রশ্ন করতে হ'ল না। হাতের মিষ্টির ভাঁড় দেখিয়ে অসিত ঠাকুরপোই বলল—ভালো রসগোল্লা পাওয়া গেছে। এটা নাকি ওরই আবিষ্কার। বেশীর ভাগ দোকানে খোয়া আর বেসন দিয়ে তৈরী মিষ্টি দেখতে দেখতে ওরই প্রথম চোখ পড়েছে রসগোল্লার দিকে। বলল—আগে জানা

থাকলে নাকি রোজ একবার করে আসত এখানে। সারাদিন কত রকমের জিনিস কেনাকাটা হ'ল কখনও ওর মুখে এমন হাসি দেখিনি। যেন রাজ্য জয় করে এসেছে এমনি মুখের ভাব। আমিও অবশ্য হাসলাম ওর কথার ধরনে।

আমাদের ফল কেনা হয়ে গেছে দেখে ওরা খুশীই হ'ল। অন্যদিন হলে হয়তো বলত—আমরা মেয়েমানুষ—দরদস্তুর করতে জানি না। সবাই ঠকিয়ে নেয় আমাদের ইত্যাদি। কিন্তু আজ এতই খুশী যে সেকথা আর শুনলাম না ওদের মুখে।

ফেরার পথে কাশ্মীরের বাজারে আর একটা জিনিস কিনলাম আমরা বাচ্চাদের জন্য। সে হচ্ছে জরির টুপি। ফুটপাথেই বিক্রী হচ্ছে। খুব সস্তা।

সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেশ একটু রাত করেই আমরা তাঁবুতে ফিরলাম। ফুলুদি বলল, ওর শরীর খারাপ করছে। দেখি বেশ জ্বর এসেছে। আমাদের সঙ্গেই কিছু ওষুধপত্র ছিল। তাই ওকে দেওয়া হ'ল। এত রাতে আর ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে! আর সকালেই তো রওনা হবার কথা। ওর জন্য অবশ্য সবাই একটু চিন্তিত হলাম। কারণ দীর্ঘ পথ। জ্বর বেশী থাকলে রওনা হওয়া উচিত হবে না। আবার মাঝে কদিন তো রাস্তাই বন্ধ ছিল ধ্বস নামার জন্য। তেমনি কিছু আবার হলেই মুশকিল।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে প্রথমেই ফুলুদির খবর নিলাম। দেখি জ্বর কমেছে। বাড়ি ফেরার আনন্দেই বোধ হয় চাঙ্গা হয়ে উঠে বসেছে বিছানায়। ফুলুদিই সব আগে তৈরী। বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে এসেছে, এখন হয়তো তাদের জন্য মন কেমন করছে।

প্রথম দিন টুরিস্ট অফিসে বাস থেকে নেমেছিলাম। আজ যাবার দিনও ওখান থেকেই বাসে উঠলাম। আবার বাস। দেখি ড্রাইভারজী আগেই উঠে বসেছেন তাঁর আসনে। সর্দারজীর পরনে সাদা চোস্ত এবং শেরোয়ানী। মাথায় সাদা পাগড়ী। টুকটুকে রং। শ্বেত শ্মশ্রু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। বয়েস হয়েছে। কিন্তু বলিষ্ঠ হাতে শক্ত করে ষ্টীয়ারিং ধরে আছেন। কোন কথা না বলে আমাদের ওঠার পরই গাড়ী ছেড়ে দিলেন। মনে হ'ল চিন্তার কিছু নেই। পথ দুর্গম হলেও আমাদের কাণ্ডারী দড় এবং হুঁশিয়ার। নিশ্চিন্ত মনে সীটে গিয়ে বসলাম।

আসার দিন যে পথে এসেছি এ সেই পথ। পহলগাম যেতেও এই পথ দিয়েই খানিক দূর যেতে হয়। তারপর রাস্তা ঘুরে যায় পহলগামের দিকে। পপ্‌লার এ্যাভেন্যুর মধ্যে দিয়ে সুন্দর মসৃণ পথ। মাঝে মাঝে গাড়ী থামাচ্ছেন সর্দারজী।

ওঁর জানা আছে পথে কোন্ গ্রামের পাশে গাড়ী দাঁড় করালে গ্রামের গরীব শিল্পীরা তাদের জিনিস বেচে দুটো পয়সা পাবে। আর বাসের যাত্রীরাও বাড়ী ফেরার মুখে এদের কাছে দরদাম করে শেষবারের মত কিছু সস্তা সওদা কিনবে। নাম্‌দাই বেশী আনে এরা। কয়েকটা কুশান এবং নাম্‌দা আমিও নিলাম এদের কাছে। নাম্‌দা-গুলো অনেকটা গালিচার মতই দেখতে। তবে পুরনো গরম কাপড়ের ওপর নানা রং মিলিয়ে সুন্দর সুন্দর নক্‌শা করেছে। ফুল আর চেনার পাতা এদের প্রায় প্রত্যেক শিল্পকর্মেই দেখা যায়। শাল শাড়ী থেকে কাঠের এবং সোনা-রূপোর ওপর কাজ সব জিনিসেই থাকে। মনে হ'ল কাশ্মীরীরা প্রকৃতির কাছ থেকেই নিয়েছে তাদের নক্‌শা। প্রকৃতিই ওদের শিল্পী করে গড়েছে। রং মিলিয়ে এমন সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করে এরা যে চোখ ফেরানো যায় না।

শেষবারের মত কাশ্মীরকে ভালো করে দেখে নিচ্ছি। প্রকৃতি কত সুন্দর করেই যে সুদূর-বিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকাকে সাজিয়েছে সেদিক থেকেও চোখ ফেরানো যায় না। রং-এর বাহার সেখানেও। পাহাড়ী-পথে যত উপরে উঠছি ততই সুন্দর লাগছে কাশ্মীরকে। যত দূর দৃষ্টি যায় সবুজ ধানের ক্ষেত। কিছু দিনের মধ্যেই সোনালী রং হবে ধান পেকে গিয়ে। মনে হ'ল এত ধান হয় তবু এরা এত গরীব! তবু দুবেলা এরা খেতে পায় না পেট ভরে! মনে হ'ল প্রকৃতি যেমন দু'হাত ভরে দিচ্ছেন আবার তাঁরই রুদ্র-রোষে কখনও ধ্বংস হয়ে যায় সব। কখনও প্লাবন আবার কখনও তুষারপাতে পাকা ফসল ঘরে ওঠে না। বহুকাল আগে এমনি এক শরৎকাল। ভাদ্র মাসে পাকা ধানের ওপর এমন রাশি রাশি তুষারপাত হ'ল যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল কাশ্মীরে। অতিরিক্ত তুষারপাতে বাইরে পালাবার পথও বন্ধ হয়ে গেল। বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। রাজা [illegible]ন তখন কাশ্মীরের সিংহাসনে। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি এবং রাণী বাকপুষ্টা দুজনেই খুব ধর্মভীরু। প্রজাদের পুত্রের মতই স্নেহ করতেন। এমন অবস্থার জন্য রাজা নিজেকেই অপরাধী মনে করলেন। ভাবলেন তিনি নিশ্চয়ই এমন কোন অন্যায় কাজ করেছেন যার পাপে প্রজারা এই বিপদে পড়েছে। তিনি প্রাণত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। রাণী বাকপুষ্টা অবশ্য তাঁকে নিরস্ত করেন। তিনিই প্রজাদের রক্ষা করার ভার নিলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন প্রজাদের প্রাণরক্ষার জন্য। তারপর নাকি প্রত্যেক প্রজার বাড়ীতে প্রচুর মরা কপোত পড়েছিল। আর এইভাবেই তারা সেবার অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

পরে রাজার স্বাভাবিক মৃত্যুর পর রাণী তাঁর সহমৃতা হয়েছিলেন। সেই মহীয়সী রাজ্ঞীর নাম অক্ষয় হয়ে আছে কাশ্মীরের ইতিহাসে। সহমরণের স্থান 'বাকপুষ্টাটবী' তীর্থস্থান কাশ্মীরের। কবি কহ্লন যে রাণীর কীর্তিগাথা লিখে গেছেন কোথায় সে তীর্থস্থান জানি না। দেখাও হ'ল না। কিন্তু এযুগেও তো প্রকৃতির রোষের কোন প্রতিকার নেই। সেদিন গুলমার্গ যেতে টাংমার্গের কাছে যে পাহাড়ী নদীটি দেখলাম তারই বন্যায় শুনলাম অনেক ক্ষতি হয়েছে। দুপাশের কত ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে। কত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওপর থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে এসে। কার পাপে হচ্ছে এসব? এযুগের মানুষ কে কাকে দায়ী করবে এর জন্য? ভাবলাম প্রাকৃতিক বিপর্যয় আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনিই আছে। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক না কেন প্রকৃতির খেয়াল-খুশীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের এখনও হয়নি।

প্রকৃতির খেয়ালের কথা ভাবছিলাম, আমাদের সর্দারজী তাঁর নিজের খেয়ালেই দেখি কিছুটা ঘুরপথে এসে 'ভেরীনাগে' বাস থামালেন। এর জন্য মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম।

না দেখলে দুঃখই হ'ত। কাশ্মীরে আসার পথেই অনেকে ভেরীনাগ দেখে যায়। আবার আচ্ছাবল থেকেও আসা যায়। ফিরে যাবার সময় সর্দারজী না দেখালে আর দেখাই হ'ত না আমাদের। ভেরীনাগ একটা স্প্রীং। আটকোণ করে চারধার বাঁধানো। আঠারো ফিট করে তিন থাক আছে জলের ভেতরে। অর্থাৎ চুয়ান্ন ফিট গভীর। ঠিক আকাশের মতই ঘন নীল রং জলের। সম্রাট জাহাঙ্গীরের কীর্তি এটি। চারধার খিলানওলা মোটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে একখানা ঘর। সম্রাট গ্রীষ্মের সময় এখানে বিশ্রাম করতেন। দেয়ালের উর্দু বয়েৎগুলো পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিল গাইডটি। এই এক জায়গাতেই গাইড দেখলাম। বয়েতের অর্থ নাকি—স্বর্গ যদি কোথাও থাকে সে এইখানে—সে এইখানে। মনে হ'ল সত্যি কথা। গাইডের মুখে শুনলাম এটাই নাকি ঝিলমের উৎস। একে নীলনাগও বলে। জলের ভেতরে খুব বড় একটা সাপ আছে তাই এই নাম। আমার অবশ্য মনে হ'ল নীল রংয়ের জলের জন্যই নীলনাগ নাম। এই স্প্রীংএর জল সামনের বাঁধানো নালা দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভেতরের জল কিন্তু স্থির। বাঁধানো নালার দুপাশে অজস্র ফুল ফুটে আছে। কিছুদূরে আরো একটা ঝরণার সঙ্গে মিশে একটা ছোট নদীর মতই

বয়ে যেতে দেখলাম। চারিদিক ঝকঝকে করে রেখেছে। গাছের পাতা পড়লেও খুঁটে তুলে ফেলছে। একটি ছেলেকে দেখলাম পাতা কুড়োতে। বেশ বড় রেস্ট হাউস এখানে। নূতন করেছে। আধুনিক সবরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আছে। হসপিট্যালও আছে এখানে। সবই ভালো লাগল। আর আশ্চর্য হলাম একটা জিনিস দেখে। যেমন একখানা ঘর সম্রাটের বিশ্রামের বলে দেখালো, প্রাচীরের গায়ে আর একটা খিলানের ছোট কুঠুরিতে শিবলিঙ্গ আছে দেখলাম। গণেশ এবং আরো কতকগুলো সিন্দুর মাখানো মূর্তি রয়েছে। পুরোহিতও আছে। আমাদের চরণামৃত দিল। কে এই শিব প্রতিষ্ঠা করেছে জানা গেল না। Notice Board-এ এ বিষয়ে কিছু লেখা নেই দেখলাম।

ভেরীনাগ দেখে আবার অনেক ওপরে উঠতে হ'ল আমাদের। 'নেহরু টানেল' পার হলাম। যেটা দিয়ে এসেছিলাম সেটা দিয়েই পার হলাম। অন্যটা মেরামত হচ্ছে। এটাতেও জল জমেছে শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি। ভেতরটা অন্ধকার। যারা কাজ করছে তারা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার তবু খুব ধীরে ধীরে হর্ন দিয়েই যাচ্ছে। এবার বেশ সময় লাগল টানেল পার হতে।

॥ ৪৭ ॥

হু-হু করে বাস ছুটে চলেছে। মাঝে 'বাটোটে' গাড়ী দাঁড়িয়েছিল দুপুরবেলা। কুঁদে আর দাঁড়ালো না। কুঁদের পর থেকেই নীচে নামতে শুরু করেছি। কাশ্মীর উপত্যকা অনেক পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছি। কাশ্মীরে আসার সময় মনে মনে অনেক রঙীন কল্পনা আর উদগ্র কৌতূহল নিয়ে এসেছিলাম। মনের সবগুলো আলো জ্বালিয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলাম কোনো ফাঁকে কোনো কিছু যেন হারিয়ে না যায় আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। দেখতে এসেছিলাম কবি কহ্লনের কাশ্মীর— ললিতাদিত্য, জয়াপীড়, হর্ষ প্রভৃতি রাজার স্মৃতিবিজড়িত কাশ্মীর। মোগল যুগের বিলাসচিহ্ন আজও ছড়িয়ে আছে যেখানে—যে দেশের মেয়ে রূপকথার রূপসী রাজকন্যাদের মতই সুন্দরী—দেখতে এসেছিলাম সেই কাশ্মীর। কৌতূহল মিটেছে। আজ দু-চোখ ভরে শুধু হিমালয়কেই দেখছি। সকালবেলা যাত্রা শুরু হয়েছে— এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো প্রায়। হিমালয়ের বুকের ভেতর দিয়ে একটানা কেবলই চলেছি। এ পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়, সমুদ্রের ঢেউএর মতই

একটার পর আর একটা। পথের আর শেষ নেই। দেখারও শেষ নেই। মুগ্ধ হয়ে দেখছি শুধু। তবু ভাবছি কতটুকুই আর দেখা হ'ল? ভারতবর্ষের শিয়রে দাঁড়িয়ে সমগ্র উত্তরদিক জুড়ে শত-সহস্র মাইল দীর্ঘ যে হিমালয়—তার কতটুকুই আর দেখলাম? শুধু কাশ্মীর দেখে তার কতটুকুই বা দেখা হ'ল? কাশ্মীরের মত এমনি কত উপত্যকা, কত বন, কত উপবন, কত গিরিনদী, কত নির্ঝরিণীই তো ছড়িয়ে আছে সমগ্র হিমালয়ের বুকে। হিমালয়ের বিরাট মহিমা আর অসীম সৌন্দর্য যে মানুষের কল্পনাকেও হার মানায়। এ সৌন্দর্যের এমন দুর্বার আকর্ষণ যে, পথের কষ্ট ভুলে মানুষ বার বার আসে হিমালয়ে। শুধু দেশ দেখা নয়—শুধু তীর্থদর্শন নয়—আমিও হয়তো আবার আসবো এই টানেই।

তবু তুষার-তীর্থ অমরনাথ দর্শন না করে ফিরে যাচ্ছি বলে একটু দুঃখ থাকল মনে। কিন্তু সমগ্র হিমালয় জুড়ে কত তীর্থ কত পৌরাণিক কাহিনীই তো ছড়িয়ে আছে, তাও বা কতটুকু দেখেছি? তাই কি দেখে শেষ করা যায়? মনে পড়ল অমরনাথ গুহার হরপার্বতীর কাহিনী শুনেছিলাম। পার্বতী কৈলাস থেকে অমর-গুহায় এসেছেন শিবের সঙ্গে। নির্জনে অমর কথা শোনার জন্য। পর্বত-দুহিতা বলে উমারই আর এক নাম পার্বতী। সতীর দেহত্যাগের পর এই হিমালয়ের কোলেই তো জন্ম নিলেন তিনি। শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য এখানেই তপস্যা করে-ছিলেন। কিন্তু সে কাহিনী তো শুনলাম না কোথাও? আমরা যে দুর্গাপূজা করি চণ্ডীর বর্ণনা মত, তিনি অসুরদলনী হলেও আমরা তো কল্পনা করি কৈলাস থেকে বৎসরান্তে বাপের বাড়ী আসছেন মা-দুর্গা। শিবও আসেন পিছে পিছে। হর-পার্বতী আর শিবদুর্গা তো আলাদা নয় আমাদের কাছে। আসন্ন শারদোৎসবের কথা মনে পড়ল। বাংলার ঘরে ঘরে আজ আগমনীর সুর বেজে উঠেছে। বাঙালী দেবী দুর্গাকে আরো আপন ভেবে কন্যারূপে বরণ করে ঘরে তুলবেন। মনে হ'ল দেবীকে কন্যারূপে কল্পনা করে আর কোথাও কি পূজার এমন উৎসব হয়? কী জানি!

অনেক নীচে নেমে এসেছি। পথের চেহারাও বদলাচ্ছে। পাইন বন আর নেই। ফণিমনসার মত কাঁটার জঙ্গল পথের দুধারে। এ যেন বাংলার কোন পল্লী-পথের ছবি। মাথার ওপর ঘন নীল আকাশে শরতের শুভ্র মেঘের রাশি একটানা ভেসে চলেছে। কোথা থেকে আসছে আর কোথায় যাবে কে জানে! মনের মাঝে অনেকক্ষণ ধরেই গুনগুন করছে একটা সুর। সুরটা বেজে চলেছে অথচ কথাটা মনে আসছে না। ধীরে ধীরে আপনিই মনে এলো গানের কলিটা—

কও দেখি উমা
আদরিণী ও-মা
শিবের ঘরে তুমি কেমন ছিলে ?

কথাগুলো স্পষ্ট হতেই মনে হ'ল কি মিষ্টি সুর আর বাউল কবির কি মধুর কল্পনা ! নবপরিণীতা কিশোরী গৌরী কৈলাস থেকে বাপের বাড়ী এসেছে—মায়ের মনে উদ্বেগ আদরিণী রাজনন্দিনীর ভিখারী স্বামীর ঘরে গিয়ে কত না-জানি কষ্ট হচ্ছে। সচকিত হলাম আমি, তবে কি গিরিরাজ হিমালয়ের যে চিরন্তন পিতৃরূপের ছবি আঁকা আছে মনে, আমি কি তাই কল্পনা করছিলাম এতক্ষণ ? মা মেনকার মনের আকুল প্রশ্নই কি এতক্ষণ গুনগুন করছিল আমার মনে ?

আকাশপটে হিমালয়ের মহান মূর্তির দিকে চেয়ে প্রণতি জানালাম মনে মনে।

॥ ৪৮ ॥

রাত সাড়ে নটায় পাঠানকোটে পৌছেই আমরা ঠিক করলাম একদিন এখানে বসে না থেকে বরং অমৃতসরটা দেখে আসা যাক। কারণ পরের দিন রাতে দিল্লীর ট্রেন। ফল্গুদির শরীর ভালো নেই বলে ও আর অনিলদা রিটায়ারিং রুমে থেকে গেল। রাত দুটোয় ট্রেন। আমরা স্টেশনের ক্যানটিনে খাওয়া-দাওয়া সেরে মালপত্র রেখে দিয়ে খালিহাতে গিয়ে ট্রেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা অমৃতসর পৌছে ওয়েটিং রুমে গিয়ে দেখি আমাদের আগেই কয়েকটি পাঞ্জাবী মেয়ে এসেছে ওখানে। ওদের হাতে বই। কেউ কেউ পড়ছে বসে আর বাকীরা স্নান সেরে নিচ্ছে। শুনলাম ওরাও এই ট্রেনেই এসেছে। হাতে বই দেখে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওরা খালসা কলেজের ছাত্রী। খালসা কলেজের নাম শুনেছিলাম। ওরা ঐ কলেজের ছাত্রী শুনে আলাপ করলাম ওদের সঙ্গে। ওদের মধ্যে দু-একজনের আত্মীয় আছে কলকাতায়। ওদের কাছেই জানলাম এখানে ওয়েটিং রুমের দাইকে পয়সা দিলেই ধোয়া তোয়ালে সাবান ইত্যাদি দেয়। রোজই ওরা এখানে স্নান সেরে কলেজে যায়। কলেজের মেয়েরা স্নান করে যাবার সময় আমাদের যাতে কোন অসুবিধে না হয় দাইকে বলে গেল সেকথা। স্নানের ঘর পরিষ্কারই ছিল। তবু ওরা আমাদের জন্য বিশেষ করে বলে গেল দাইকে। অমৃতসরে এসেছি শুধু স্বর্ণমন্দির দেখব বলে নয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে হবে। ওরাই বলে গেল

টাঙ্গা করে বেরোলে টাঙ্গাওয়ালাই সব কিছু দেখিয়ে আনবে আমাদের

আমরাও স্নান সেরে নিয়ে ওদের কথামত ছুটো টাঙ্গা করে রওনা হলাম। কাছেই জালিয়ানওয়ালাবাগ। টাঙ্গাওয়ালা প্রথমেই আমাদের সেখানে নিয়ে গেল। ছোট গলি দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বাঁদিকের বাড়ীটির ওপরতলায় ছুটি বাঙালী বৌকে দেখি মনে হ'ল এই বাড়ীটিতেই হয়তো এস. সি. মুখার্জি থাকতেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী এখানে এসে যে স্মৃতিরক্ষা কমিটি করেছিলেন উনি তার আজীবন সেক্রেটারী ছিলেন। ভেতরে ঢুকে বাঁদিকে সেই কুয়ো। যার ভেতর একশো কুড়ি জন লোক প্রাণের দায়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে শেষে প্রাণ দিয়েছে। কুয়োর ওপর ছাদ দিয়ে এখন ঘরের মত করে রেখেছে। লাল রং দিয়ে সংস্কৃত অক্ষরে লেখা—

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম এখানে। মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। এখানে দাঁড়ালে সেই সন্ধ্যার স্মৃতি প্রতিটি ভারতীয়ের মনেই আলোড়ন সৃষ্টি করবে। জেনারেল ডায়ারের সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ড—নিরপরাধ মানুষকে তাঁরই আদেশে পশুর মত হত্যা করেছে এইখানে। যাদের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়নি—অর্ধমৃত সেই সব মানুষের আকুল আর্তনাদ মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে সারারাত ধরে শুনতে হয়েছিল যে মেয়েটিকে তার কথা মনে হ'ল। কী বীভৎস কাণ্ড! এখানেও বুলেটের দাগ। বুলেট-মার্ক বলে লেখা আছে। আশেপাশের বাড়ীর দেয়ালেও বুলেটের চিহ্ন চারপাশে কাঠের ফ্রেম দিয়ে মার্ক করা আছে। মাঝখানে বেশ উঁচু লাল আগুনের শিখার মত স্মৃতিস্তম্ভ। যেন উর্ধ্বপানে উঠেছে মহাশ্মশানের অগ্নিশিখা।

চারপাশে এত ঘিঞ্জি বাড়ী! তার মাঝখানে ছোট্ট ময়দান। সরু একটা গলি ছাড়া আর প্রবেশপথ নেই। সেদিন যারা এই সব বাড়ীতে ছিলেন কল্পনা করছিলাম তাদের অবস্থা। শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ---সহস্র কণ্ঠের আর্ত চীৎকার—আকুল ক্রন্দন এক ফোঁটা জলের জন্য—তাদের মিনতিভরা শেষ প্রার্থনা শুনেও যারা কিছুই করতে পারেনি তাদের মানসিক যন্ত্রণাও কম হয়নি। স্মৃতিস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল এ শুধু মহাশ্মশানের অগ্নিশিখা নয়, এ যেন মানুষের মনের আগুনের শিখারও প্রতীক। যা কোনদিনই নিববে না। সেই ছোটবেলায় জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী শোনার পর থেকেই এখানে আসার কথা মনে হয়েছে। এতদিনে এসেছি। এ যেন তীর্থদর্শন হ'ল আমার।

ভারাক্রান্ত মনে বাইরে এসে আবার টাঙ্গায় উঠলাম। বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বাগে ঢুকেছিল। এবার গল্প করতে করতে নিয়ে চলল। আর এক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শোনালো সে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্য পাঞ্জাবের মানুষকে বার বার বুকের রক্ত দিয়ে দিতে হয়েছে। এ সেই কাহিনী। স্বাধীনতা পাবার পর বাংলা আর পাঞ্জাব দু'টুকরো হয়ে গেল। পাঞ্জাবের এক অংশ আজ পাকিস্তানে। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে আর একবার নরকের আগুন জ্বলে উঠেছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে এই বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালাও তার বাড়ীঘর জমিজায়গা ফেলে চলে এসেছিল। কিন্তু তার জন্য তার দুঃখ নেই একবিন্দু। দুঃখ শুধু মাকে নিয়ে আসতে পারেনি এপারে। দাঙ্গায় ওর মা মারা গেছে। মনটা আমার নরম হয়েই ছিল। টাঙ্গাওয়ালার চোখের জল দেখে আমিও চোখের জল মুছলাম।

এবার নিয়ে চলল দুর্গামন্দিরে। নাম দুর্গামন্দির কিন্তু ভেতরে রামসীতা, লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্ন, হনুমানজী, লক্ষীনারায়ণ, মদনমোহন। এই মন্দিরটিও বেশ সুন্দর দেখতে। লেকের ভেতরে শ্বেতপাথরের মন্দির। মাথায় সোনার পাত দিয়ে মোড়া। বেরিয়ে এসে গেলাম সেই বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরে। মস্ত বড় লেক। মাঝখানে স্বর্ণমন্দির। ওপর দিকটা সম্পূর্ণ সোনার পাতে মোড়া মনে হ'ল। লেকের ভেতরে মন্দির পর্যন্ত যাবার বেশ চওড়া রাস্তা। পেতলের রড দিয়ে আসা-যাওয়ার রাস্তা ভাগ করা আছে। কোন উপলক্ষে বেশী লোকের ভিড়েও যাতে কোন কষ্ট না হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। সকলেই মন্দিরে ঢোকার সময় দোরগোড়ায় প্রণাম করে ঢুকছে। ভেতরে গিয়ে গ্রন্থ-সাহেবকে প্রণাম করে ফুল দিচ্ছে। প্রসাদ নিচ্ছে। একজন বসে আছেন, হালুয়া দিচ্ছেন একটু করে প্রত্যেকের হাতে। সবাই আবার বেরোনোর সময় প্রণাম করে বেরিয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থসাহেব জরির কিংখাবে ঢাকা। তার ওপর ফুল দিয়ে সাজানো। একজন চামর দুলিয়ে হাওয়া করছে। চারিদিকে সবাই বসে ভজন গান করছে। কেউ কেউ বসে জপ করছে। একটু দূরে বসে কেউ পাঠ করছে। তাঁকে ঘিরে বসে শুনছেন কিছু লোক। এখানে এলেই বেশ একটা পবিত্র ভাব মনে জাগে। আমরাও প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে ঘুরে ঘুরে দেখছি। ভেতরে বাইরে সব জায়গাতেই সোনার পাতে সুন্দর কাজ। কেউ আমাদের দেখলেই বলছে ভেতরে যাও—দর্শন কর। ভারী ভালো লাগল। আমাদের

কালীঘাটে বা আর কোথাও গেলে যেমন পাণ্ডারা পয়সার জন্য ছেঁড়াছিঁড়ি করে এখানে সেসব কিছু নেই। প্রত্যেকেই নিজের মত চলেছে। দু'একটি মেয়েকে দেখলাম মন্দিরের চত্বর ঝাঁট দিচ্ছে। দেখলেই মনে হয় কাজের সঙ্গে ভক্তি মিশে আছে যেন। দেখলেই ভালো লাগে। ওপরে গেলাম—সেখানেও একজন বিরাট গ্রন্থসাহেব পাঠ করছেন। তাকিয়েও দেখলেন না কে এলো কে গেল। মন্দিরের গায়ে একটি কারিগর কাজ করছে—আপনমনে তুলি বুলোচ্ছে। আর একজন পাথরের টুকরো ঘষে রং তৈরী করছে। আমাদের দেখে কেউ কোন কথা বলল না। আপনমনে কাজ করে চলেছে। মনে হ'ল প্রত্যেকেই যা কিছু করছে—গ্রন্থসাহেবের সেবা করছে মনে করেই করে যাচ্ছে যেন।

অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরের কথা কোন্ ছোটবেলায় ভূগোল বইতে পড়েছিলাম। এত দিনে দেখা হ'ল। নীচে নেমে এসে লেকের চারিদিকটা ঘুরে দেখছিলাম। এখানেও হরিদ্বারের মত মাছকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা দেখলাম। বিরাট বিরাট মহাশোল লেকের জলে। আমরা খাবার দিতেই জল থেকে শ্বেতপাথরের বাঁধানো সিঁড়ির ওপর উঠে এসে নির্ভয়ে খেতে লাগল। দাঁড়িয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ।

গেটের কাছে এসে ওপরতলায় উঠে গেলাম টাঙ্গাওয়ালার কথামত। এখানে মস্ত বড় একটা হলে অনেক অয়েল পেন্টিং রেখেছে। শিল্পের দিক থেকে খুব উঁচু-দরের কিছু নয়, কিন্তু না দেখে গেলে ভুল করতাম সন্দেহ নেই। এই সব ছবির শিল্পীরা পাঞ্জাবের ইতিহাসকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। এখানে যে চিত্রগুলি দেখছি সেগুলি বিশেষ করে মোগল আর ইংরেজ যুগের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে রচিত। মার কোল থেকে ছোট শিশুকে ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। এসে পড়ছে ধারালো অস্ত্রের ওপর। তারপর সেই খণ্ডিত শিশুকে এনে মার কোলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। কী বীভৎস দৃশ্য! ছবি দেখলেও গা কেমন গুলিয়ে ওঠে। অনেক যুদ্ধের ছবিও আছে। আর আছে পাঞ্জাবের বীরদের ছবি।

আমরা ছাড়াও কয়েকজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ছিলেন ঘরে। তাঁরা হয়তো রোজই আসেন। আমাদের বোঝার সুবিধের জন্য তাঁরা প্রত্যেকটি ছবির কাছে দাঁড়িয়ে ঘটনাগুলো বলে যাচ্ছিলেন। ভালই লাগছিল শুনতে। ঘুরতে ঘুরতে যখন বন্দার ছবির সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন আর ওঁদের মুখে গল্প শোনার দরকার হ'ল না। শিখেদের বীরত্বের এ কাহিনী তো আমাদের কাছে নূতন নয়। এ বীরত্বের ছবি তো আমাদের প্রত্যেকের মনেই এঁকে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।—

পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ
নির্মম নির্ভীক।

মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম আর ভাবছিলাম বন্দীবীর বন্দার এ কাহিনী যেন দানবীর কর্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু কর্ণ নিজহাতে বলি দিলেও পরে পুত্র ফিরে পেয়েছিলেন তাই আর দুঃখ থাকে না মনে। কিন্তু বন্দা তার শিশুপুত্রকে নিজহাতে হত্যা করার পর তিল তিল করে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুবরণ করে যেন পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা নিজের শরীরে অনুভব করেছিল। এ কাহিনী তাই আরো মর্মস্পর্শী। শুধু পিতার বীরত্ব নয়, তার শিশুপুত্রের বীবত্বেরও তুলনা নেই বুঝিবা।

কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল, বালক উঠিল গাহি।
'গুরুজীর জয় কিছু নাহি ভয়' বন্দার মুখ চাহি॥
... ...
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশী করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল না করি একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন, সভা হ'ল নিস্তব্ধ॥

মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম। তাকিয়ে দেখি সবাই দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

॥ ৪৯ ॥

আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছিল। তাই স্বর্ণমন্দির থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়েই আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম। কাল রাতের বেলায় ট্রেনে এসেছি, আজ তাই ট্রেনে উঠে জানালার ধারে বসলাম। দিনের বেলায় পাঞ্জাবকে ভালো করে দেখব বলে। বাংলার মত শ্যামল শোভা নেই পাঞ্জাবে কিন্তু কাশবন দেখে বুঝলাম কাছেই কোন নদী আছে। পঞ্চ আবের দেশ পাঞ্জাব—সিন্ধু,—চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, শতদ্রু। আরো কত শাখানদী আর উপনদী আছে কে জানে! কোন্ নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছি জানি না। তবে সিন্ধু

নয়। সিন্ধু নদ তো কাশ্মীর থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে সাগরে মিশেছে। পাঞ্জাবে এলাম কিন্তু প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন হরপ্পা দেখা হ'ল না। মহেনজোদড়ো অবশ্য বহুদূর এখান থেকে। কিন্তু হরপ্পা তো দূর নয়। অমৃতসর থেকে পুরাতন শহর লাহোরের দূরত্বও তো বেশী নয়—তাও তো দেখা যাবে না। শুধু অমৃতসর দেখে পাঞ্জাবের আর কতটুকুই দেখা হ'ল!

'গুরুদাসপুর' স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। মনে মনে ভাবলাম পাঞ্জাবের আর একটি জায়গাও দেখতে পেলাম। এখানেই তো বন্দা বন্দী হয়েছিল। এখান থেকেই তুরানী সৈন্যেরা সাত শত শিখ বন্দীকে দিল্লী নিয়ে গিয়েছিল। এই তবে সেই পুরাতন পথ। মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে পাঞ্জাবে ঢুকে এই পথেই তবে দিল্লী গিয়েছে ভারত-আক্রমণকারীরা। মনে মনে আশা করছিলাম পুরাতন কোন দুর্গ না হলেও কোন ধ্বংসাবশেষ হয়তো চোখে পড়বে। কিন্তু চারিপাশে তাকিয়েও আমার সে আশা মিটল না। তবুও আমি মনে মনে অতীত ইতিহাসই আলোচনা করছিলাম।

চিরকাল বহিঃশত্রুর আক্রমণ আর অত্যাচার সহ্য করেছে পাঞ্জাব। তৈমুর আর নাদির শাহের অত্যাচারের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে প্রথমে এই পাঞ্জাবকে। পাঞ্জাব আর দিল্লী লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্নের সঙ্গে দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন আর কোহিনুর হীরেও নিয়ে গেলেন নাদির শাহ। দিল্লীর পতনের সূচনা হ'ল তখন থেকেই। নাদির শাহের অনুচর আহম্মদ শাহ দুরানী এই ধনরত্নের লোভেই বার বার পাঞ্জাব অভিযান করেছে। শিখদের পদানত করে পাঞ্জাব নিজের অধিকারে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। বীরের জাত শিখেরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

ভারতের ধনরত্নের লোভে চিরকাল ভারত আক্রমণ করেছে বহিঃশত্রু। আর পথ এই পাঞ্জাব। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় তিনশো বছর আগে সুদূর ম্যাসিডোনিয়া থেকে আলেকজাণ্ডার এসেছেন ভারত অভিযানে। পাঞ্জাব তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করলেও, ঝিলামের পূর্বতীরের আর একটি রাজ্যের রাজা পুরুর নিকট প্রচণ্ড বাধা পেয়েছিলেন তিনি। পাঞ্জাব থেকেই তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

পাঞ্জাব শুধু বীরের দেশ নয়। জ্ঞানগরিমা, সভ্যতার বিকাশ সবই প্রথমে এই পাঞ্জাবেই হয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্মের দু-আড়াই হাজার বছর আগে সেই বৈদিক যুগে মধ্যএশিয়া থেকে আর্য জাতি যখন আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে

পাঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে এসে বসতি স্থাপন করল তখনও পাঞ্জাবের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড়ীদের সঙ্গে সংঘাত হয়েছিল। সেই বোধ হয় প্রথম সংঘাত। তারও বহু আগেই গড়ে উঠেছে সিন্ধু-সভ্যতা। মহেনজোদড়ো আর হরপ্পায় তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় হাজার বছর ধরে সুদূর চীন এবং অন্যান্য দেশ থেকে বিদ্যার্থী এসেছে।

বার বার সংঘাতের ফলে পাঞ্জাবের অধিবাসী যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের সাহস, তাদের মনোবল চিরকালই বেশী। ইংরেজ আমলেও এখান থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করা হ'ত। আবার এই সেদিন পাকিস্তান যখন ভারত আক্রমণ করল যুদ্ধের সীমানা তখন অমৃতসর থেকে বেশী দূরে নয়। 'ইছোগিল' খালের এপারে ভারতীয় সৈন্য ওপারে লাহোর। সেই যুদ্ধের সময়ও পাঞ্জাব দৃষ্টান্ত রেখেছে। যুদ্ধে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর বৃদ্ধা ঠাকুমা কিশোর নাতিকে সঙ্গে করে এনেছেন যুদ্ধে পাঠাবেন বলে।

পাঞ্জাবী মেয়েরা পথের ধারে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করেছে কোন সৈন্য-বোঝাই গাড়ী দেখলে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য। পাঞ্জাবের কৃষক, পাঞ্জাবের সাধারণ লোক সকলেই এ যুদ্ধের সামিল হতে চেয়েছিল। পাঞ্জাবকে ভালো করে না দেখে ফিরে যাচ্ছি বলে তাই দুঃখ থেকে গেল।

॥ ৫০ ॥

পাঠানকোট থেকে দিল্লী ফেরার সময় পথেই আমরা ঠিক করলাম—আমি আর মণ্টু কলকাতা ফিরে যাব। বাকী সবাই দিল্লী থেকে আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন দেখে পরে ফিরবে। ঠিক হ'ল প্রমীলার দিদির ওখানে ওরা সবাই উঠবে এবার। যাবার সময় ও দিদির কাছে থাকতে পারেনি। এবার তাই ওখানে দু'দিন থেকে যাবে। আমাদের সকলকেই অবশ্য ফেরার পথে ওখানে থেকে যেতে বলেছিলেন উনি। কিন্তু আমার আর দেরি করার ইচ্ছে নেই। মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা সবই আমার দেখা। আর এখন বাড়ী ফেরার পথে বুট্‌লুর কথা খুবই মনে হচ্ছে। ওর অসুখ দেখে এসেছিলাম। তারপর কাশ্মীরে আর কোন খবর পাইনি। দিল্লী ফিরে তাই আর দেরি করার ইচ্ছে নেই।

সকালে দিল্লী পৌঁছে আমি আর মণ্টু আমাদের আগের ঠিকানাতেই উঠলাম। স্টেশন থেকেই ওরা চলে গেল করোলবাগে। আমাদের ভাগ্য ভালো এখানে ফিরেই আবার ভেস্টিবুলের টিকিট পেলাম। আমরা খেয়েদেয়েই বেরিয়ে পড়ব বলে গোছগাছ করছি এমন সময় দেখি তুখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি আমাদেরই দলবল। ওরা হঠাৎ এখানে এভাবে চলে এল কেন বুঝতে না পেরে একটু অবাক হলাম আমি। তারপর সকলের টুকরো কথা আর প্রমীলার রাগ দেখে বুঝলাম ওরা করোলবাগে ওর দিদির বাড়ী খুঁজে খুঁজে না পেয়ে হয়রান হয়ে আবার এখানেই চলে এসেছে। প্রমীলা ঠিকানা-লেখা কাগজটা হারিয়ে ফেলেছে বলে অজিত ঠাকুরপো ওকে দোষ দিচ্ছে। আর ও গজগজ করছে অজিত ঠাকুরপো আগে একবার গিয়েছে ওখানে তাও কেন বাড়িটা চিনতে পারল না তাই। সারারাত ট্রেনে এসেছে আর সকাল থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরেছে। এখন প্রায় তুপুর। সকলেরই মেজাজ গরম। উস্কোখুস্কো চেহারা।

আমি বললাম—আগে সব স্নান-টান করো। এদিকে আমি তোমাদের খাবার ব্যবস্থা দেখি। তারপর নাহয় ঠিক হবে কার দোষ। আর অজিত ঠাকুরপোকে বললাম—তুমি ভাই এবারও ডিস্ক্রেডিটেড্ হলে। প্রমীলাকে অমরনাথ নিয়ে যেতে পারোনি—আবার তোমার শালীর বাড়ী খুঁজে বার করতে পারলে না! প্রমীলার এতদিন যাও বা একটু পতিভক্তি ছিল এবার আর তাও থাকবে কিনা সন্দেহ।

আমার কথায় সবাই হেসে উঠল। প্রমীলাও ফেলল। অজিত ঠাকুরপোকে যেভাবে সবাই ছেঁকে ধরেছিল, এবার ও হাঁফ ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। যেতে যেতে বলল—করোলবাগ কি এইটুকুন জায়গা যে বাড়ীর নম্বর না জেনে বাড়ী খুঁজে বের করব! নম্বর জানা থাকলে ঠিকই নিয়ে যেতাম।

আমি হেসে বললাম, খুব হয়েছে বাপু, আর বাহাতুরিতে কাজ নেই।

বিকেল চারটেয় ট্রেন। মণ্টুরও আর তর সয় না দেখলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরই আমরা তাই স্টেশনে রওনা হলাম। অনেক আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম স্টেশনে। একে তো আগেই এসেছি তারপর শুনলাম ট্রেন লেট। সময় আর যেন কাটে না। বাড়ী ফেরার মুখে এখন মনে হচ্ছে কতক্ষণে কলকাতায় পৌঁছাব। দিল্লী এসেও বাড়ীর কোন চিঠি পাইনি। মন তাই আরো চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

তারপর ট্রেন ঠিকই এলো। আর আমরা উঠে বসলাম গাড়ীতে। ট্রেনে

এবারও আমার ঘুম হ'ল না। পরদিন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে চারিদিক তাকিয়ে দেখছি কেউ আমাকে নিতে এসেছে কিনা। কাশ্মীর থেকেই একটা চিঠি দিয়ে ছিলাম আজ পৌঁছাতে পারি বলে। দূর থেকেই অজয়কে চোখে পড়ল। উনিও এসেছেন। দেখি ওঁরাও আমরা এসেছি কিনা খোঁজ করতে করতে এগোচ্ছেন।

প্রথমেই বুটলুর খবর নিলাম। বুটলু ভালো আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু অজয় যখন বলল—তুমি কাশ্মীর ঘুরে এলে এবার আমি আর বাবা যাচ্ছি ত্রিবান্দ্রামে, আমরা ঠিক করেছি দক্ষিণটা ঘুরে আসব—শুনে ওঁর দিকে তাকালাম সত্যি কিনা জানার জন্য। বললেন, দিন সাতেকের মধ্যেই যাবার কথা। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এইমাত্র ঘুরে এলাম, আবার দক্ষিণে যাবার কথা বলি কোন্ মুখে? কিন্তু কন্যাকুমারী দেখার সাধ যে আমার বহুদিনের!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত